বিশ্বশান্তি ঃ

সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ)
খলীফাতুল মসীহ্ (৪র্থ)
ইমাম ঃ নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

বিশ্বশান্তি ঃ

সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ)

খলীফাতুল মসীহ্ (৪র্থ)

ইমাম ঃ নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত

ভাষান্তর ঃ শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনায় ঃ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বক্‌শীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

পক্ষে,
ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লিঃ
ইসলামাবাদ, শীপহ্যাচ লেন,
টিলফোর্ড, সারে GUIO ZAQ
(সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

প্রকাশ কাল ঃ
মাঘ, ১৪০১
সাবান, ১৪১৫
জানুয়ারি, ১৯৯৫

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
ঢাকা।

গ্রন্থকার ঃ হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ)

মহামান্য গ্রন্থকার ইসলামের বর্তমান খলীফা এবং ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন ঃ নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম। তিনি প্রতি শুক্রবার জুমুআর নামাযের যে খুৎবা প্রদান করেন (বর্তমানে লন্ডন মসজিদ থেকে) তা প্রচারিত হয় সারা বিশ্বে, স্যাটেলাইটের সাহায্যে, 'মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া' (MTA)-এর মাধ্যমে। এছাড়া, তিনি বিশ্বব্যাপী অসংখ্য সভা-সম্মেলনে বক্তৃতা করেছেন এবং করে থাকেন। এবং সমকালীন সমস্যাবলীর উপরে প্রশ্নোত্তরের শত শত বৈঠকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সহিত আলোচনা করেছেন এবং করে থাকেন। তাঁর প্রণীত অন্যতম গ্রন্থ 'Murder in the name of Allah'- বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে।

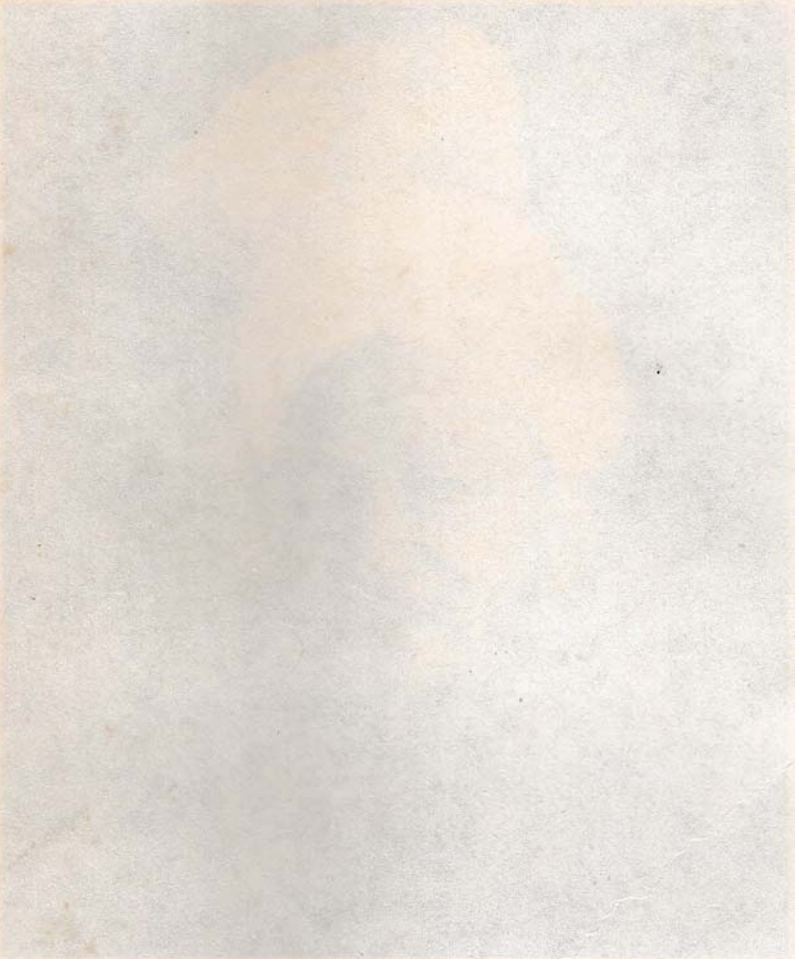

সূচীপত্র

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা	৭
ভূমিকা	৯
প্রকাশকের কথা	১১
বক্তৃতার উপক্রমণিকা	১২
আন্তঃধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি	১৫
সামাজিক শান্তি	৫৭
আর্থ-সামাজিক শান্তি	১৩১
অর্থনৈতিক শান্তি	১৫৭
রাজনৈতিক শান্তি	২০৫
ব্যক্তিগত শান্তি	২৩৯
পরিশিষ্ট	২৫৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

সাইয়্যেদনা আমীরুল মুমেনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা বে নাস্‌রিহিল আযীয), খলীফাতুল মসীহ্, বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবর্ষ পূর্তি (১৮৮৯-১৯৮৯) উপলক্ষ্যে ১৯৯০ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক জলসায় 'Islam's Response to Contemporary Issues বা সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান-এর উপরে সঠিক দিক নির্দেশনা সম্বলিত অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রদত্ত উক্ত বক্তৃতার বিষয়গুলি ছিল ঃ

1. Inter-Religious Peace and Harmony;
2. Social Peace in General;
3. Socio-Economic Peace;
4. Economic Peace;
5. Peace in national and international Politics;
6. Individual Peace.

আমরা, গত এপ্রিলে শুধু Inter-Religious Peace and Harmony বিষয়ের বঙ্গানুবাদ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলাম। এক্ষণে আমরা, আল্লাহ্‌র ফযলে, গ্রন্থটির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করছি। আল্‌হামদুলিল্লাহ্। অনুবাদ করেছেন শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান। প্রুফ দেখেছেন আমাদের অফিস সচিব জনাব মুহাম্মদ মুতিউর রহমান এবং অনুবাদক। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া সম্ভব। গোচরীভূত হলে ভবিষ্যতে সংশোধন করা যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আমরা সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করি আল্লাহ্‌তা'লা সকলের হাফেয ও নাসের হউন, আমীন।

আপনাদের একান্ত

(মোহাম্মদ মোস্তফা আলী)
ন্যাশনাল আমীর,
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

ঢাকা
অক্টোবর, ১৯৯৪ইং

ভূমিকা

'জামা'তে আহ্‌মদীয়া' প্রতিষ্ঠিত হয় কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) কর্তৃক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। হযরত মির্যা সাহেব ঐশী নির্দেশে দাবী করেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এবং আখেরী যামানার বিশ্ব-সংস্কারক, যাঁর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সমস্ত বড় বড় ধর্মের পবিত্র গ্রন্থাবলীতে।

১৯৮৯ সনে এই মুসলিম সম্প্রদায় তাদের প্রথম শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সভা-সম্মেলনের শেষপর্যায়ে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো– ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) তারিখে রানী এলিজাবেথ ২য়, কন্‌ফারেন্স সেন্টারে (লন্ডন) অনুষ্ঠিত– একটি সভায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতা। যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন জামা'তে আহমদীয়ার বর্তমান নেতা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ, খলিফাতুল মসীহ্ ৪র্থ (আইঃ)।

তাঁর মূল বক্তৃতার সময় সভায় উপস্থিত ছিলেন আটশ' বিশিষ্ট অতিথি। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাজনীতিবিদ, আরবী-ভাষাবিদ, সাংবাদিক, অধ্যাপক, শিক্ষক, বিভিন্ন পেশাজীবি পুরুষ ও মহিলা এবং বড় বড় ধর্মীয় বিশেষ ব্যক্তিরা। জনাব আলতাফ এ, খান, ন্যাশানাল আমীর, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত (যুক্তরাজ্য), মেহমানদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সভাপতিত্ব করেন মিঃ এড্‌ওয়ার্ড মর্টিমার। ধন্যবাদ প্রস্তাব পেশ করেন মিঃ হুগো সামারসন, এম পি। বক্তৃতা শেষে প্রশ্নোত্তরের একটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশনও হয়।

এত ব্যাপক একটা বিষয়ের উপরে পূরোপূরিভাবে আলোচনা করা, যেহেতু এই জাতীয় সভার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্ভব হয়ে উঠে না, সেহেতু এর আংশিক আলোচনাই শুধু করা গিয়েছিল। যাহোক, পরবর্তীতে, বহু অনুরোধ-উপরোধ এবং বিশেষ করে, যাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি তাঁদের দাবীর প্রেক্ষিতে বক্তৃতাটি, মূল পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে এখন গ্রন্থাকারে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। বক্তৃতাটি যেহেতু বক্তা ডিক্টেশন দিয়েছিলেন, সেহেতু তা বিশ্বস্ততার সাথে লিখে নিতে কোন প্রকার ত্রুটি করা হয়নি। প্রথম রিভিশনে ছোট খাটো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি এখানে সেখানে পাওয়া গিয়েছিল, যা বক্তা স্বয়ং সংশোধন করে দিয়েছেন। পরে, মনে করা হলো যে, বক্তৃতাটির বিশেষ কোন কোন অংশের পাঠ (টেক্সট্) কোন ইংরেজ ব্যক্তির

কাছে দেখে নেওয়টা সমীচীন হবে, যাতে করে তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন যে, ইংরেজি ভাষাভাষীদের জন্য কোনো অংশের আরও বিস্তারিত আলোচনার দরকার আছে কিনা; অথবা কোন প্রকাশভঙ্গী তাদের কানে অপরিচিত ঠেকতে পারে কিনা। আমরা কৃতজ্ঞ যে, এই কাজের জন্য মিঃ ব্যারী জেফরীজ (কুইন্সবেরী, ইয়র্কশায়ার) এবং মিঃ মুজাফফর ক্লার্কে (স্টাঁচলী, বার্মিংহাম) স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন এবং কাজটি প্রশংসনীয়ভাবে সম্পন্ন করেন। তাঁদের মূল্যবান উপদেশগুলো কাজে এসেছিল। নইলে, ভাষার আধুনিক ব্যবহারে অনেক শব্দের ও বাগধারার গূঢ়ার্থে (connotation) যে তারতম্য ঘটেছে, তার কারণে হয়তোবা কোন কোন পরিচ্ছেদে যা বলতে চাওয়া হয়েছে, তা না বুঝে পাঠক অন্য কিছু বুঝতে পারতেন। এছাড়া, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কৃষ্টিগত কোন কোন পার্থক্যের প্রতি প্রতীচ্যের মন-মেজাজের যে অতিস্পর্শকাতরতা রয়েছে, সে ব্যাপারেও তাঁদের উপদেশ যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

অবশ্য, প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে অপরের প্রতি অসম্মতি জ্ঞাপনের। কিন্তু, তাই বলে, শুধু একটা ভুল বোঝাবুঝির কারণে অসম্মতি জ্ঞাপন করাটা, যথাসম্ভব, পরিহার করে চলাই উচিত। এ ব্যাপারেও উভয় ভদ্রলোক প্রচুর সাহায্য করেছেন।

ছাপাবার কাজে হাত দিয়েও, বেশ দেরীতে হলেও, একটা ব্যাপারে আমরা রীতিমত সচেতন যে, এই বক্তৃতায় আলোচিত অনেক ইস্যুই ইদানিং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেছে। বক্তার দূরদৃষ্টিতে দেখা অনেক ইস্যুই এখন অলৌকিকভাবে সত্যে পরিণত হতে চলেছে। যেমন, ঈশ্বরনিন্দার (Blasphemy) ফতওয়া নতুন করে দেওয়ার প্রেক্ষিতে আবারও শুরু হয়েছে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি নিয়ে বিতর্ক। পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলোতে কম্যুনিজমের পতনের পর বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এক নতুন ভুমিকা গ্রহণ করেছে। গ্রেট বৃটেনে সুদের হারের নীতি অর্থনৈতিক মন্দাকে ত্বরান্বিত করেছে। এই সমস্ত ইস্যু এবং ঘটনাবলী, এবং আরও অনেক ইস্যু সম্পূর্ণরূপে এবং বিস্তারিতরূপে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এই বক্তৃতায়। হায়! আমরা যদি ছাপাবার কাজে আরও আগেই হাত দিতে পারতাম।

একটা কথা বলার বাকী আছে এবং তা হচ্ছে, পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, বক্তা তাঁর এই বক্তৃতার ডিক্টেশন দিয়েছিলেন ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে, যখন এই সকল পরিবর্তনের পূর্বলক্ষণগুলো মাত্র সূচনার পর্যায়ে ছিল। এমন স্পষ্ট ভাষায় সতর্কবাণী কদাচিৎ উচ্চারিত হয়ে থাকে। এই বাণী চিরন্তন। এবং তার সম্পর্ক সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার সঙ্গে। বক্তা যদি তাঁর অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণীতে সত্য প্রমাণিত হন, যেমন তিনি হয়েছেনও ইতোমধ্যে অনেকগুলোতে, তাহলে, বিশ্বনেতৃবৃন্দের উচিত হবে, এই বক্তৃতার বাণীকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহন করা

এবং এরদ্বারা যতটা সম্ভব লাভবান হওয়া, এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

আল্লাহ্ তাঁদেরকে তা-ই করবার তৌফিক দান করুণ। আমিন।

মনসুর এ. শাহ্

লন্ডনঃ জুলাই, ১৯৯২।

প্রকাশকের কথা

কোরআন শরীফের আয়াতসমূহ 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম' -সহ গণনা করার যে পদ্ধতি তা-ই অনুসরণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। বস্তুতঃ, জামা'তে আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত কোরআন করীমে এই নিয়মই অনুসৃত হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম' সহই সুরাগুলি নাযেল হয়েছে। এই কারণে আয়াত গণনায় অন্যদের প্রকাশিত কোরআন মজীদের তুলনায় আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রকাশিত কোরআন শরীফের আয়াতের সংখ্যা ১ (এক) করে বেশী। যেমন, ২ এর স্থলে ৩; ২০ এর স্থলে ২১; ১০০ এর স্থলে ১০১, ইত্যাদি।

'হাদীস' গ্রন্থসমূহের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছেও। তাই, সংক্ষেপ করার জন্য শুধু বর্ণনাকারীর নাম ও গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো।

এই গ্রন্থে পবিত্র বাইবেল থেকে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তা সবই নেওয়া হয়েছে 'দি নিউ ওয়ার্ল্ড ট্রান্সলেশন' থেকে।

বক্তৃতার উপক্রমণিকা

'আশ্‌হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু

'আউযুবিল্লাহে মিনাশ্ শায়তোয়ানের রাজীম

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন; আর্‌রহ্‌মানির রাহীম; মালেকে ইয়াওমেদ্দীন। ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন। এহ্‌দেনাস সিরাতোয়াল মুস্তাকীমা-সিরাতোয়াল্লাযীনা আন্ আম্‌তা আলাইহিম; গায়রিল মাগযুবে আলাইহিম ওয়ালাযযোয়াল্লীন। আমীন।

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই- তিনি এক-অদ্বিতীয় তাঁর কোনও শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল।

'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি; (আমি শুরু করছি) আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক-প্রভু; অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়, বিচার দিবসের মালিক। আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো, - তাঁদেরই পথে যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, না কোপগ্রস্তদের (পথে) এবং না পথভ্রষ্টদের (পথে)। আমীন।'

আজকের এই বিকেলে এখানে আপনাদের মত বিদ্বত্তম সুধীজনের উপস্থিতির জন্য আমি প্রথমেই আপনাদের কাছে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি স্বীকার করতে চাই যে, আমি যে ভাষণ আজ দিতে যাচ্ছি, তা আমার জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এটা একটা ব্যাপক বিষয়। আর তাইতো, আমার বেশ ভয়ও হচ্ছে। --

যাহোক, দু'টো মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই। প্রশ্ন দু'টো হচ্ছেঃ

(১) আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলো কি কি?

(২) আধুনিক পরিস্থিতির মোকাবেলা কি কোন ধর্ম করতে পারে?

এগুলোই আসলে মৌলিক প্রশ্ন।

শান্তির অনুপস্থিতি

আজকের এই পৃথিবীর সব চাইতে মারাত্মক ব্যাধি হচ্ছে শান্তির অনুপস্থিতি।

সমকালীন বিশ্বে, মানুষ, সামগ্রিকভাবে, বস্তুগত উন্নতির কারণে অনেক উঁচু স্তরে উঠতে পেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে মানবীয় প্রয়োজনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিহরণ জাগানো অগ্রগতির ফলে।

সন্দেহ নেই, মানব-সমাজের অধিকতর ভাগ্যবান অংশের লোকেরা অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের বাসিন্দারা হাল যামানার বৈজ্ঞানিক উন্নতির সুফল ভোগ করছে অনেক বেশী করে। তৃতীয় বিশ্বও বেশ খানিকটা উপকৃত হয়েছে। কেননা, অগ্রগতির আলোক-রশ্মি সর্বাপেক্ষা অন্ধকার অঞ্চলগুলোর সেই সব গভীর প্রদেশেও প্রবেশ করেছে, যেখানে এখনও পর্যন্ত মানবসমাজের এক একটা অংশ দূর অতীতেই পড়ে আছে।

তথাপি, মানুষ সুখী নয়, পরিতৃপ্ত নয়। অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে ভীতি, শঙ্কা ও ভবিষ্যতের প্রতি অনাস্থা, এবং সেই সঙ্গে অতীত থেকে প্রাপ্ত সব উত্তরাধিকারের প্রতিও অসন্তোষ।

এগুলোই হচ্ছে, সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কয়েকটি যা সমসাময়িক বিশ্বের প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করছে। এটাই আবার উল্টোভাবে, মানুষের মনের অন্তস্তলে জন্ম দিচ্ছে তার অতীত অথবা তার বর্তমানের প্রতি, গভীর অসন্তোষ। বিশেষ করে, এটাই প্রবিষ্ট হচ্ছে তরুণ প্রজন্মের চিন্তাধারার গঠন প্রক্রিয়ার গভীরে। মানুষ, তাই, শান্তির অন্বেষায় ব্যাকুল।

বিশ্বশান্তিতে ইসলামের অবদান

'ইসলাম' -এর শাব্দিক অর্থ 'শান্তি'। এই একটিমাত্র শব্দের মধ্যেই সমস্ত ইসলামী শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং সংক্ষিপ্তাকারে প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। এর শিক্ষা মানুষের স্বার্থ এবং আশা-আকাংখার প্রতিটি ক্ষেত্রেই শান্তির গ্যারান্টি দান করে।

আজকের বক্তৃতা আমি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি; এবং এই সকল ক্ষেত্রেই সমকালীন বিশ্ব দিক্-নির্দেশনার মুখাপেক্ষীঃ

(১) আন্তঃধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি;

(২) সামাজিক শান্তি (সাধারণভাবে);

(৩) আর্থসামাজিক শান্তি;

(৪) অর্থনৈতিক শান্তি;

(৫) রাজনৈতিক শান্তি (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক);

(৬) ব্যক্তিগত শান্তি।

(১) প্রথম প্রশ্নটির জবাবে পবিত্র কোরআন মানুষের দৃষ্টি এই অবিসংবাদিত সত্যের প্রতি আকর্ষণ করে যে, কোরআনের পুর্বে যে সকল কিতাব ও ধর্মপুস্তকাদি (সহিফা) অবতীর্ণ হয়েছিল তা সবই মানুষের হস্তক্ষেপে বিকৃত হয়ে গেছে। সেই সকল ধর্ম গ্রন্থাদির শিক্ষাসমূহ ক্রমাগতভাবে সংশোধনীর দ্বারা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। অথবা সেগুলির মধ্যে নতুন নতুন বিষয় প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে, ঐ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মপুস্তকের বৈধতা এবং প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং তা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

সুতরাং, কোন ধর্মগ্রন্থে কোন পরিবর্তন সাধন করা না হয়ে থাকলে, তা প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তাবে সেই ধর্মের অনুসারীদের স্কন্ধেই। এ ব্যাপারে, কোরআনের অবস্থান অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মপুস্তকাদির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অনন্য। এমনকি ইসলামের অনেক কট্টর দুষমন, যারা বিশ্বাসই করে না যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম (কথা), তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন, সন্দেহাতীতরূপে, ঠিক তেমনই হুবহু এবং অবিকৃত রয়ে গেছে যেমন তা দাবী করা হয়েছে মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক আল্লাহ্‌র কালাম বলে। যেমন, স্যার উইলিয়াম মুইর তার Life of Mohamet, (London, 1878), পুস্তকে লিখেছেনঃ *There is otherwise every security , internal and external, that we posses the text which Mohamet himself gave forth and used (p.xxvii)*

We may, upon the strongest assumption, affirm that every verse in the Quran is the genuine and unaltered composition of Mohamet himself. (p. xxviii) [Life of Mohamet by Sir William Muir (London, 1878)].

Slight clerical errors there may have been, but the Quran of Uthman contains none but genuine elements, though sometimes in very strange order. The efforts of European scholars to prove the existence of later interpolations in the Quran have failed. (Prof. Noldeke in Encyclopaedia Brittanica; 9th edition, under Quran).

'মুহাম্মদ নিজে যা দিয়ে গেছেন এবং ব্যবহার করে গেছেন, (কোরআনের) সেই টেক্সট্ (পাঠ), যা এখন আমাদের কাছে আছে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, সর্বপ্রকারের নিরাপত্তাই অক্ষুণ্ন রয়েছে।' (পৃঃ ২৭)

'আমরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই সমর্থন দিতে পারি যে, কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত মুহাম্মদের নিজের খাঁটি ও অবিকৃত রচনা।' (পৃঃ ২৮)

আন্তঃধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি

১। ধর্মীয় মূল্যবোধ অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হচ্ছে;

২। নবুওয়্যতের সার্বজনীনতা;

৩। সকল নবী সমান;

৪। প্রামাণিকত্ব সমান হলে কি পদমর্যাদা ভিন্ন হতে পারে?

৫। পরিত্রাণ কোন ধর্মের একচেটিয়া বিষয় হতে পারে না;

৬। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উন্নতি সাধন;

৭। সার্বজনীনতার ধারণা;

৮। ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম;

৯। সংগ্রামের উপকরণ, বাধ্যবাধকতা নেই;

১০। যোগ্যতমের উত্তরণ;

১১। বাক-স্বাধীনতা;

১২। সমসাময়িক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা ও মুক্তি;

১৩। ঈশ্বরনিন্দা (Blasphemy)

১৪। আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতা;

১৫। উপসংহার।

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

'নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; এবং এমন কোন জাতি নেই যার নিকট সতর্ককারী আগমন করেনি'। (আল্ ফাতির - ৩৫ ঃ ২৫)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ
مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে (মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র উপরে) এবং যারা ইহুদী হয়েছে তারা এবং সাবীগণ এবং খৃষ্টানগণ যে কেউ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকাজ করে, না তাদের কোন ভয় থাকবে এবং না তারা দুঃখিত হবে' - (আল্ মায়েদা - ৫ ঃ ৭০)

ধর্মীয় মূল্যবোধ অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হচ্ছে

আজকের ধর্মীয় সামগ্রিক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করলে যে কেউ দেখতে পাবেন যে, ধর্মের অভ্যন্তরে একটা পরস্পর-বিরোধী অবস্থা বিরাজ করছে। সাধারণভাবে তো ধর্মের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ছে বটে, কিন্তু সাথে সাথে সেটাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে শক্ত হতেও দেখা যাচ্ছে। সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে, প্রায় প্রতিটি ধর্মে এক প্রকার মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি ও প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণু একটা মতাদর্শের তীব্র পশ্চাদমুখী আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধর্ম পিছিয়ে পড়ছে। অপরাধ অবাধে সংঘটিত হচ্ছে। সত্য দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। সমতা এবং সুবিচার শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সমাজের প্রতি সামাজিক দায়িত্বাবলী উপেক্ষিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে, একটা স্বার্থপর ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা শক্তি অর্জন করছে। এমনকি, তা শক্তিলাভ করছে পৃথিবীর সেই দেশগুলোতেও, যেগুলো, আর যাই হোক, নিজেদেরকে ধর্মীয় বলেই দাবী করছে। এগুলো এবং এর সঙ্গে আরও বহু সামাজিক খারাপি, যা কিনা নৈতিকভাবে অবক্ষয়প্রাপ্ত একটা সমাজের প্রকাশ্য লক্ষণ, তা আজ পরিণত হয়েছে একটা নিয়মে। যদি কোন ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধগুলো সেই ধর্মের আত্মা এবং তার দেহ গঠন করে থাকে, তাহলে বলতে হবে যে, সেই সকল মূল্যবোধের উপরে ক্রমাগত ক্রিয়াশীল একটা শ্বাসরোধ-প্রক্রিয়া চলছে, যা আমাদেরকে এই অপরিহার্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, যখন ধর্মের দৈহিক পুনরুত্থান ঘটানো হচ্ছে, ঠিক তখনই সেই দেহ থেকে আত্মার অতিদ্রুত নির্গমন ঘটছে। সুতরাং আজ আমরা ধর্মের মধ্যে যা প্রত্যক্ষ করছি তা হচ্ছে, – ধর্মের ঐ তথাকথিত পুনরুজ্জীবনও যা, শবদেহের পুনরুত্থানও তা-ই, যা কিনা এদিক-সেদিক হাঁটতে থাকবে যাদুকরের মড়া চালান দেওয়ার মতই। অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘ নিশ্চলাবস্থা এবং উৎসাহব্যঞ্জক উন্নতির অভাব সাধারণ ধার্মিক মানুষদের মধ্যে একঘেঁয়েমীর জন্ম দিয়েছে। তারা অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটে যাওয়ার যে প্রত্যাশা রাখে তা-ও পূরণ হয় না। অতিপ্রাকৃতিক শক্তির হস্তক্ষেপে আজগুবী ঘটনাবলীর মাধ্যমে, তাদের মনোমত করে, দুনিয়াটাকে বদলায়ে ফেলার জন্য জাগতিক ঘটনাবলীও সংঘটিত হয় না। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী রূপকাশ্রিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পূর্ণতা দেখতে চায়, কিন্তু তেমন কিছুও ঘটে না। এরাই হচ্ছে সেই সব লোক যারা নতুন নতুন ধর্মমত সৃষ্টির উপদান যোগায়, আর সেই উপাদান হচ্ছে তাদের হতাশার গলিত লাশ। অতীত থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা থেকেই সুষ্টি হয় তাদের নতুন কিছু দিয়ে শূন্যতা পূরণের আকাঙ্খা।

এই সব ধবংসাত্মক প্রবণতা ছাড়াও, একটা চরম অসুবিধা সৃষ্টিকারী ব্যাপার যা, সম্ভবতঃ ধর্মীয় গোঁড়ামীর পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করে

ফেলছে। এই জাতীয় গোঁড়ামীর অভ্যুত্থানের দরুন একটা নেশাকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, যা আইডিয়া বা ধ্যান-ধারণার অবাধ আদান প্রদান এবং আলাপ আলোচনার শুভ চেতনার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করছে। যেন এতেও কিছুই হচ্ছে না। অসাধু রাজনীতিকদের স্বেচ্ছাচারিতা এই জাতীয় উত্তপ্ত আবহাওয়াকে নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। যার দরুন ধর্মের আসল চেহারা কালিমালিপ্ত হয়ে পড়ছে। উপরন্তু, ঐতিহাসিকভাবে আন্তঃ-ধর্মীয় বিবাদ বিসম্বাদ তো রয়েই গেছে। এছাড়াও, তথা কথিত 'ফ্রি মেডিয়া' বা অবাধ ও নিরপেক্ষ গণ-মাধ্যমগুলি সাধারণভাবে মুক্ত থাকার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে অদৃশ্য হাতের দ্বারা। ফলে, সেগুলো বিশ্ব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। সুতরাং যখন কোন একটা দেশের গণ-মাধ্যম, সেই দেশের একই ধর্মাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখপাত্র হিসেবে অপর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের নিন্দা-বিদ্বেষের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তখন পরিস্থিতিটা আরও বেশী জটিল আকার ধারণ করে। তখন ধর্মই এই সব কলহ বিবাদের প্রথম শিকারে পরিণত হয়। ধর্মের জগতে আজ পৃথিবীতে যা ঘটছে তাতে আমি সত্যি সত্যিই উদ্বিগ্ন এবং ক্ষুব্ধ। ধর্মগুলির ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্য থেকে ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণের জন্য একটা সত্যিকারের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণের একটা গভীর আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, ইসলাম এরূপ সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য সহকারে সেই কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম যাতে সম্পূর্ণরূপেই আমাদের সব চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ হতে পারে।

বিষয়টাকে আমি ভালভাবে বোধগম্য করার জন্য কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি।

যেমন, আমি বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ধর্মের জন্য যা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হচ্ছে ধর্মের দ্বারা সার্বজনীনভাবে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, ধর্মকে ধর্মীয় সার্বজনীনতা স্বীকার করতে হবে, এবং তা এই অর্থে যে, সকল মানুষ ধর্ম, গোত্র ও ভৌগলিক-পরিচয় নির্বিশেষে একই স্রষ্টার সৃষ্টি। অতএব, তারা সকলেই ঐশী নির্দেশ লাভের সমান অধিকারী। অবশ্য, তেমন ঐশী নির্দেশ যদি তাদের কারো প্রতি, মানব সমাজের কোনও অংশের জন্য, কখনও দান করা হয়। এতে করে সত্যের উপরে কোন ধর্মের একচেটিয়াকরণের যে ধারণা তা দূর হয়ে যাবে। সকল ধর্ম, তা সেগুলির নাম ও মতবাদ যাই হোক না কেন, সেগুলো যেখানেই পাওয়া যাক না কেন এবং যে যুগেরই হোক না কেন, সেগুলোর প্রত্যেকটির কিছু না কিছু ঐশী সত্যের অধিকারী হওয়ার দাবী করার অধিকার আছে। অধিকন্তু যে কাউকে স্বীকার করতে হবে যে, মতবাদ এবং শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সব ধর্মই

একটি অভিন্ন উৎস থেকে এসেছে। একই ঐশী কর্তৃত্ব বা অথরিটি, যা পৃথিবীর কোন এক এলাকার এক ধর্মের প্রবর্তন করেছে, তা পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার এবং অন্যান্য যুগের মানুষদেরও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেরও তত্ত্বাবধান করেছে। এবং,

এটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের প্রবিত্র গ্রন্থ কোরআন করীমের বাণী।

নবুওয়্যতের সার্বজনীনতা

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন যা বলে, তা হচ্ছেঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"এবং নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠিয়েছিলাম (এই শিক্ষা সহ) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধা-সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শয়তান থেকে বেঁচে চলো"।(আন্ নহল-১৬ঃ৩৭)

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে যে, হে আল্লাহ্‌র নবী! তুমি পৃথিবীতে একমাত্র নবী নওঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

"এবং আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম যাদের মধ্য থেকে কারও কারও বিষয় তোমার নিকটে আমরা বর্ণনা করেছি, এবং তাদের মধ্য থেকে কতকের উল্লেখ আমরা তোমার নিকটে করিনি"।(আল্ মুমিন - ৪০ঃ৭৯)

পবিত্র কোরআন ইসলামের পবিত্র নবীকে (সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ঃ

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ
أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

'তুমি কেবল একজন সতর্ককারী। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সর্তকারীরূপে প্রেরণ করেছি; এবং এমন কোন জাতি নেই যার নিকটে সতর্ককারী আগমন করেনি'।(আল্ ফাতির - ৩৫ঃ২৪,২৫)

উপর্যুক্ত আয়াতগুলিতে এটা সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, ইসলাম অপরাপর ধর্মসমূহের উৎখাতসাধন দ্বারা সত্যের উপরে একচেটিয়া অধিকার দাবী করে না। বরং সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, খোদাতা'লা সকল যুগের এবং পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মানুষদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছেন এবং সেই লক্ষ্যে তাঁর রসূলগণকেও প্রেরণ করেছেন, যাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ জাতির কাছে - যাদের মধ্যে তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন– ঐশী বাণী প্রচার করে গেছেন।

সকল নবীই সমান

প্রশ্ন উঠে যে, যদি পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন যুগে আল্লাহ্‌র নবীদের আগমন হয়ে থাকে, তাহলে কি তাঁদের সকলের ঐশী অথরিটি অভিন্ন? কোরআন শরীফের মতে সকল নবীরাই আল্লাহ্‌র। এবং সে কারণেই, ঐশী অথরিটির ব্যাপারে তাঁদের সকলেই সমভাবে সেই অথরিটি সমান তৎপরতা ও সমান শক্তিতে প্রয়োগ করে থাকেন। একজন নবীর সঙ্গে আর এক নবীর পার্থক্য সৃষ্টির কোন অধিকার কারো নেই। তাঁদের বাণীর প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকেই সমান। অন্যান্য ধর্ম এবং সেগুলির প্রবর্তকগণের প্রতি এবং সেই সঙ্গে ছোট ছোট নবীদেরও প্রতি ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রত্যেক নবীর ওহী বা ঐশীবাণীর প্রামাণিকত্ব একই মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার যে নীতি তাকে বিভিন্ন ধর্মের *মধ্যে ঐক্যসাধনের ক্ষেত্রে একটা অতি শক্তিশালী উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে* পারে। এতে অন্যান্য ধর্মের নবীদের ঐশীবাণীর প্রতি যে বৈরিতার মনোভাব রয়েছে, তা সম্মান ও শ্রদ্ধার মনোভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রেও, পবিত্র কোরআনের অবস্থান সুস্পষ্ট এবং যুক্তিযুক্তঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ
بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن
رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ

'এই রসুল (ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা) স্বয়ং ঈমান রাখে তার উপরে যা তার প্রতি তার প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে ,এবং অন্যান্য মুমেনরাও, তারা সকলেই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশ্‌তা এবং তাঁর কেতাবসমূহ ও তাঁর রসূলগণের উপরে ঈমান রাখে, (এবং তারা বলে) 'আমরা তাঁর রসূলগণের কারো মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না' এবং তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আমরা আনুগত্য করলাম'।(আল্ বাকারা - ২ঃ২৮৬)

এই বিষয়টার কথা কোরআন মজীদের আরো অনেক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ
بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ
أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۝ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ
حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ سَوْفَ
يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলগণকে অস্বীকার করে, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে 'আমরা কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতককে অস্বীকার করি' এবং তারা চায় যেন তারা এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে।

"তারাই প্রকৃত কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

"এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের উপরে ঈমান আনে এবং তাদের কারো মধ্যেই পার্থক্য করে না, তারাই ঐ সকল লোক যাদেরকে তিনি শীঘ্রই তাদের পুরস্কার দিবেন। বস্তুতঃ, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়"।(আন্ নিসা- ৪ঃ১৫১-১৫৩)

প্রামাণিকত্ব (Authenticity) সমান হলে কি পদমর্যাদা ভিন্ন হতে পারে?

সকল নবীর প্রামাণিকত্ব সমান হলে কি তাঁদের পদমর্যাদাও সমান হবে? এই প্রশ্নের জবাব এটাই যে, বহুক্ষেত্রে নবীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে, পার্থক্য রয়েছে তাঁরা প্রত্যেকে কীভাবে তাঁদের দায়িত্বাবলী পালন করেছেন সে ক্ষেত্রেও। আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁদের নৈকট্যের ব্যাপারে এবং আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে যে পারস্পরিক মর্যাদা তাঁরা লাভ করেছেন সে ব্যাপারে নবী ও রসূলদের কারো কারো সঙ্গে অপরের পার্থক্য রয়েছে। পবিত্র কোরআন, বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতে নবীদের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তা থেকেও প্রমাণিত হয় এই সিদ্ধান্ত।

কোরআন করীম স্বীকার করে যে, এই পদমর্যাদার পার্থক্যটা এরূপ যে, এতে মানুষের শান্তি নষ্ট হয় না। যে কোরআন শরীফ ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঐশী বাণী লাভের প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে এক নবীর সঙ্গে অপর নবীর কোন পার্থক্য নেই, সেই কোরআন শরীফই ঘোষণা করছেঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

'এই রসূলগণ-যাদের মধ্য থেকে আমরা কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি -তাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ্ ব্যাক্যলাপ করেছেন, এবং তাদের মধ্যে কতককে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন'।(বাকারা - ২ঃ২৫৪)

এই প্রস্তাবনা গৃহীত হওয়ার পরও, যে কেউ সবিস্ময়ে বলতে পারে যে, তাহলে নবীদের মধ্যে কে সর্বোচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী! এটা একটা স্পর্শকাতর ইস্যু; তবু এই প্রশ্নটা সম্পর্কে কেউ তার চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না।

সকল ধর্মের অনুসারীরাই এই দাবী করে থাকে যে, তাদের ধর্মের প্রবর্তক অপরাপর সকল ধর্মের প্রবর্তকগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং চারিত্রিক উৎকর্ষে, মহত্বে, ধর্মপরায়ণতায়, সম্মানে -এক কথায় একজন নবীর জন্য অপরিহার্য সকল গুণাবলীতে- কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। তাহলে ইসলামও কি এই দাবী করে যে, ইসলামের পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন? হাঁ, ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে এই দাবী করে যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) হচ্ছেন পৃথিবীর বাকী সকল নবীগণের মধ্যে সকল গুণাবলীতে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।

তথাপি, এই দাবীর ক্ষেত্রে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে একটা অতি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমে, এটা মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মই নবুয়্যতের সার্বজনীনতা স্বীকার করে না। যখন ইহুদীরা দাবী করে (যদি তারা তা করেই) যে, মূসা (আঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তখন তারা মূসার সহিত কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু ও মুহাম্মদ (তাঁদের সকলের উপরে আল্লাহ্‌র শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক) এর তুলনা করে না। কারণ, তারা উল্লিখিত মহান ধর্ম-প্রবর্তকগণের কারো দাবীকেই সত্য এবং গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে না। অতএব, নবীদের যে তালিকা ইহুদীরা দেয় তাতে পুরাতন নিয়মে (Old Testament) নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত নবীদের নাম ছাড়া অপর কোন নবীর নাম নেই। এমন কি, অন্যত্র কোথাও নবী আগমনের সম্ভাবনাও সেখানে বাতিল করা হয়েছে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে, যে কোন ইহুদী-নবীর শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবী তারা করে, তা ইসলামের দাবীর সমপর্যায়ে পড়ে না। কেননা ইহুদী ধর্মমতে, বাইবেলের বাইরে কোন নরী নেই। এক্ষেত্রে,বৌদ্ধধর্ম, যরাথুষ্ট্রের ধর্ম, হিন্দুধর্ম প্রভৃতির দাবীও ঠিক একই প্রকারের।

তথাপি, একটা পার্থক্যের কথা মনে রাখতে হবে। যখন আমরা তাদের নবীদের কথা বলি, তখন আমরা এও জানি যে, তারা তাদের ধর্ম পুরুষদেরকে সব সময় নবী বলে উল্লেখ করে না। নবী ও রসূল সম্পর্কে যে ধারণা ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্ম দান করে তা অন্যান্য ধর্মগুলিতে নেই। বরং তারা তাদের ধর্মের প্রবর্তকদেরকে এবং ধর্মগুরুদেরকে মনে করে যে, তারা সবাই পবিত্র ব্যক্তিসত্তা, অথবা ঈশ্বরের অবতার, অথবা স্বয়ং ঈশ্বর,অথবা তদনুরূপ একটা কিছু। সম্ভবতঃ, এ ব্যাপারে, খৃষ্টান ধর্মের দিক থেকে যীশু খৃষ্টকেও ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করাই উচিত। কিন্তু ইসলামের মতে, তথাকথিত এই সকল ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অবতার, অথবা তথাকথিত ঈশ্বর পুত্র বা ঈশ্বর সন্তানরা সকলেই ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী ও রসূল, যাঁদের উপরে পরবর্তীকালে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে তাদের অনুসারীরাই। বস্তুতঃ, আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, ইসলামের মতে, বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র পুরুষদের প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপের যে ব্যাপার তা ঘটেছে একটা ধীর প্রক্রিয়ায়, এটা নবী-রসূলদের সমসাময়িক কোন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার ছিল না। কিন্তু, এ বিষয়ে, আমরা পরে আলোচনা করবো।

অবশ্য ইসলাম যখন এই দাবী করে যে, এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাই হচ্ছেন সকল নবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তখন সে পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মের পবিত্র পুরুষদেরকেও ইহুদী ও ইসলামিক ধারণা মোতাবেক নবীরূপেই গণ্য করে। পুনরুক্তি হলেও বলতে হচ্ছে যে, ইসলাম সমস্ত ঐশী ধর্মের প্রবর্তকদেরকে স্রেফ মানুষরূপেই গণ্য করে যাঁদেরকে আল্লাহ্‌ নবুওয়্যতের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

এই সার্বজনীন ব্যাপারটাতে কোন ব্যতিক্রম নেই। যেমন, পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেঃ

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝

'অতএব, তখন (তাদের) কেমন অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকেও এই সব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো'।(আন্ নিসা - ৪ ঃ ৪২)

এই প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাটা দান করার পর, আমরা এখন কোরআন করীম অনুযায়ী ইসলামের পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদা অনুধাবন করবার চেষ্টা করবো। ইসলামের পবিত্র নবী সম্পর্কে সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং অকাট্য দাবী পেশ করা হয়েছে কোরআন করীমের নিম্নোক্ত বহুবিদিত এবং ব্যাপক আলোচিত আয়াতেঃ

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।' (আহ্যাব - ৩৩ঃ৪১)

এই আয়াতের 'খাতাম'শব্দটির বহু গূঢ় অর্থ রয়েছে, কিন্তু এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, 'খাতামান নবীঈন' উপাধির মর্ম হচ্ছেঃ সর্বোত্তম; সর্বশ্রেষ্ঠ; শেষ কথা; ছুড়ান্ত অথরিটি; সবাইকে পরিবেষ্টনকারী; অন্য সকলের সত্যতার তসদীক বা সত্যায়ণকারী। (আরবী ভাষার সকল অভিধান পি,ডব্লিউ লেন; আকরাব আল্ মুওয়ারিদ; ইমাম রাগিবের মুফ্‌রাদাত; ফাত্‌হ্ ও যুরকানী)।

অন্য একটি আয়াত, যাতে ইসলামের পবিত্র নবীর চরম উৎকর্ষের কথা বলা আছে, তাতে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষাই বিশুদ্ধ এবং চূড়ান্ত। আয়াতটি হচ্ছেঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ

لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে (ধর্মকে) পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপরে আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীনরূপে মনোনীত করলাম।' (মায়েদা - ৫ঃ৪)

এই দাবী থেকে এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, পৃথিবীর সকল শরীয়তবাহী নবীদের মধ্যে এবং পৃথিবীকে সব চাইতে পূর্ণ ও বিশুদ্ধ শিক্ষা দান করার ক্ষেত্রে তিনি (সাঃ) সকল নবীরসূলদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। এই মর্মকথাকে আরো জোরদার করে রসূলে পাক (সাঃ)-কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, যে কিতাব তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হচ্ছে তা সর্বদা রক্ষা করা হবে এবং তাকে সর্ব প্রকারের প্রক্ষেপ থেকেও মুক্ত রাখা হবে। সুতরাং, এই শিক্ষাকে শুধু যে পারফেক্ট বা সম্পুর্ণ বলেই দাবী করা হয়েছে তা নয়, বরং সেই সঙ্গে এই ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে যে, এই কিতাব চিরস্থায়ী হবে, একে বিশুদ্ধ রাখা হবে, এর প্রতিটি শব্দকে ঠিক তেমনি হুবহু রাখা হবে যেভাবে সেগুলি অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইসলামের প্রবর্তক রসূলে পাক (সাঃ)-এর উপরে। এই সত্যের প্রামাণ্য সাক্ষ্য বহন করছে বিগত চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাস।

এক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিক কিছু আয়াত হচ্ছেঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

'নিশ্চয় আমরাই অবতীর্ণ করেছি এই যিকর্ (কোরআন) এবং নিশ্চয় আমরাই এর হেফাযতকারী।' (আল্ হিযর - ১৫ঃ১০)

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

'নিশ্চয়ই, এ অতি গৌরবময় কোরআন, যা রয়েছে সুরক্ষিত ফলকে।' (আল্ বুরুয - ৮৫ঃ ২২, ২৩)

উল্লিখিত আয়াতগুলির আলোকে সিদ্ধান্ত এটাই দাঁড়ায় যে, ইসলামের পবিত্র প্রবর্তক শুধু নিশ্চিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠই ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি ছিলেন চূড়ান্ত ও সর্বশেষ শরীয়ত আনয়নকারী নবী। এবং তাঁর (সাঃ) সেই অথরিটি বা কর্তৃত্ব বলবৎ থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।

এই কথা বলাতে কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, ইসলামের পবিত্র প্রবর্তকের চরম শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এই দাবীটা কি অন্যসব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে একটা বিরূপ

মনোভাবের এবং ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করবে না? তাহলে, ইসলামের যে দাবী, ইসলাম মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই শান্তির গ্যারান্টি দান করে, তার সঙ্গে উক্ত দাবীর তাৎপর্যের সঙ্গতি কোথায়?

এই প্রশ্নটার কথা মনে রেখেই এই দাবীটার ব্যাপারে আমাকে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। এই প্রশ্নটার উত্তর পক্ষপাতমুক্ত ও অনুসন্ধানী মনের সন্তুষ্টির জন্য একাধিকভাবে দেওয়া যায়। পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য অনেক ধর্মের অনুসারীরাও অনুরূপ দাবী করে থাকে। তবে, এতে উত্তেজিত না হয়ে প্রত্যেকের জন্য উচিত হবে যে, পরস্পরের এইরূপ দাবীর গুণাগুণ নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখা,বিচার বিবেচনা করে দেখা। কারো শুধু দাবী-ই যেন অপরাপর ধর্মের অনুসারীদের অনুভূতিতে আঘাত হানার কারণ না হয়। কেননা, অনুরূপ দাবী তো তারা সবাই করে থাকেন।

কিন্তু, ইসলাম এক্ষেত্রে আরো একধাপ অগ্রসর হয় এবং তার অনুসারীদেরকে বিনয় ও শালীনতার শিক্ষা দেয়, যাতে করে রসূলে পাক (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাদের যে বিশ্বাস তা প্রকাশ করতে গিয়ে তারা যেন অসতর্কতার কারণে অন্যদের মনে আঘাত না দেয়।

ইসলামের পবিত্র প্রবর্তকের (সাঃ) নিম্নোক্ত বাণী (হাদীস) দু'টি আলোকবর্তিকারূপে এই বিষয়টির উপরে পর্যাপ্ত আলোকপাত করছেঃ

(১) একদা হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর একজন সাহাবী (সঙ্গী), হযরত ইউনুস (আঃ) যাঁকে একটা বিরাট মাছ (তিনি) গিলে ফেলেছিল, তাঁর একজন গোঁড়া ভক্তের সঙ্গে এক উত্তপ্ত বিতর্কে লিপ্ত হয়। বিতর্কে উভয় পক্ষই এই দাবী করছিলেন যে, তাঁর নবীই হচ্ছেন গুণে গরিমায় অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মুসলমান ব্যক্তিটি (অর্থাৎ সেই সাহাবী - রাঃ), মনে হয় , এমন ভাবে খোঁটা দিয়ে কথা বলছিলেন যে, তাতে ইউনুস নবীর (আঃ) সেই ভক্ত অনুসারী দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন মনে। তিনি মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এলেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষ ঐ সাহাবীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। তখন, রসূলে পাক (সাঃ) সাধারণভাবে সবাইকে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দিলেন, তা হচ্ছেঃ

لا تفضلونى على يونس بن متى

'তোমরা আমাকে মাত্তার পুত্র ইউনুসের চাইতে বড় বলে (এভাবে) প্রচার করো না।' (বুখারী)

হাদীসের অনেক মুসলিম ভাষ্যকার এই হাদীসটি নিয়ে বিব্রত বোধ করেন। কেননা, দৃশ্যতঃ, এই হাদীসটি পবিত্র কোরআনের সেই দাবীটির বিরোধী, যাতে রসূলে করীম (সাঃ) কে শুধু ইউনুস নবীরই (আঃ) নয়, বরং সকল নবী রসূলের (আঃ) চাইতে বড় বলা হয়েছে। কিন্তু, সম্ভবতঃ তারা এই বিষয়টা লক্ষ্য করেন না যে, তিনি (সাঃ) যা বলেছিলেন তার অর্থ এই ছিল না যে, তিনি ইউনুস (আঃ)-এর চাইতে ছোট ছিলেন কিংবা তাঁর চাইতে বড় ছিলেন; বরং তার অর্থ এই ছিল যে, তাঁর (সাঃ) অনুসারীদের এটা উচিত নয় যে, তারা তাঁর বড় হওয়ার বিষয়টাকে এমনভাবে প্রকাশ করে যাতে অন্যান্যদের মনে আঘাত লাগে। এই প্রসঙ্গে, যে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করা যায়, তা হচ্ছে নবী করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে শিষ্টাচারের একটা সবক দিতে চেয়েছিলেন। তাদের তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, তারা যেন দম্ভ বা অহমিকায় পতিত না হয়। তারা যেন তাঁর (সাঃ) মর্যাদা নিয়ে এমনভাবে আলোচনা না করে যাতে অন্যান্যরা মনে আঘাত পায়। অন্যথায়, অনুরূপ মনোভাব ইসলামের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। কেননা, তাতে ইসলামের নবীর জন্য মানুষের মন ও হৃদয়কে তো জয় করা যাবেই না, বরং তাতে উল্টোটাই ঘটবে।

(২) হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর এই মনোভঙ্গীর সমর্থন মিলে অপর একটি হাদীসে। উল্লিখিত বিতর্কের মতই এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন একজন মুসলমান একজন ইহুদীর সঙ্গে। উভয়েই এই দাবী ও পাল্টা দাবী করছিলেন যে, তার ধর্ম গুরুরাই অপরের ধর্মগুরুদের চাইতে বড়। এক্ষেত্রেও, অমুসলিম লোকটি তার প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে নালিশ পেশ করলো। রসূলে পাক (সাঃ) তাঁর অভ্যাসমত বিনয় ও প্রজ্ঞা প্রদর্শন করলেন এবং মুসলমানদেরকে শালীনতা ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়ে বললেনঃ

لا تفضلوني على موسى

'আমাকে মূসার চাইতে বড় বলে ঘোষণা কর না'।(বুখারী)

মোদ্দা কথা, খোদাতা'লার সান্নিধ্য লাভের ক্ষেত্রে নবীদের মধ্যে কে কতটা মর্যাদার অধিকারী তা কেবল খোদাই নির্ধারণ করতে পারেন এবং তিনিই কেবল তা ঘোষণা করতে পারেন। এটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, বিশেষ যুগের বিশেষ কোন ধর্মের প্রেক্ষিতে সেই যুগের নবী সম্পর্কে খোদাতা'লা তাঁর সন্তোষ এমন ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন যাতে মনে হবে যে,সেই নবীই হচ্ছেন সেই যুগের সর্বোত্তম ব্যক্তি। আর যাই হোক, এটাও ঠিক যে, স্থান ও কালের সীমার প্রেক্ষাপটে তুলনার ক্ষেত্রে চরমত্ব প্রকাশক বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। এবং এই ব্যাপারটাই যে কোন পবিত্র পুরুষের

অনুসারীদেরকে এই ধারণায় উপনীত করে যে, তাদের সেই ধর্ম গুরুই হচ্ছেন সকল যুগের, এবং অনাগত সকল সময়েরও, সর্বোত্তম ও পবিত্রতম ব্যক্তি। এই বিষয়টার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস রাখাটাই অন্যের প্রতি আঘাত বলে মনে করা উচিৎ নয়। একটা সভ্য দৃষ্টি ভংগীর জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, এই বিষয়গুলোকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কলহ-কোন্দল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা। এবং এটাই ছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর উপরোক্ত নির্দেশবাণীর মর্মকথা। যদি বিনয়ের এবং শিষ্টাচার-শালীনতার এই নীতিকে সকল ধর্মই মান্য করে চলে, তাহলে ধর্মীয় বাদানুবাদের দুনিয়াটায় একটা শুভ পরিবর্তন সূচিত হবে।

'পরিত্রাণ' কোন ধর্মের একচেটিয়া বিষয় হতে পারে না

পরিত্রাণের প্রশ্নটা, আপাতঃ দৃষ্টিতে যত সাদামাটাই মনে হোক না কেন, তা ধর্মীয় জগতে শান্তি নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী।

একটি ধর্মের পক্ষে এই ঘোষণা দেওয়াটা এক জিনিষ যে, যদি কেউ শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে চায় এবং নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, তবে তাকে সেই ধর্মেরই নিরাপদ আশ্রয়ে আসতে হবেঃ এখানেই সে পরিত্রাণ লাভ করবে। কিন্তু সেই ধর্মের পক্ষে একই সঙ্গে এই ঘোষণাটা দেওয়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ যে, যারা সেই ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করবে না, তারা সকলেই চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে; তারা খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা-ই করুক না কেন, তারা তাদের স্রষ্টাকে এবং তাঁর সৃষ্টিকে যত বেশী ভালবাসুক না কেন, তারা যত বেশী পবিত্র এবং ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করুক না কেন, তারা নিশ্চিতভাবে চিরস্থায়ী এক জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

যখন এই ধরনের একটা কট্টর, সংকীর্ণমনা এবং অসহিষ্ণু মতাদর্শের কথা উত্তেজনাকর ভাষায় প্রকাশ করা হয়, বিশেষতঃ, ধর্মীয় 'জিলোট' বা গোঁড়া ধর্মান্ধদের দ্বারা, তখন, এটা জানা কথাই যে, তাথেকে ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি হয়।

সাধারণ মানুষ নানা ধরনের হয়ে থাকে। কেউবা শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, এবং সভ্য; এরা এদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আঘাত বা অপরাধের প্রতিক্রিয়া এদের অবস্থান অনুসারেই দেখিয়ে থাকে। কিন্তু, ধর্মের প্রতি অনুরাগ পোষণকারী জনসাধারণের একটা বিরাট সংখ্যক অংশ তারা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যা-ই হোক না কেন যখন তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে, তখন তারা মারমুখী হয়ে উঠে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এটাই হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের ধর্মগুরু বা যাজক পুরোহিত প্রভৃতি ব্যক্তিদের মনোভঙ্গী তাদের সম্পর্কে যারা তাঁদের বিশ্বাসকে মেনে নিতে রাজি নয়। । এমনকি, ইসলামকেও, মধ্যযুগীয় (ভাবধারার) আলেমরা পেশ করছে

পরিত্রাণের একমাত্র পথ বলে, এবং এই ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে, ইসলামের আবির্ভাবের পরে, যে সকল আদম সন্তান ইসলামের গন্ডীর বাইরে থেকে মারা গেছে তারা কেউ পরিত্রাণ পাবে না। খৃষ্টধর্মও এথেকে ভিন্ন কিছু বলে না, অন্য কোনও ধর্মও না, অন্ততঃ আমার জানা মতে।

কিন্তু আমি আমার শ্রোতৃবর্গকে এই নিশ্চয়তা দিতে চাই যে, ইসলামের প্রতি এইরূপ একটা গোঁড়া এবং সংকীর্ণ মতাদর্শ আরোপের কোন সমর্থন নেই ইসলামে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন আমাদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে।

কোরআন করীমের মতে, পৃথিবীতে এমন কোন বিশেষ ধর্ম নেই, যা কিনা পবিত্রাণের উপরে তার একচেটিয়া অধিকার রাখে। যদি নতুন কোন সত্যও অবতীর্ণ হয়, এবং আলোকের নবযুগ সূচিত হয়, আর তা যারা জানতে পারবে না, এবং এই না জানাটার জন্য যদি তাদের নিজেদের কোন দোষ না থাকে, তাহলে তারা এবং যারা কোনও ভ্রান্ত আদর্শের উত্তরাধিকারী হয়েও সাধারণভাবে সত্য ও সৎ জীবন যাপন করার চেষ্টা করে থাকে, তাদেরকেও আল্লাহ্ পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করা হয়েছে, কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতেঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ
فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝

'আমরা প্রত্যেক উম্মতের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করেছি, তদনুসারে তারা পালন করে; সুতরাং তারা যেন তোমার সঙ্গে এই বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ না করে, তুমি তাদেরকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, নিশ্চয় তুমি সঠিক হেদায়াতের উপরে আছ।' (আল্ হাজ্জ - ২২ ঃ ৬৮)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে (মুহাম্মদ-সাঃ-এর উপরে) এবং যারা ইহুদী হয়েছে তারা এবং সাবীরা এবং খৃষ্টানরা-যে কেউ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকাজ করে, না তাদের কোন ভয় থাকবে, এবং না তারা দুঃখিত হবে।' (আল্ মায়েদা - ৫ঃ৭০)

আমি আপনাদেরকে স্মরণ করায়ে দিতে চাই যে, 'আহলে কিতাব' কথাটি যদিও সাধারণতঃ ইহুদী ও খৃষ্টানদের জন্যই ব্যবহৃত হয়, তবু, তাৎপর্যের দিক থেকে কথাটি ব্যাপকতর অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে। কোরআনের যে দাবীঃ 'দুনিয়াতে এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে আমরা কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিনি'-সেই দাবীর এবং অন্যান্য আয়াতের (উপরে উদ্ধৃত) পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই জাতিগুলি মাত্র 'পুরাতন নিয়ম ও সুসমাচার' (তৌরাত ও ইঞ্জিল) কিতাবে উল্লেখিত জাতিগুলিই নয়, যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল বরং এটা নিশ্চিত যে, মানবজাতির মঙ্গলার্থে অন্যান্য কিতাবও অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং যে সকল ধর্ম এই দাবী রাখে যে, সেগুলি প্রবর্তিত হয়েছে ঐশী বাণীর ভিত্তিতে, সেগুলিকে 'আহলে কিতাবের' অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে হবে।

এছাড়া, কোরআন পাকে একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'সাবী'-যদ্বারা এ বিষয়টি থেকে সকল সন্দেহ অপনোদন করা হয়েছে। 'সাবী' শব্দটি আরবরা সেই সকল অনারব এবং অসেমেটিক ধর্মগুলির জন্য ব্যবহার করতো যাদের নিজেদের ঐশী ধর্মগ্রন্থ ছিল। সুতরাং ঐশীবাণীর ভিত্তিতে প্রবর্তিত ধর্মসমূহের অনুসারীদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, যদি তারা নবাগত ধর্মের আলো চিনতে সত্যিসত্যিই অপারগ হয়, এবং সততার সঙ্গে ও সঠিকভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের মূল্যবোধসমূহকে পালন করে, তাহলে খোদাতা'লার তরফ থেকে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা পরিত্রাণ থেকেও বঞ্চিত থাকবে না।

পবিত্র কোরআন মুমিনদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে, তা তারা ইহুদী, খৃষ্টান বা সাবী যে দলেরই হোক না কেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা হচ্ছেঃ

أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

'তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর নিকটে (যথাযোগ্য) পুরস্কার; তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (আল্ বাকারা - ২ ঃ ৬৩)

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ

لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝

'এবং যদি তারা তওরাত ও ইঞ্জিল এবং তাদের প্রভুর নিকট থেকে তাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করতো, তাহলে নিশ্চয় তারা তাদের উর্ধ্বদেশ থেকেও এবং তলদেশ থেকেও (নেয়ামতসমূহ) ভোগ করতো। অবশ্য, তাদের মধ্যে একদল মধ্যপন্থী লোক আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক যে কাজকর্ম করছে তা অতিশয় মন্দ।' (আল্ মায়েদা - ৫ঃ৬৭)

যারা ইসলামের গণ্ডীভুক্ত নয় তাদের সবাইকে নির্বিচারে নিন্দা ভর্ৎসনা করার বিরুদ্ধে মুসলমানদের পবিত্র কোরআন নির্দেশ দেয়ঃ

لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ
ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۝ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَ
يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ۝
وَمَا يَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ
بِٱلْمُتَّقِينَ ۝

'তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে এমন অনেক দলও আছে যারা (তাদের অঙ্গীকারে) কায়েম আছে, তারা রাত্রির বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং তারা (তাঁর সম্মুখে) সিজদা করে। তারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ এবং অন্যায় অসঙ্গত কাজে বারণ করে, এবং সৎকাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। বস্তুতঃ, এরাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা যে কোন সৎকাজই করুক না কেন, তাদেরকে তাঁর প্রতিদানে কখনও অস্বীকার করা হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।' (আলে ইমরান - ৩ঃ১১৪-১১৬)।

সাম্প্রতিককালে, ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যেকার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে একটা বিরাট ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, এবং তা হচ্ছে ইসলামের মতে ইহুদীরা সবাই জাহান্নামী। এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা তা আমি প্রমাণ করেছি কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতগুলির মাধ্যমে। এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকেও তা প্রমাণিত হয়ঃ

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ۝

'এবং মূসার জাতির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে যারা সত্যের সাহায্যে হেদায়াত পাচ্ছে এবং তার সাহায্যে ন্যায় বিচার করছে।' (আরাফ - ৭ঃ১৬০)

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উন্নতি সাধন

পবিত্র কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেবল মুসলমানরাই যে অপরাপর ধর্মের অনুসারীদের প্রতি উপদেশ দিচ্ছে এবং সুবিচার করছে তা নয়, বরং এমন আরও অনেক জাতি আছে যারা অনুরূপ কাজ করছে।

এই দৃষ্টিভংগীটাকে আজ পৃথিবীর সকল ধর্মকেই গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে অপরাপর ধর্মবিশ্বাসগুলোর সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে উন্নতি করা যায়। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী জাতিগুলোর প্রতি অনুরূপ উদার মনোভাব, মহানুভবতা এবং মানসিক সমঝোতার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে না পারলে ধর্মীয় শান্তি কোনক্রমেই অর্জিত হবে না।

পবিত্র কোরআন, সাধারণভাবে, দুনিয়ার সকল ধর্ম সম্পর্কেই একথা বলেঃ

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ۝

'এবং আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে একটা দল আছে যারা (লোকদেরকে) সত্যের সাহায্যে হেদায়াত দেয় এবং তদ্বারা ন্যায় বিচার করে।' (আল্ আরাফ - ৭ঃ১৮২)

সার্বজনীনতার ধারণা

স্মরণাতীত কাল থেকেই বহু দার্শনিক এমন একটা সময়ের স্বপ্ন দেখে আসছেন, যখন সমগ্র মানবজাতি একই পরিবার হিসেবে একই পতাকার তলে সমবেত হবে। মানবজাতিকে একীভূত করার এই ধারণা বা কনসেপ্ট শুধু যে রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের দ্বারাই সমর্থিত বা গৃহীত হয়েছে তা নয়, বরং এই ধারণাটি একইভাবে অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারাও সমর্থিত ও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই ধারণাটির প্রতি ধর্ম

জগতে যত বেশী গুরুত্ব সহকারে জোর দেওয়া হয় ততটা জোর আর কোথাও দেওয়া হয় না।

ইসলাম যদিও, বাহ্যতঃ, সাধারণ অর্থে, অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে (যেগুলির কোন কোনটা বিশ্বকে শাসন করার অতি উচ্চ অভিলাষ রাখে) এ ব্যাপারে অভিন্ন অভিমতই পোষণ করে, তথাপি ইসলামের অবস্থান তার দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে ঐ সকল উচ্চাভিলাষী দাবী থেকে সুস্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র। এই বিতর্কিত বিষয়টি বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। তাছাড়া, এক্ষেত্রে এই বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ারও অবকাশ নেই যে, সমগ্র মানবজাতিকে একই ঐশী পতাকার তলে সমবেত করার জন্যে আসলে কোন ধর্মকে আল্লাহ্ কর্তৃক ক্ষমতা দান করা হয়েছে। যদি দুটো, তিনটে বা চারটে শক্তিশালী ধর্ম, যেগুলির প্রত্যেকটির দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রয়েছে, একইসঙ্গে সার্বজনীন ধর্ম হওয়ার দাবী করে, তাহলে কি তা সকল মানুষের মনের মধ্যে একটা বাজে বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তার জন্ম দিবে না? বিশ্ব শাসনের জন্য তাদের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংগ্রাম কি তখন বিশ্ব শান্তির জন্য একটা সত্যিকারের দারুণ হুমকী স্বরূপ দেখা দিবে না?

ধর্মগুলোর পক্ষে বিশ্বজোড়া এই জাতীয় আন্দোলনগুলো নিজেদের জন্যই দারুণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সেইসঙ্গে এই বিপদও দেখা দিচ্ছে যে, ঐ আন্দোলনগুলো চলে যাচ্ছে এক শ্রেণীর দায়িত্বহীন, ধর্মান্ধ এবং অসহিষ্ণু নেতৃত্বের হাতে। যার অর্থ হচ্ছে, এ ব্যাপারে যেসব ঝুঁকির আশংকা আছে, তা বহু গুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা শুধু একাডেমিক বা আলোচনার পর্যায়ে না থেকে সত্যি সত্যিই ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলনরূপে দেখা দিচ্ছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে, দুর্ভাগ্যবশতঃ, একটা অপপ্রচার চালানো হয় যে, ইসলাম তার মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানেই বল প্রয়োগ করে থাকে। এই ধরনের কথা শুধু যে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরাই বলে থাকে তা না, বরং তা মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন মুসলিম উলেমার কাছ থেকেও শোনা যায়।

যদি কোন ধর্ম আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে অপরাপর ধর্মগুলিরও এই অধিকার জন্মাবে যে, তারাও সেক্ষেত্রে, একই অস্ত্রে নিজেদেরকে রক্ষা করবে।

অবশ্য, আমি এ ব্যাপারে একমত নই এবং আমি তা জোরের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করি যে, ইসলাম তার মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করার পক্ষপাতি। তবে, বিষয়টা নিয়ে আমি পরে আলোচনায় ফিরে আসবো।

প্রথমে আমরা দেখতে চাই যে, পৃথিবীর কোনো ধর্মের এই ধরনের দাবীর পিছনে কোন যৌক্তিকতা আছে কি না। কোনও একটি ধর্ম - তা সে ইসলাম, খৃষ্টধর্ম অথবা অন্য যে ধর্মের কথাই আপনি বলুন না কেন, তা কি তার বাণীর ক্ষেত্রে সার্বজনীন হতে পারে? যে সার্বজনীনতার অর্থ এই যে, তার বাণী বর্ণ গোত্র জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য? তাহলে , সেক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয়, উপ-জাতীয়, জাতীয় ঐতিহ্যের অধিকারী , ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ এবং সাংস্কৃতিক ধারা ও কর্মকান্ডের অধিকারী লোকদের অবস্থা কি হবে?

ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বজনীনতার ধারণাটা এমন হওয়া চাই যে, তা শুধু ভৌগলিক ও জাতীয় সীমারেখাকেই অতিক্রম করবে না, তাকে সময় বা কালের সীমাকেও অতিক্রম করতে হবে। তাহলে, যে প্রশ্নটা দেখা দিবে, তা হচ্ছেঃ কোনো ধর্ম কি চিরন্তন হতে পারে? অর্থাৎ কোনো ধর্মের শিক্ষা কি সমান কার্যাকারিতা নিয়ে এই যুগের মানুষের জন্যেও প্রযোজ্য হবে, এবং হাজার বছর পূর্বের কিংবা হাজার বছর পরের মানুষের জন্যেও প্রযোজ্য হবে? এমনকি, যদি কোনও একটা ধর্মকে পৃথিবীর গোটা মানবজাতিটাই গ্রহণ করে নেয়ও, তাহলেও প্রশ্ন উঠবে যে, কি করে সেই ধর্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোর প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে?

এক্ষেত্রে প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের কর্তব্য হবে, উল্লিখিত সমস্যাবলীর সমাধান কীভাবে সম্ভব, তা তাদের নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষানুযায়ী উপস্থাপন করা। যাহোক, আমি ইসলামের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নগুলোর যে ইসলামী উত্তর তা অতি সংক্ষেপে পেশ করতে চাই।

ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম

পবিত্র কোরআন বার বার এ বিষয়টা পরিষ্কার করে বলেছে যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার শিক্ষা মানুষের মন ও আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইসলাম জোর দিয়ে বলে যে, মানবমন বা মানবাত্মার মধ্যে প্রোথিত যে ধর্মের মূল তা স্থান ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। মানবাত্মা অপরিবর্তনীয়। সুতরাং যে ধর্মের মূল প্রকৃতই মানবাত্মার অভ্যন্তরে প্রোথিত, তা অপরিবর্তনশীল। অবশ্য, যদি তা মানুষের পরিবর্তনশীল অবস্থাদির মধ্যে খুব বেশী জড়িয়ে না পড়ে, তা সে যে কোন যুগই হোক, আর মানুষ যত বেশী প্রগতিই সাধন করুক। যদি কোন ধর্ম, সেই সমস্ত নীতির উপরে অটল থাকে, যা মানবাত্মা থেকে স্বতঃ উৎসারিত,তবে সেই ধর্মের পক্ষে একটি সার্বজনীন ধর্মরূপে পরিণতি লাভ করার যৌক্তিক সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলাম আরও একধাপ অগ্রসর। ইসলাম তার অনন্য অনুধ্যায়ী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে এই মত পোষণ করে যে, পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যেই কিছু না কিছু সার্বজনীনতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং, প্রতিটি অবতীর্ণ ঐশী ধর্মে শিক্ষার এমন একটা কেন্দ্রীয় মর্ম পাওয়া যায়, যা কিনা মানবাত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যা চিরন্তন সত্য। ধর্মগুলোর এই যে মর্ম,তা অপরিবর্তিত থাকে, যদি না কোন ধর্মের অনুসারীরা পরবর্তীকালে সেই ধর্মের শিক্ষাকে কলুষিত করে ফেলে।

এই বিষয়টা সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতেঃ

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝

'এবং তাদেরকে (আহলে কিতাব) এ ছাড়া আদেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা কেবল আল্লাহ্‌রই এবাদত করবে, ধর্মকে তারই জন্য বিশুদ্ধ করে একনিষ্ঠভাবে এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে এবং এটাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী ধর্ম।" (আল বাইয়েনাহ্ - ৯৮:৬)

فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ۝

'অতএব, তুমি তোমার সমস্ত মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর। আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) প্রকৃতিকে (তুমি অনুসরণ কর) যার উপরে তিনি মানবকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই চিরস্থায়ী ধর্ম কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়'। (আর্ রূম-৩০:৩১)

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে হয়তো প্রশ্ন উঠবে যে, একই শিক্ষাসহ একের পর এক ধর্ম পাঠাবার যৌক্তিকতা কোথায়? তাছাড়া,যে কেউ এই প্রশ্নও তুলতে পারেন যে, যদি সকল ধর্মের শিক্ষাই অপরিবর্তনীয় এবং সার্বজনীন হয়, এবং তা সকল যুগের মানুষের জন্যই প্রযোজ্য হয়, তাহলে ইসলাম কেন এই দাবী করে যে, পূববর্তী সকল ধর্মের তুলনায় তার শিক্ষাই অধিকতর সার্বজনীন এবং বিশুদ্ধ?

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকাতে (নবম সংস্করণ), বলা হয়েছেঃ 'অতি সামান্য করনিক (ক্লারিক্যাল) ত্রুটি বিচ্যুতি হয়তো থাকতে পারতো, কিন্তু ওসমানের (সংগৃহীত) কোরআনে তেমন কিছুও নেই, আছে শুধু খাঁটি অংশগুলোই, যদিও কখনও কখনও তার বিন্যাস খুবই অস্বাভাবিক। ইয়োরোপীয় পন্ডিতদের কোরআনের মধ্যে পরবর্তী কোন প্রক্ষেপের অস্তিত্ব প্রমাণের তাবৎ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।' (প্রফেসর নলডিকিঃ কোরআন)।

বিতর্কের এটা একটা সম্পুর্ণ ভিন্ন এলাকা যে, কোন কিতাব কার দ্বারা প্রণীত হয়েছে। কিন্তু সেই একই কিতাব যার খোদাতা'লা কর্তৃক প্রণীত হওয়াকে সব আহলে কিতাবই চ্যালেঞ্জ করে থাকে, তা এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করছে যে, শুধু তৌরাত ও ইঞ্জিলই (পুরাতন নিয়ম ও সুসমাচারসমূহ) খোদা কর্তৃক আংশিকভাবে প্রণীত নয়, বরং পৃথিবীর অন্যসব এলাকার অন্যসব ধর্মের অন্যসব কেতাবগুলিও, প্রশ্নাতীতভাবে, তদ্রূপ একই খোদা কর্তৃক প্রণীত। যে সমস্ত পরস্পর বিরোধিতা, আজকের দিনে, সেগুলির মধ্যে পাওয়া যায় তা সবই মানুষের সৃষ্ট। বলা প্রয়োজন যে, পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গী এ ব্যাপারে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং তা সকল ধর্মের মধ্যে শান্তি স্থাপনে কার্যকরভাবে সহায়ক।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রসঙ্গে, পবিত্র কোরআন মানব সমাজের প্রতিটি পর্যায়ের বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুন ধর্মের প্রয়োজন শুধু এজন্যই হয়নি যে, পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর মৌলিক শিক্ষা, যা কিনা মানুষের হস্তক্ষেপে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল - তা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল, বরং সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও নতুন নতুন শিক্ষা দানেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল প্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য।

(৩) এটাই সবকিছু নয়। আর একটা উপাদান এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কাজ করে থাকে, এবং তা হচ্ছে- সময় সম্পৃক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা, যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল শুধু বিশেষ কোন সময়ের বা মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা মিটাবার উদ্দেশ্যে। এর অর্থ হচ্ছে– ধর্মগুলি শুধু যে অপরিবর্তনশীল নীতিসমূহের কেন্দ্রীয় মর্ম দিয়েই গঠিত, তা নয়। বরং, সেই সঙ্গে সেগুলি এক প্রকার লেবাসী, গৌণ ও পরিবর্তনশীল শিক্ষা দ্বারাও সজ্জিত।

(৪) সবশেষে বলা দরকার যে, মানুষকে একচোটেই ঐশী শিক্ষায় এবং প্রশিক্ষণে শিক্ষিত ও সুদক্ষ করে তোলা হয়নি। বরং তাকে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে মনন-চিন্তনে পরিণত করে তোলা হয়েছে, যে পর্যায়ে তাকে তার হেদায়াতের (সৎপথে পরিচালিত

হওয়ার) জন্য প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য ও সমর্থ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কোরআনের দাবী মতে, চিরস্থায়ী মৌলিক নীতিসমূহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একটা গৌণ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষাও অবতীর্ণ হয়েছে চূড়ান্ত, পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম শিক্ষা অর্থাৎ ইসলামেরই একটা অংশরূপেই। যে বিষয়গুলো ছিল স্রেফ স্থানীয় এবং সাময়িক সেগুলো রহিত করা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে। বাকী যা সব, অতঃপর, সদা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে, তা সবই রেখে দেওয়া হয়েছে, রক্ষা করা হয়েছে। (দ্রঃ,৫ঃ১৪-১৬)

এটাই হচ্ছে, আসলে ধর্মীয় সার্বজনীনতার ইসলামিক ধারণা বা কনসেপ্ট। এবং ইসলামের দাবীও এটাই। এখন এটা মানুষেরই দায়িত্ব যে, সে বিভিন্ন দাবীকারকের তুলনামূলক গুণাগুণের অনুসন্ধান করবে, বিচার করবে।

এখন, আবারও একবার আমরা সেই সকল ধর্মের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাই, যেগুলো নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে বিশ্ব–প্রাধান্য অর্জনের লক্ষ্যে। স্পষ্টতঃই, ইসলাম এইরূপ উচ্চাভিলাষকে সমর্থন করে। পবিত্র কোরআন, ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে ঘোষণা করে যে, ইসলাম একদিন মানবজাতির একমাত্র ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে ঃ

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ
وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۝

'তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সকল ধর্মের উপরে জয়যুক্ত করে দেন, মুশরেকরা যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন।' (আস্ সাফ্ফ্ - ৬১ঃ১০)

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি সৃষ্টির অঙ্গীকার সত্ত্বেও, ইসলাম অন্যান্যদের উপরে প্রাধান্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণী ও আদর্শের প্রতিযোগিতামূলক বিস্তারকে নিরুৎসাহিত করে না। বস্তুতঃ, এরই মাধ্যমে একটি মহৎ লক্ষ্য হিসেবে অন্যান্য সব ধর্মের উপরে ইসলামের চূড়ান্ত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এবং এজন্যই ইসলামের অনুসারীদের উচিত ক্রমাগতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সাঃ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোরআন করীম বলেঃ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى

لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ
فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ
وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

"তুমি বল 'হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য সেই আল্লাহ্‌র রসূল যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর এই রসূল, উম্মী নবীর উপর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ এবং তার বাণীসমূহের উপর এবং তোমরা তাকে অনুসরণ কর যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।" (আল্ আরাফ - ৭ঃ১৫৯)

যাহোক, পরস্পর সংঘাত ও ভুল বুঝাবুঝি অবসানের লক্ষ্যে, ইসলাম (মানুষের) আচরণেরও একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দান করেছে। যার ফলে, সবার জন্য ন্যায্য ব্যবহার, নিরংকুশ সুবিচার, বাক্-স্বাধীনতা, প্রকাশের অধিকার এবং ভিন্নমত পোষণের অধিকার নিশ্চিত হতে পারে।

সংগ্রামের উপকরণ, বাধ্যবাধকতা নেই

সংঘাত-সংঘর্ষ না ঘটিয়েও একটা ধর্ম কী করে দাবী করতে পারে যে, তা সার্বজনীন, আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন?

সার্বজনীন বাণী এবং একই পতাকার তলে সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করবার বিশ্বজনীন উচ্চাভিলাষ নিয়ে কোন ধর্মই ক্ষণিকের জন্যেও এই ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, সে তার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করবে।

'তরবারি ভূখন্ড দখল করতে পারে, কিন্তু হৃদয় নয়'

'বল মাথা নত করাতে পারে, কিন্তু মন নয়।'

ইসলাম তার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগের অনুমতি দেয় না। ইসলাম ঘোষণা করেঃ

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ

'ধর্মের ব্যাপারে বল প্রয়োগ নেই, কারণ সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে ... ।' (আল্ বাকারা - ২ঃ২৫৭)

সুতরাং, জবরদস্তির কোনও প্রয়োজন নেই। এটা মানুষের কাছেই ছেড়ে দাও, তারাই ফয়সালা করুক, সত্য কোথায়। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌তা'লা পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তিনি যেন সমাজের সংস্কার সাধন করতে গিয়ে বল প্রয়োগের কোন ধারণাই মনে স্থান না দেন। সংস্কারক হিসেবে তাঁর (সাঃ) অবস্থানকে সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝

"সুতরাং, তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি কেবল একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের জন্য জিম্মাদার নও।" (আল্ গাশিয়াহ্ - ৮৮ঃ২২,২৩)

এই বিষয়টার উপর আরও জোর দেওয়ার জন্যে হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছেঃ

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ

"কিন্তু যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে আমরা তোমাকে তাদের উপরে হেফাযতকারী করে পাঠাইনি। কেবল (সংবাদ) পৌঁছিয়ে দেওয়াই তোমার কর্তব্য।" (আশ্ শূরা - ৪২ঃ৪৯)

এমনকি , নতুন আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে যদি সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং তাতে উগ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহলে, সেক্ষেত্রে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে ধৈর্য প্রদর্শন করবার, ঐকান্তিকতা অবলম্বন করবার এবং যথা-সম্ভব সংঘর্ষ এড়িয়ে চলবার নির্দেশ দেয়। এজন্য, যখনই মুসলমানকে সারা বিশ্বে ইসলামের বাণী প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখনই তার জন্যে একটা পরিষ্কার আচরণ বিধিও দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কোরআন শরীফে বহু আয়াত আছে। তন্মধ্যে, আমরা কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি এখানে বিষয়টাকে পরিষ্কার করার জন্যেঃ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

'তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্‌বান কর এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক কর যা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয়

তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে; এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।' (আল্ নহল - ১৬ঃ১২৬)

এবং ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝

'তুমি মন্দকে তার দ্বারা প্রতিহত কর যা সর্বোত্তম, তারা যা বর্ণনা করে আমরা তা ভালভাবেই জানি।' (আল্ মু'মেনুন - ২৩ঃ৯৭)। এখানে 'আহ্সান' শব্দটির অর্থ হচ্ছে সর্বোত্তম, সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এবং সুন্দর।

যে আচরণ বিধির আওতায় মুমিনরা অবিশ্বাসীদের কাছে এই বাণী পৌছায় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআন নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেঃ

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

'কসম মহাকালের। নিশ্চয় ইনসান (মানুষ) বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতিরেকে যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকাজ করে, এবং তারা একে অপরকে সত্যের (উপর দৃঢ় থাকার ও তা প্রচার করার) তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে কষ্ট ক্লেশ ও বিপদ আপদে) একে অপরকে ধৈর্যের ও তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে।' (আল্ আসর - ১০৩ঃ২-৪)

আবারও- ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

'অতঃপর,সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঈমান আনে এবং ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয় এবং দয়া করার জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয়।' (আল্ বালাদ - ৯০ঃ১৮)

যোগ্যতমের উত্তরণ

পবিত্র কোরআনের মতে, কোন বাণীর উত্তরণ ও তার চূড়ান্ত বিজয় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করে তার যুক্তি প্রমাণের সারবত্তার উপরে, তার বস্তুগত বল-বিক্রমের উপরে নয়। এ বিষয়টাতেও পবিত্র কোরআন অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। এই গ্রন্থ ঘোষণা করে যে, সত্যকে উৎখাত করার এবং মিথ্যাকে সমর্থন করার জন্য যদি সর্বাপেক্ষা প্রচন্ড শক্তি ও বল প্রয়োগ করাও হয়, তাহলে সেই প্রচেষ্টা প্রতিবারই পরাজিত ও ব্যর্থ হবে। যুক্তি সব সময়েই বস্তুগত অস্ত্রের নিষ্ঠুর শক্তির উপরে বিজয় লাভ করবে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে

قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن
فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ
ٱلصَّٰبِرِينَ ۝

'কিন্তু যারা বিশ্বাস রাখতো যে, তারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করবে, তারা বললো, কত ছোট ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় বড় দলের উপরে জয়যুক্ত হয়েছে, এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (আল্ বাকারা - ২ঃ২৫০)

উল্লিখিত ঐশী আদেশের প্রেক্ষিতেই ইসলামী আধিপত্য ও প্রাধান্যের ধারণাকে অনুধাবন করতে হবে।

কোরআন শরীফের অন্য একটি আয়াতের এক অংশে বলা হয়েছেঃ

رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ
حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝

'তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহ্‌র দল, জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে।' (আল্ মুজাদিলাহ্ - ৫৮ঃ২৩)

বদরের যুদ্ধের সময়ে (বদরযুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম যুদ্ধ) মক্কার পৌত্তলিকরা তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিল মুসলমানদের একটা ক্ষুদ্র দলের বিরুদ্ধে। এই ক্ষুদ্র দলটির সংখ্যার তুলনায় মক্কার মুশরেকদের সৈন্যদলের সংখ্যা ছিল বিপুল; মুসলমানদের অস্ত্রের তুলনায় ওদের অস্ত্রও যুদ্ধ-সামগ্রী ছিল প্রচুর। এবং ওরা মুসলমানদেরকে বাধ্য করেছিল একটা অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। এবং মুসলমানরা সেই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করেছিল তাদের আদর্শ রক্ষার জন্য, জান বাঁচাবার জন্য নয়। এর উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে পবিত্র কোরআন বলেছেঃ

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ
وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

'.... যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলীল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হয়েছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলীল-প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করেছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।' (আল্ আন্‌ফাল - ৮ঃ৪৩)

এটাই হচ্ছে সেই চিরস্থায়ী নীতি যা মানবজাতির বিবর্তনে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই বাণীর মর্ম হচ্ছে যোগ্যতমের উত্তরণ। বস্তুতঃ, এটাই হচ্ছে জীবনের বিবর্তনের নীতি-পদ্ধতি।

বাক্-স্বাধীনতা

বাক-স্বাধীনতা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন মানুষের মর্যাদা পুনঃস্থাপনের জন্য অপরিহার্য তেমনি তা অপরিহার্য কোন বাণীর প্রচারের জন্যেও। কোন ধর্মই যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না, যদি না তা নিজে মানবীয় মর্যাদা পুনঃস্থাপন ও সংরক্ষণের কথা বলে।

যা অতীত হয়ে গেছে তারই আলোকে এটা তো পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, ইসলামের ন্যায় একটি ধর্মের পক্ষে বাক-স্বাধীনতা এবং প্রকাশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। অপর পক্ষে, বস্তুতঃ, ইসলাম এমনভাবে এবং এমন জোরের সঙ্গে এই নীতিকে সমর্থন করে, যা পৃথিবীতে অন্য আর কোন মতাদর্শে বা ধর্মে কদাচিৎ দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেঃ

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ۝

'এবং তারা বলে, যারা ইহুদী অথবা খৃষ্টান তারা ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটা তাদের একটা বৃথা আকাঙ্খা মাত্র। তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' (বাকারা - ২ঃ১১২)

আবার,-

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ
وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ۝

"তারা কি তাঁকে ছেড়ে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? তুমি বল, 'তোমরা নিজেদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহা (এই কোরআন) তাদের জন্যেও মর্যাদার কারণ যারা আমার সঙ্গে আছে এবং তাদের জন্যেও মর্যাদার কারণ যারা আমার পূর্বে অতীত হয়ে গেছে।'

কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্যকে চিনে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (আল্ আম্বিয়া - ২১ঃ২৫)

এবং

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

"এবং আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী বের করে আনব, অতঃপর বলবো, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন তারা জানতে পারবে যে, সকল সত্য (কেবল) আল্লাহ্‌র জন্য, এবং যা কিছু তারা রটনা করতো, তা সমস্তই তাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে যাবে।" (আল্ কাসাস - ২৮ঃ৭৬)

এবং

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ۝ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

"তোমাদের নিকট কি কোনও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে? সুতরাং, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমরা তোমাদের কিতাব পেশ কর।" (আস সাফ্‌ফাত - ৩৭ঃ১৫৭,১৫৮)

সমসাময়িক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা ও মুক্তি

স্বাধীনতা ও মুক্তি - দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোগান আজ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন তাৎপর্য ও তীব্রতাসহ উচ্চারিত হচ্ছে এবং তা সারাটা বিশ্বকেই প্রভাবান্বিত করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষ এখন স্বাধীনতার গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে উত্তরোত্তর সতর্ক ও সচেতন হয়ে উঠছে। মুক্তির জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই একটা তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু কোথেকে তা সম্ভব হবে? তাকি সম্ভব হবে বিদেশী শাসনের জোঁয়াল থেকে? তা কি সম্ভব হবে একনায়কত্ব থেকে? ধর্মতান্ত্রিক অথবা সর্বময় ক্ষমতার দর্শন থেকে? নিপীড়নকারী গণতন্ত্র থেকে? দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র থেকে? ধনী দেশগুলির দ্বারা গরীবদেশগুলোর গলাচিপা অর্থনীতি থেকে? অজ্ঞতা থেকে? কুসংস্কার থেকে? অন্ধ বস্তুপূজা থেকে?

ইসলাম এই সমস্ত ব্যাধি থেকেই মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু, এমন কোন পন্থায় নয় যাতে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, বিভেদ বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং যাতে প্রতিহিংসার কারণে নির্বিচারে নির্দোষ ও নিরীহদের জন্য দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়।

অর্থাৎ ইসলামের বাণী হচ্ছে ঃ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝

'আল্লাহ্ কলহ-বিশৃঙ্খলা ভালবাসেন না।' (আল বাকারা - ২ঃ২০৬)

ইসলাম অন্যান্য ধর্মগুলির মতই দেওয়া-নেওয়ার নীতির ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ স্বাধীনতার উপরেই জোর দেয়। নিরংকুশ স্বাধীনতার ধারণা সমাজের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে একটা ফাঁকা, উদ্ভট ও অবাস্তব ধারণা। অনেক সময় স্বাধীনতার এই ধারণাকে এমনভাবে ভুল বুঝা হয়, এবং এমনভাবে তার অস্ত্রপ্রয়োগ করা হয় যে, তখন বাকস্বাধীনতার কাংখিত নীতির সৌন্দর্য রূপান্তরিত হয়ে যায় এক কদর্য স্বাধীনতায় গালাগালির স্বাধীনতায়, অবমাননার স্বাধীনতায় এবং ঈশ্বরনিন্দার স্বাধীনতায়।

ঈশ্বরনিন্দা (Blasphemy)

মানুষকে বাক-স্বাধীনতা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা দানের ক্ষেত্রে ইসলাম অন্য সব ধর্মের চাইতে এক ধাপ এগিয়ে আছে। সন্দেহ নেই যে, ইসলাম নৈতিকভাবে এবং নীতিশাস্ত্রগতভাবে ঈশ্বরনিন্দার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায় বটে, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য কোন জাগতিক শাস্তিদানকে সমর্থন করে না, যদিও তা সমসাময়িক বিশ্বে, সাধারণভাবে, সমর্থন করা হয়।

গভীর মনোযোগ সহকারে, ব্যাপকভাবে বার বার কোরআন শরীফ পাঠ করেও আমি তার মধ্যে এমন একটি আয়াতও পাইনি যাতে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরনিন্দা মানব-প্রদত্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যদিও পবিত্র কোরআন অতি কঠোর ভাষায় অশিষ্ট আচরণ ও অশালীন কথাবার্তার বিরুদ্ধে কথা বলেছে, অন্যদের অনুভূতিতে, কারণ থাক আর না থাক, আঘাত করার বিরুদ্ধে বলেছে, তথাপি ইসলাম না তো ইহজগতে ঈশ্বরনিন্দার শাস্তিদানকে সমর্থন করেছে, না সেই ক্ষমতা কাউকে দান করেছে।

পবিত্র কোরআনে ঈশ্বরনিন্দার কথা বলা হয়েছে পাঁচ বারঃ

(১) দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ অর্থে বলা হয়েছে এভাবেঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا
تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝

"এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে শুন যে, ঐগুলিকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ঐগুলির প্রতি বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তাদের সঙ্গে বসিও না, যে পর্যন্ত না তারা তা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, অন্যথায় সে ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাদেরই মত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল মুনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (আন্‌ নিসা - ৪ঃ১৪১)

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ
ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ
ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝

"এবং যখন তুমি তাদেরকে দেখ যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেও যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তা ছাড়া অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণ হওয়ার পর তুমি কখনও যালেম জাতির সঙ্গে বসবে না।" (আল্‌ আনাম - ৬ঃ৬৯)

ঈশ্বরনিন্দার জঘন্য খারাপীর বিরুদ্ধেও কত সুন্দর প্রতিক্রিয়া!

ইসলাম ঈশ্বরনিন্দা বা ধর্মনিন্দাকারীকে শাস্তিদানের ক্ষমতা কোনও মানুষের হাতে তুলে দেয় না। শুধু তাই নয়, ইসলাম এই কথাও বলে যে, যেখানে বা যে সভায় ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়, হাসি-ঠাট্টা করা হয়, সেই স্থান থেকে সাময়িকভাবে উঠে এসে বা ওয়াক-আউট করে ধর্মনিন্দা বা ঈশ্বরনিন্দার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করাই শ্রেয়ঃ। সরাসরি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা তো দূরস্থান, কোরআন করীম ঈশ্বরনিন্দাকারীদেরকে বরাবরের জন্য বয়কট করবার কথাও বলে না। পক্ষান্তরে, পবিত্র কোরআন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলে যে, এইরূপ বয়কট ততক্ষণ পর্যন্তই চলতে পারবে যতক্ষণ না সেই ঈশ্বরনিন্দা বন্ধ হয়।

(২) আবারও, ঈশ্বরনিন্দার কথা বলা হয়েছে সূরা (অধ্যায়) আল্‌-আনআমে। এখানে, আনুমানিকভাবে, ঈশ্বরনিন্দার প্রশ্নটি শুধু আল্লাহ্‌র সম্পর্কেই আলোচিত হয়নি,

বরং তা আলোচিত হয়েছে মূর্তি ও পূজা-অর্চনার কল্পিত সব বস্তু সম্পর্কেও। এইরূপ কোরআনী সৌন্দর্য দর্শনেও যে কেউ অভিভূত না হয়ে পারে না, যখন সে পড়েঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

"এবং তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যাদেরকে তাঁরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে (উপাস্যরূপে) ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার দরুন শত্রুতাবশতঃ আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কৃতকর্মকে মনোরম করে দেখিয়েছি। অতঃপর, তাদের প্রভুর দিকে তাদের প্রত্যাবর্তান ঘটবে, তখন তিনি তাদেরকে তারা যে কাজকর্ম করতো তৎসম্বন্ধে অবহিত করবেন।" (আনআম-৬ঃ১০৯)

এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে পৌত্তলিকদের মূর্তিগুলোর এবং কল্পিত দেবতাগুলোর নিন্দা করতে। এখানে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কেউ যদি অনুরূপ কাজ করে বসে, তাহলে অন্যেরাও, প্রতিশোধমূলকভাবে, আল্লাহ্‌রই নিন্দায় রত হতে পারে। এই অনুমাননির্ভর আলোচনায় খোদা এবং মূর্তি বা দেবতাদের সম্পর্কে সমান শর্তে কথা বলা হয়েছে। এবং কোন ক্ষেত্রেই কোন জাগতিক শাস্তির কথা বলা হয়নি।

এই শিক্ষার নীতি গূঢ় ও গভীর প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ। কেউ যদি কারো আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করে, তাহলে, দুঃখপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকার জন্মাবে সমান প্রতিশোধ গ্রহণের, তা তার ধর্মবিশ্বাস , সত্য বা মিথ্যা,যা-ই হোক না কেন। কেউই অন্যভাবে প্রতিশোধ নিতে পারবে না। এথেকে, যেকেউ সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে যে, আধ্যাত্মিক অপরাধের প্রতিশোধ আধ্যাত্মিক পন্থাতেই নিতে হবে, ঠিক যেমন দৈহিক অপরাধের বিরুদ্ধে দৈহিক প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় । কিন্তু, কোনক্ষেত্রেই সীমালংঘন করা যাবে না।

(৩) পবিত্র কোরআনে হযরত মরিয়ম ও ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কৃত নিন্দার (ঈশ্বরনিন্দার) কথা বলা হয়েছেঃ

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝

"এবং তাদের অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের প্রতি তাদের ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে।" (আন্ নিসা - ৪ঃ১৫৭)

এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর সমসাময়িক ইহুদীদের ঐতিহাসিক গোঁড়ামীর কথা বলা হয়েছে। এই আয়াত অনুসারে, ইহুদীরা মরিয়ম (আঃ)-কে অসতী বলে এবং ঈসা (আঃ)-কে একটি সন্দেহজনকভাবে জন্মগ্রহণকারী শিশু বলে একপ্রকার জঘন্য ঈশ্বরনিন্দার অপরাধ করেছে। এই আয়াতের আরবী শব্দ 'বুহতানান আযীমা' (যার অর্থ 'ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ') দ্বারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইহুদীদের এই আহাম্মকীর নিন্দা করা হয়েছে।

(৪) একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে হযরত মরিয়ম এবং ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার কাজ করার অপরাধের জন্য ইহুদীদেরকে তিরস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআন করীম খৃষ্টানদেরকেও তিরস্কার করেছে এই জন্য যে, তারাও ঈশ্বরনিন্দার অপরাধে অপরাধী। কেননা, তারা দাবী করে যে, এক মানবী স্ত্রীর গর্ভে খোদার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছে। এই বিষয়টা কোরআন করীম জঘন্য অপরাধ বলে উল্লেখ করেছে নিম্নোক্ত আয়াতে। তবু, এখানে না কোন ইহজাগতিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, না খোদাতা'লার বিরুদ্ধে নিন্দা করার অপরাধের জন্য শাস্তিদানের অধিকার কোন মানুষ বা মানবীয় কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।

مَّا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِءَابَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ
أَفْوَٰهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

"এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও (ছিল না)। এ অত্যন্ত জঘন্য কথা যা তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। তারা কেবল মিথ্যা বলছে"। (আল্ কাহ্ফ্ - ১৮ঃ৬)

(৫) সবশেষে, আমি সব চাইতে স্পর্শকাতর বিষয়টির কথা বলতে চাই - স্পর্শকাতর এই অর্থে যে, আজকের দিনের মুসলমানরা ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সাঃ) বিরুদ্ধে নিন্দার (ব্লাসফেমী) ব্যাপারে যতটা স্পর্শকাতর, ততটা স্পর্শকাতর অন্য আর কারও বিরুদ্ধে নিন্দার ব্যাপারে নয়, এমনকি খোদার নিন্দার বিরুদ্ধেও নয়। তবু, এখানে এমন একটা ভয়ানক ঈশ্বরনিন্দার ঘটনার কথা বলা যায়, যার উল্লেখ কোরআন করীমে করা হয়েছে, যা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল সম্পর্কিত—যাকে ইসলামের ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়েছে মুনাফেকদের নেতা বলে।

একবার একটা যুদ্ধের অভিযান থেকে ফেরার সময়, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই অন্যান্যদের মধ্যে ঘোষণা করেছিল যে, তারা মদীনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই, মদীনাবাসীদের মধ্যেকার সর্বোত্তম ব্যক্তি সেখানকার সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেবে।

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

"তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দেবে, অথচ (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর রসূল এবং মুমেনদের জন্য; কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়। (আল্ মুনাফেকুন - ৬৩ঃ৯)

অভিযাত্রীদের সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, এই অবমাননাজনক কথা সে বলছে হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে। তারা ঘৃণায় এবং ক্রোধে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, অনুমতি পেলে তারা তৎক্ষণাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে তরবারি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।

প্রামাণ্য বর্ণনায় আছে যে, এই ঘটনায় উত্তেজনা এমন চরমে পৌঁছেছিল যে, স্বয়ং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইর পুত্র রসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে হাযির হয়ে স্বহস্তে তার পিতাকে হত্যা করবার অনুমতি প্রার্থনা করলো। সেই পুত্র এই যুক্তি দেখালো যে, যদি অপর কেউ তার পিতাকে হত্যা করে তাহলে, হতে পারে, পরবর্তীকালে সে অজ্ঞতাবশতঃ, তার পিতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা করবে। শত শত বৎসর ধরে আরবদের মধ্যে এই প্রথা চলে আসছিল যে, তারা তাদের নিজেদের এবং নিকট আত্মীয়দের সামান্য অপমানেরও প্রতিশোধ গ্রহণ করতো। সম্ভবতঃ, এই প্রথার কারণেই ঐ পুত্রটি তার পিতাকে হত্যা করবার অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) না তার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, না তিনি তাঁর সাহাবীগণের কাউকে সেই মুনাফেক আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে কোন প্রকারের কোন শাস্তিদানের অনুমতি দিলেন। (ইবনে হিশাম কতৃক বর্ণিতঃ ইবনে হাশিমঃআস্ সিরাতুন নব্বীয়া, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৫৫)।

ঐ অভিযান থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই শান্তিতেই বসবাস করছিল। অবশেষে, যখন সে স্বাভাবিকভাবে মারা গেল, তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো যে, হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ্র ছেলেকে তাঁর (সাঃ) নিজের পিরহান (শার্ট) দিলেন এবং তা দিয়ে তার পিতার কাফন তৈরী করতে বললেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিজের জামা দান করার এই ব্যাপারটি এমন একটি অনন্য সাধারণ আশীর্বাদ ছিল যার বদলাতে সাহাবীগণের যে কেউ আব্দুল্লাহ্র পুত্রকে নিজের সমস্ত সম্পত্তি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। শুধু তাই না, রসূলে পাক (সাঃ) তার জানাযার নামাযে ইমামতী করার জন্যেও তৈরী হয়ে গেলেন। এতে সাহাবীদের অনেকেই নিশ্চয় গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে থাকবেন, বিশেষতঃ, যাঁরা আব্দুল্লাহ্র উপরোক্ত জঘন্য অপরাধকে ক্ষমা করতে পারছিলেন না। হযরত উমর (রাঃ), যিনি পরবর্তী কালে আঁহযরত (সাঃ)-এর দ্বিতীয় খলীফা হয়েছিলেন, তিনি সাহাবীদের সেই চাপা মর্মবেদনাকে, অবশেষে, ব্যক্ত না করে পারলেন না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যখন নামাযে জানাযার জন্য রওয়ানা হলেন, তখন হযরত উমর (সাঃ) হঠাৎ এগিয়ে গেলেন এবং সামনে দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁর (সাঃ) সিদ্ধান্ত বদলাবার অনরোধ জানালেন। এবং এটা করতে গিয়ে হযরত উমর (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে কোরআন পাকের একটি আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যে আয়াতে এমন কিছু সংখ্যক মুনাফেকের প্রতি ইংগিত করা আছে যাদের ক্ষমার জন্য রসূলে করীম (সাঃ) সত্তুর বার প্রার্থনা বা শাফায়াত করলেও তা কবুল করা হবে না বলে বলা হয়েছে। (প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, সত্তুর সংখ্যাটিকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না কেননা, আরবী বাগ্ধারা অনুযায়ী, অধিক সংখ্যা বুঝাতে জোর দেওয়ার জন্যই সত্তুর সংখ্যাটির উল্লেখ করা হয়।)

যাহোক, রসূলে পাক (সাঃ) একটু মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ উমর, পথ ছাড়, আমি তোমার চেয়ে ভাল জানি। যদি আমি জানতে পারি যে, আমি সত্তুর বার তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না তাহলে, আমি তার জন্যে সত্তুর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করবো। অতঃপর, রসূলে করীম (সাঃ) সেই জানাযার নামাযের ইমামতী করলেন। (বুখারীঃ ২য় খন্ড, কিতাব আল্ জানায়েয , পৃঃ ১২১, এবং বাব আল্ কাফন, পৃঃ ৯৬,৯৭)

এই ঘটনা তাদের বিরুদ্ধে একটি যথোচিত জবাব, যারা গলা ফাটায়ে চীৎকার করে যে, ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সাঃ) নিন্দাকারীদের জন্য একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড।

এবং এটাই সেই ধর্ম, যা, অবশ্যই, দুনিয়ার বুকে আন্তঃ-ধর্মীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী করতে পারে।

আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতা

আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইসলাম আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করেঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

"কোন জাতির এইরূপ শত্রুতা যে, তারা তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে প্রতিরোধ করেছে, তোমাদেরকে যেন সীমালংঘন করতে প্ররোচিত না করে। এবং তোমরা পুণ্যকাজে এবং তাক্ওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর, এবং পাপ ও সীমালংঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর,নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" (আল্ মায়েদা - ৫ ঃ ৩)

ধর্মীয় বিদ্বেষবশতঃ কেউ যদি শত্রুতা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে থাকে, তবু পবিত্র কোরআন মুসলমানদের সেই সব শত্রুর বিরুদ্ধেও অবিচারমূলক আচরণ করার অনুমতি দেয় না।

আমরা এখন সেই সব কাফির বা অবিশ্বাসীদের কথা বলবো যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সক্রিয় শত্রুতায় জড়িত ছিল বলে জানা যায় না। তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পবিত্র কোরআন মুমিনদেরকে বলেছেঃ

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
۝ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم
مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

"ওদের মধ্য থেকে যাদের সঙ্গে তোমাদের (আপাততঃ) শত্রুতা রয়েছে, তাদের ও তোমাদের মধ্যে, অচিরেই আল্লাহ্ মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

"যারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করেনি তাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সদ্ব্যবহার এবং ন্যায় বিচার করতে নিষেধ করেন না; নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।"(আল্ মুমতাহানা - ৬০ঃ৮,৯)

মুসলমানদেরকে এই শিক্ষাদান করা হয়েছে যেন তারা আহলে কিতাব বা গ্রন্থানুসারীদেরকে আমন্ত্রণ জানায় এবং যেন তাদের সঙ্গে আল্লাহ্র একত্ব -যে বিশ্বাস করাও পোষণ করে -প্রচারে সহযোগিতা করে। নিম্নোক্ত আয়াতটিরও মর্ম হচ্ছে,-এখানে বিভেদ সৃষ্টিকারী মত পার্থকের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়নি, বরং এখানে সকলের মধ্যেকার সাধারণ একটা বিষয়ের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থে পারস্পরিক কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছেঃ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ ۝

"তুমি বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আস যা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান- আমরা যেন আল্লাহ্ ছাড়া কারো এবাদত না করি এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে আমরা শরীক না করি, এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভুরূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে, তোমরা বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (আল্লাহ্র নিকটে) আত্মসমর্পণকারী।" (আলে ইমরান - ৩ ঃ ৬৫)

উপসংহার

পৃথিবীর অকৃত্রিম বা বোনাফাইডি ধর্মগুলো মানুষকে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি দিতে সক্ষম কি না, তার একটা অর্থবহ পরীক্ষা চালাবার আগে, এটা অত্যন্ত জরুরী যে, সেই ধর্মগুলো তাদের স্ব স্ব অনুসারীদের বিভিন্ন শ্রেণীর বা ফের্কার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কী ভুমিকা পালন করছে তা পরখ করে দেখা দরকার। সেই সঙ্গে এটাও

বিচার করে দেখা দরকার যে, সেই ধর্মগুলো সেগুলোর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা কালীন - অন্যদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। বস্তুবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রেক্ষিতে বিচার করে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজেরই আধ্যাত্মিক আনন্দের পরিবর্তে ইহজাগতিক ও ইন্দ্রিয়জ সুখের প্রতি ধাবিত হওয়া লক্ষ্য করে, হয়তো কেউ এইরূপ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাইবেন যে, ধর্মকে আর জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রাহ্য করা উচিত নয়, বরং তা উপেক্ষা করাই উচিত।

আমি দুঃখিত যে, এইরূপ একটা সিদ্ধান্তের সাথে আমি একমত হতে পারছি না। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে, অভ্যন্তরীণভাবে এবং বাহ্যিকভাবে, সংশোধিত ও উন্নত করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম আমাদের বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় কোন কল্যাণকর ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে না বরং তা শক্তিশালী নেতিবাচক ভূমিকাই পালন করে যাবে। ধর্মের পক্ষে তো এটাই করণীয় ছিল যে, তা শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে, বিভিন্ন শ্রেণী ও ফের্কার অনুসারীবৃন্দের মধ্যেকার ভুল বুঝাবুঝি দূর করবে, শালীনতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে, 'নিজে বাচঁ এবং অপরকে বাঁচতে দাও' নীতির বাস্তবায়ণ করবে কিন্তু, তা না করে, তার পরিবর্তে, দুর্ভাগ্যবশতঃ, ধর্ম সমকালীন সময়ে পৃথিবীর সবত্রই শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অতি নগণ্য ও তাৎপর্যহীন ভুমিকাই পালন করছে অবশ্য, তেমন কোন ভুমিকা যদি আদৌ কোথাও তা পালন করেই থাকে। পক্ষান্তরে, এই বিষয়টাকে কোনমতেই ছোট করে দেখা ঠিক হবে না যে, বিশৃংখলা সৃষ্টিতে, রক্তপাত ঘটাতে, দুঃখ দৈন্য এবং অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্ম এখনও একটা অত্যন্ত সক্ষম ও গতিশীল শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এই মারাত্মক সমস্যাটির সমাধান দিতে না পারলে, এবং এর ত্রুটিগুলো দূরীভূত করতে না পারলে, বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনও পরিকল্পনাই গ্রহণ করা যাবে না। অভ্যন্তরীণভাবে কোন ধর্মের কোন একটা সম্প্রদায় তা যদি সেই ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত একটি সংখ্যালঘু দলও হয় তথাপি তার বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে, ধর্মীয় অনুভূতিকে দারুণভাবে উত্তেজিত এবং কর্মতৎপর করে তোলা সম্ভব।

সারাটা মুসলিম ইতিহাসই অনুরূপ কুৎসিত ও ঘৃণ্য ঘটনাবলী দ্বারা ভরপূর হয়ে আছে। শান্তির ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামকেই ব্যবহার করা হয়েছে নির্দোষ মুমিনদের জীবনের শান্তি নষ্ট করবার কাজে। এই মুমিনদের অপরাধ হচ্ছে, এরা ইসলামে বিশ্বাসী হলে কি হবে, এরা তো ওদের মত করে বা ওদের স্টাইলে বিশ্বাস করে না। বস্তুতঃ, ইসলামের ইতিহাসের গবেষণায় এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামকে স্বয়ং মুসলিমদেরই উপরে নির্যাতন চালাবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। বিগত

চৌদ্দশ'বছরে মুসলমানরা যে সমস্ত জিহাদ খৃষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে চালিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী ও অনেক বড় বড় 'জিহাদ' মুসলমানরা চালিয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

এই অধ্যায়টা যে শেষ হয়ে গেছে, তা নয়। এখন পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যা ঘটছে এবং অতটা ঘন ঘন না হলেও সংখ্যালঘু শিয়াদেরও বিরুদ্ধে যা ঘটছে, তা-ই এই সত্যের প্রতি সৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট যে, এই জঘন্য সমস্যটার মৃত্যু অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল।

খৃষ্টধর্মের ক্ষেত্রে তাকালে মনে হতে পারে যে, খৃষ্টানদের হাতে খৃষ্টানদের নির্যাতিত হওয়ার যে ইতিহাস তা অনেক পুরানো হয়ে পড়েছে এবং তা ইউরোপীয় ও আমেরিকান ইতিহাসের ধ্বংসস্তুপের নীচে চাপা পড়ে গেছে, কিন্তু, বিষয়টার ভিন্ন চেহারা ফুটে ওঠবে তখন যখন আয়ার্ল্যান্ডের ধর্মজড়িত রাজনৈতিক বিবাদের প্রতি লক্ষ্য করা যাবে। তাছাড়া, পৃথিবীর অনেক অনেক স্থানে, খৃষ্টান ধর্মের অভ্যন্তরেও সাম্প্রদায়িক বিবাদেরসমূহের আশংকা রয়ে গেছে, যারা বর্তমানে লিপ্ত হয়ে আছে ভিন্ন ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদে।

আন্তঃ-ধর্মীয় সম্পর্কের প্রতি তাকালে দেখা যাবে যে, ভারতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা অথবা নাইজেরিয়াতে খৃষ্টান মুসলিম সংঘাত, অথবা মধ্য প্রাচ্যে ইহুদী-মুসলিম সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ইত্যাদি লেগেই আছে। এই সব এবং অনুরূপ আরও অনেক দ্বন্দ্ব সংঘাত বর্তমানে সুপ্ত বিপদাকারে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতই ধর্মজগতের গর্ভদেশে বিরাজ করছে।

বলাই বাহুল্য, এই সকল সমস্যা বর্তমানে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হচ্ছে তার সংশোধনের গুরুত্ব তীব্র হয়ে উঠেছে।

ইসলামী পন্থায় কী করে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব সে কথাই আর একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করে আমরা আমাদের কথায় ইতি টানবো।

(১) পৃথিবীর সকল ধর্ম, তা সেগুলো ইসলামে বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, ইসলামের এই মৌলিক নীতি মেনে চলতে হবে যে, আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক এবং আন্তঃ-ধর্মীয় বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাবার জন্য কোন ক্রমেই বল প্রয়োগ করা যাবে না এবং নিপীড়ন চালানো যাবে না। ধর্ম নির্বাচনের এখতিয়ার, তা ঘোষণা করার স্বাধীনতা, তার প্রচার, পালন এবং অনুশীলন করার অধিকার অথবা তা অস্বীকার বা বর্জন বা পরিবর্তন করার স্বাধীনতাকে নিরংকুশভাবে সংরক্ষিত করতে হবে।

(২) এমনকি, যদি অন্যান্য ধর্মগুলো সত্যের সার্বজনীনতার ধারণার সাথে একমত না হয়, এবং এমনকি যদি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইহুদীবাদের অবস্থান থেকে খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়ান ধর্ম, হিন্দুধর্ম, জরথুষ্ট্রিয়ান ধর্ম ইত্যাদি সব ধর্মই যদি মিথ্যাও হয় এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের কিছুই করারও না থাকে, তবু অন্যত্র সত্যের এই অস্বীকার সত্ত্বেও, সকল ধর্মকে এই ইসলামী নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে যে, অপরাপর সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও পবিত্র পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এমন না যে, এটা করতে গিয়ে তাদেরকে তাদের নীতিসমূহের ব্যাপারে আপোষ করতে হবে। এটা স্রেফ একটা মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়। প্রতিটি মানুষের এই অধিকারকে স্বীকার করতে হবে যে, তার ধর্মীয় আবেগ, তার ধর্মীয় অনুভূতি যেন লংঘিত না হয়, যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

(৩) মনে রাখতে হবে যে, উল্লিখিত নীতি কোন জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে না। এই নীতির সঙ্গে এটাও অনুধাবন করতে হবে যে, ঈশ্বরনিন্দার জন্য মানব-তৈরী শাস্তির কোন বিধান নেই। তবে, এর বিরুদ্ধে নিন্দা জানাতে হবে, এটাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এবং এই অশালীন, ন্যাক্কারজনক এবং ঘৃণ্য ব্যাপারটাকে নিন্দা করার জন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে।

(৪) এই শতাব্দীর প্রথম দিকে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় যেভাবে আন্তঃ-ধর্মীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতো, তদ্রূপ সম্মেলনের অনুষ্ঠান করাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করতে হবে এবং তা বহুলাকারে করতে হবে। এই জাতীয় সম্মেলনের মূল ও অপরিহার্য যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে , তা হচ্ছে সংক্ষেপেঃ

ক) সকল বক্তাকেই এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে, তিনি যেন শুধু তাঁর নিজ ধর্মের ভাল ভাল কথাগুলি বলেন এবং আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি তুলে ধরেন, এবং এটা করতে গিয়ে তিনি যেন অপরাপর ধর্মগুলির বিরুদ্ধে কোন নিন্দা-বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন।

(খ) অবশ্য কোন ধর্মের কোন বক্তা চাইলে আন্তরিকভাবে অপরাপর ধর্মগুলিরও ভাল ভাল বিষয়গুলোর উল্লেখ করতে পারবেন, সেগুলোর উপরে কথা বলতে পারবেন এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বলতে পারবেন যে, কেন সেগুলি তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে।

(গ) এক ধর্মের বক্তা অন্যান্য ধর্মের নেতাদের চরিত্র ও মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। যেমন ধরুন, একজন ইহুদী বক্তা বলবেন রসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক গুণাবলীর উপরে। এবং এই বিষয়টা এমন

যে,তা সব মানুষই তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাস বজায় রেখেই পসন্দ করবেন। একইভাবে, একজন মুসলিম বক্তা শ্রীকৃষ্ণের উপরে বলতে পারবেন, একজন হিন্দু বলতে পারবেন যীশুখৃষ্টের উপরে, একজন বৌদ্ধ মূসার উপরে (আল্লাহ্‌র শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক তাঁদের সকলের উপরে) ইত্যাদি, ইত্যাদি। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতো আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এবং এতে তারা অনেক সুফলও পেয়েছিল, সুখ্যাতিও অর্জন করেছিল।

(ঘ) উপরে (গ)-তে যা বলা হয়েছে, তার প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না রেখেই বলছি যে, এই জাতীয় ধর্মীয় সভার বা আলোচনার পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে এবং তা করতে হবে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে মিলিতভাবেই। আন্তঃধর্মীয় মতাদর্শের আদান-প্রদানকে কোনক্রমেই ধর্মীয় শান্তিতে অন্তর্ঘাত বলে আখ্যায়িত করা যাবে না, বর্জন করা যাবে না। আলোচনার ধারা পদ্ধতি যদি মন্দ হয় তবে, তা বাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আলোচনাকে কোনমতেই বাদ দেওয়া যাবে না। চিন্তা ধারণা ও মতামতের অবাধ আদান-প্রদানই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবাধিকার, এর প্রয়োজন যোগ্যতমের উত্তরণের জন্যই, এ ব্যাপারে কোনভাবেই আপোষ করা যায় না।

(ঙ) মতপার্থক্যের পরিসর সংকীর্ণ এবং ঐকমত্যের সম্ভাবনা সুপ্রসারিত করার জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয় যে, সকল ধর্মেরই উচিত হবে অপরাপর ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে তাদের স্ব স্ব ধর্মের বিষয়াদি নিয়ে বিতর্ক সীমিত করে ফেলা। সকল ধর্মের উৎস অভিন্ন, -কোরআন শরীফের এই ঘোষণাকে খাট করে দেখলে চলবে না। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে একটা জ্ঞানের জগৎ। সেই জগতকে অন্যসকল ধর্মের উচিত নিজেদের সাথে এবং সমগ্র মানবজাতির স্বার্থে পরীক্ষা করে দেখা, পুংখানুপুংখভাবে খতিয়ে দেখা।

(৫) মানবজাতির পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষ্যে সকল ভালকাজে এবং পরিকল্পনায় সহযোগিতাকে বাড়াতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে। যেমন, খৃষ্টান ও মুসলিম বা হিন্দু ও ইহুদী ইত্যাদি একসঙ্গে মিলেমিশে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট গ্রহণ করতে পারে।

এবং তাহলেই আমরা অতীতের ঋষিদের ও দার্শনিকদের সেই পুরনো ইউটোপিয়ান স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারবো অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে -ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে সকল মানুষকে একই পতাকার তলে একত্রিত করতে সক্ষম হবো।

সামাজিক শান্তি

(১) সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থা
(২) সমাজ ব্যবস্থার দু'টি আবহাওয়া
(৩) বস্তুবাদী সমাজের দম্ভ এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি
(৪) পারলৌকিক জীবনের প্রত্যাখ্যান
(৫) বস্তুবাদী সমাজের চারটি বৈশিষ্ট্য
(৬) জবাবদিহিতা
(৭) ইসলামের সামাজিক আবহাওয়া
(৮) ইসলামী সমাজের মৌলিক আদর্শ
(৯) সতীত্ব
(১০) নারী পুরুষের পৃথকীকরণ
(১১) নারী-অধিকারের নবযুগের সূচনা
(১২) নারীর সম-অধিকার
(১৩) একাধিক বিবাহ
(১৪) বয়স্কদের সেবাযত্ন
(১৫) ভবিষ্যৎ প্রজন্ম
(১৬) নিষ্ফল, বৃথা কার্যকলাপ নিরুৎসাহিত করণ
(১৭) কামনা বাসনার নিয়ন্ত্রণ
(১৮) ট্রাস্টগঠন এবং ট্রাস্ট ও চুক্তির অলংঘনীয়তা
(১৯) অশুভ বা মন্দের উৎসাদনঃ একটি সম্মিলিত দায়িত্ব
(২০) 'কর' এবং 'কর না' - (আদেশ ও নিষেধ)
(২১) জাতিভেদ প্রথার প্রত্যাখ্যান

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ
وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ
وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

"আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করবার মত অন্য লোকদেরকেও) দান করবার আদেশ দিচ্ছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ এবং বিদ্রোহ করতে বারণ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" (আন্ নাহ্ল- ১৬ঃ৯১)

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ
ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ
وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ
مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ۝

"তোমরা জেনে রাখ, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। এর দৃষ্টান্ত বারিধারার ন্যায় যার (দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সজী কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা পরিপক্ক হয় এবং তুমি তা হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, যা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, এবং পরকালে রয়েছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্র নিকট থেকে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী ভোগ্যবস্তু ব্যতিরেকে কিছু নয়।" (আল্ হাদীদ-৫৭ঃ২১)

সমসাময়িক সমাজে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কী হতে পারে,– এই প্রশ্নটার দিকে আমরা এখন দৃষ্টি ফেরাবো।

সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থা

দুর্ভাগ্যক্রমে, সমাজে এখন নৈতিক আচরণের উপর থেকে ধর্মীয় প্রভাব দ্রুত অপসৃত হয়ে পড়ছে। পরিস্থিতিটার আরও অবনতি ঘটছে এই কারণে যে, ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্য এখন একটা তীব্র আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা সমকালীন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া সমাজে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তার অভাব এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃংখলা থেকে একটা আতংকেরও সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ধর্মীয় ও নৈতিক বিধি-নিষেধের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রবণতার পাশাপাশি সমান্তরালভাবেই বিরাজ করছে। চিরঞ্জীব এক খোদার প্রতি যে বিশ্বাস– যে খোদা মানুষের শুধু ভাগ্যই নির্ধারিত করে দেন নি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্যাটার্ন- পদ্ধতি নির্ধারণেরও অধিকার যাঁর আছে- সেই খোদার প্রতি বিশ্বাস অতি দ্রুত ধ্বসে পড়ছে।

পবিত্র কোরআন এই অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে যা বলেছে, তা হচ্ছেঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

'স্থলে ও জলে ফাসাদ ছেয়ে গেছে।' (রূম - ৩০ঃ৪২)

খৃষ্টধর্ম পাশ্চাত্যের সর্বপ্রধান ধর্ম বিধায়, বর্তমান শতাব্দীর সূচনা অব্দি এর অনুসারীদের নৈতিক আচরণের উপরে এর একটা শক্তিশালী ও কার্যকর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, হায়! সেটা আর এখন নেই।

তার পরিবর্তে অন্য এক সভ্যতা গড়ে ওঠছে। এবং তা গড়ে ওঠছে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ, দ্রুততর বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং বস্তুবাদী প্রগতি প্রভৃতির সংমিশ্রণে। এই সভ্যতা খৃষ্টধর্মকে ধাপে ধাপে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করছে। ফলে, এই ধর্মকে সামাজিক আচরণ ডৌল করার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে অধোগামী ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

সুতরাং, আজকের পাশ্চাত্যের নৈতিক অবস্থার যে চরিত্র, তাও কম বেশী খৃষ্টান; ঠিক তেমনিভাবে প্রায় সব মুসলিম দেশেরও নৈতিক আচরণ ইসলামিক। এবং এটাই হচ্ছে, দুর্ভাগ্যক্রমে, পৃথিবীর অন্য সব দেশেরও সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা।

দুনিয়াতে আজ প্রচুর বৌদ্ধ আছে, কন্‌ফুসিয়ান আছে, হিন্দু আছে বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, বৌদ্ধধর্ম, কন্‌ফুসিয়ান বা হিন্দুধর্ম বড় একটা নজরে পড়ে না।

'জল আর জল সর্বত্র যে দিকেই চাই
কিন্তু পানীয় যে জল, তা এক বিন্দুও নাই।'

যদি কোন সমাজে নীতি শাস্ত্র সম্পর্কিত ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত বিধি নিষেধ না থাকে তাহলে, সেখানে ভাবী-প্রজন্মের কাছে নৈতিকতা, সব দিক থেকেই, তার বাঁধন হারিয়ে ফেলবে, এবং সেই প্রজন্ম আর অন্ধভাবে সেই গতানুগতিক ঐতিহ্যকে বিশুদ্ধ ও বৈধ বলে গ্রহণ করবে না। এই শ্রেণীর প্রজন্ম তখন একপ্রকার শূন্যতার মধ্যে পতিত হয়ে একটা জটিল ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে বাধ্য হবে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য একটা নতুন আগ্রহের সৃষ্টি হবে, এবং এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়াতে হয়তোবা উন্নত এবং অধিকতর সন্তোষজনক একটা আচরণবিধি আবিষ্কার করা যেতে পারে, না-ও পারে। তবে, অপরপক্ষে, এর দরুন একটা সম্পূর্ণরূপে বিশৃংখল অবস্থা কিংবা একটা নৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, এই পরবর্তী পরিস্থিতিটাই আধুনিক সমাজের কাম্য।

আজ দুনিয়া জোড়া পরিবর্তনের একটা প্রবল হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে, তা সে হাওয়া প্রাচ্যের হোক আর প্রতীচ্যের হোক, ধর্মীয় হোক আর সেক্যুলার হোক। কিন্তু, এটা একটা অশুভ হাওয়া, এবং তা সমগ্র জগতের জলবায়ুকে দূষিত করে ফেলছে।

আমাদের সামাজিক আবহাওয়ার দূষণের মাত্রা যে দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে দিকে, আধুনিক বিশ্ব যতটা সতর্ক ও সচেতন, তার চাইতে সে, মনে হয়, বেশী সতর্ক ও সচেতন বস্তুগত বা ভৌতিক আবহাওয়ার দূষণ বৃদ্ধির ব্যাপারে। পবিত্র কোরআন স্পষ্টতঃই এমন একটা যুগের কথা বলতে গিয়ে ঘোষণা করেছে ঃ

وَٱلْعَصْرِ ۝ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ۝

'কসম সেই কালের। নিশ্চয় ইনসান (সামগ্রিকভাবে) বড় ক্ষতির মধ্যে আছে! তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, এবং তারা একে অপরকে সত্যের (উপরে দৃঢ় থাকবার এবং তা প্রচার করবার তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে দুঃখ-কষ্টে ও আপদে বিপদে) একে অপরকে ধৈর্যেরও তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে। (আল আসর-১০৩ঃ ২-৪)

শোষণ, মুনাফেকী, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা, নির্যাতন, লালসা, ভোগের উন্মত্ত প্রয়াস, বিশৃংখলা, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, মানবাধিকার লংঘন, প্রতারণা, ধোকাবাজি, দায়িত্বহীনতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার অভাব ইত্যাদি হচ্ছে আধুনিক সমাজগুলোর

বৈশিষ্ট্যের রূপ। এই যে কুৎসিৎ চেহারা যা দিনে দিনে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, তাকে আর সভ্যতার পাতলা আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। অবশ্য, এটা বলা ঠিক হবে না যে, মানুষের অধঃপতনের এই জাতীয় ভয়াবহ অবস্থা অতীতে আর কখনোই দেখা যায় নি। বস্তুতঃ, অতীতের অনেক সভ্যতাই অনুরূপ সব ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল এবং অবশেষে মানবেতিহাসে তাদের অধ্যায়ের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে, নৈতিক অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয়েছিল বলে পৃথিবীর বিশেষ কোন অঞ্চলকে এককভাবে চিহ্নিত করা হলে তা ভুল হবে।

সমাজ সমানে ভেঙ্গে পড়ছে সর্বত্রই। সর্বাত্মক (Totaliterian) দর্শনের দ্বারা শাসিত দেশগুলোর বিরুদ্ধে তথাকথিত মুক্ত বিশ্বের ব্যক্তি-স্বাধীনতার চেতনার যে উত্থান ঘটছে, যা স্বয়ং একটা ভারসাম্যহীন প্রবণতা হয়ে দেখা দিচ্ছে, তা-ই প্রধানতঃ ক্রমবর্ধমান সামাজিক অসদাচরণের জন্য দায়ী।

সর্বাত্মক দর্শন দ্বারা শাসিত দেশগুলোর ব্যক্তি স্বাধীনতার চেতনার যে ক্রমাগত উত্থান ঘটছে তা বর্তমানে সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা আদায়ের জন্য একটা ভয়ানক যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে। এবং সেনাবাহিনীর কোন শক্তিশালী উগ্র বামদলের পক্ষ থেকে যদি কোন অভ্যুত্থান না ঘটে তাহলে, বৃহত্তর স্বাধীনতার এই প্রবণতার আশু বিজয় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃপর, যা ঘটবে তা সাবেক কম্যুনিস্ট দেশগুলোর মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকদের নৈতিক প্রত্যাশার ক্ষেত্রে মোটেই শুভ হবে না।

দু'দুটো প্রজন্মের প্রায় সবাই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছিল একটা নিরীশ্বরবাদী সমাজের শূন্যতার মধ্যে। তাদেরকে নৈতিক আচরণের পথে পরিচালনার এবং সে সম্পর্কে শৃংখলা শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে তৈরী নৈতিক মূল্যবোধের নীতিমালার অভাব তো আছেই, তদুপরি, বৃথা, আমোদ-প্রমোদপূর্ণ সুখের অন্বেষা এবং দায়িত্বহীনতার প্রবণতা প্রভৃতির বিপদও পাশ্চাত্য থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে এবং তা রাশিয়া এবং পূর্ব-ইয়োরোপের দেশগুলোর যুবকদের উপরে আছড়ে পড়ছে। এবং তা আগামী বছরগুলোতে এই সব যুবকের নৈতিক আচরণের উপরে একটা ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য।

একই সঙ্গে, যে কেউ লক্ষ্য করতে পারবে যে, বহু যুগ ধরে ধর্মহীন জীবনযাপনের যে অভিজ্ঞতা তা সমসাময়িক সমাজের জন্য শুধু যে অমঙ্গলই রেখে গেছে তা নয়, বরং তা পরিষ্কারভাবে কিছু কিছু সহায়ক সুযোগও সৃষ্টি করে গেছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু সমাজবাদী দুনিয়ার সংগে ধর্মেরই বন্ধন ছিন্ন করেনি, বরং সেই সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও মতাদর্শ, যেগুলো আপনা আপনি আগে থেকেই দূষিত ও বিকৃত হয়ে পড়েছিল, সেগুলোর সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিল। খৃষ্টধর্মই হোক বা ইসলামই

হোক, খৃষ্টানরাই হোক বা মুসলমানরাই হোক এবং তারা যে কোন সম্প্রদায় বা ফের্কারই হোক, তাদের নিজ নিজ ধর্মের ধারণার মধ্যে একটা মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, যা বিশ্বাসের বহু ক্ষেত্রেই ধর্মীয় মতাদর্শ ও প্রাকৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে বিসদৃশ। দুটোই তো একই সঙ্গে সঠিক হতে পারে না। তাই ধর্মীয় মতাদর্শ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখাবার জন্য একটা বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে, যা থাকলে আর বিচলিত হওয়ার কিছু থাকে না। পরস্পর বিরোধী অবস্থার মধ্যে বাস করা, সম্ভবতঃ, সহজ নয়। তবে পরস্পর বিরোধী অবস্থাগুলো যদি জনগণের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জন্ম নেয় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। ক্রমান্বয়ে এক সময় এই অবস্থাটার সৃষ্টি হয়েছিল যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো পরস্পরবিরোধী অবস্থাগুলোর মধ্যে, সেগুলোকে উপেক্ষা করেই, কোনমতে বাস করতো। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাদের জনগণের জন্য যে জিনিষটা করেছিল তা হচ্ছে, অন্য সব আদর্শ বা ধ্যান-ধারণা থেকে তাদের মগজ ধোলাই করে ফেলা এবং এদিক সেদিক শোনা এবং দেখা বা দ্বৈতদৃষ্টি থেকে তাদেরকে নিরাময় করে তোলা।

এটা, প্রতিদানে, তাদেরকে এক প্রকার নিরীহত্ব দান করেছিল, যা অর্জন করা তখনই সম্ভব যখন আর কোন ভণ্ডামিই অবশিষ্ট থাকে না। এটা বলার সময় এখনও আসেনি যে, আগামীতে সংগ্রামের কঠিন সময় যখন আসবে তখন এই নিরীহত্ব তাদের নৈতিক উপকারে আসবে কি না। তবে, একটা ব্যাপার একেবারেই নিশ্চিত যে, আজকের দুনিয়ার অন্য যে কোন জাতির লোকদের চাইতে তারা সত্যের বাণী শুনতে এবং তা গ্রহণ করতে অনেক বেশী নমনীয় হবে।

কিন্তু হায়! এই কথাটা আজকের দুনিয়ার তথাকথিত 'মুক্ত' জাতিগুলোর মধ্যে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে খাটে না। এদের যে কেউ ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে স্বাধীনতার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বস্তুতঃ, যা খুশী তাই করতে পারে। এই প্রবণতাটার নেতা হিসেবে আমেরিকা ব্যাপকভাবে এবং কার্যকরভাবে প্রথম বিশ্বের ইয়োরোপীয় দেশগুলোর উপরেই শুধু প্রভাব বিস্তার করছে না, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের জাতিগুলোর উপরেও প্রভাব বিস্তার করছে। মানুষকে নৈতিক জীবনের নিয়ম-শৃংখলা থেকে মুক্ত করে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সেই বিকৃত ধারণার প্রতিধ্বনি এখন শোনা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যবনিকার ওপার থেকেও।

দেহপশারিণী, সমকামী, মাদকাসক্ত, পতিতা ইত্যাদি সকল শ্রেণীর অপরাধীরা সংখ্যায় ও শক্তিতে বেড়ে চলেছে। তাদের উপদেশদাতাকে 'নয় কেন?' - শুধু এতটুকু বলেই তারা তাদের আচরণ বা ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। এবং তাদের এই ধৃষ্টতা এখন এতটা বেড়ে গেছে যে, তা সমকালীন সমাজের জন্য রীতিমত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাজ ব্যবস্থার দু'টি আবহাওয়া

পবিত্র কোরআন দু'টি সামাজিক আবহাওয়ার কথা বলেঃ

ক) এক, যে অবস্থায় অশুভ অবাধে বিস্তার লাভ করে;

খ) দুই, যে অবস্থায় অশুভের বৃদ্ধিকে কঠোরভাবে দমন করা হয়।

আপনি যদি ইসলামিক নৈতিক শিক্ষাগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করেন, তাহলে যে কোন পাশ্চাত্য মন বা মেধার পক্ষে সেই শিক্ষার বাণীর দর্শন উপলব্ধি করা খুবই কঠিন হবে। এর কারণ হচ্ছে, নৈতিক শিক্ষাকে উপলব্ধি করতে হয় একটা সামাজিক আবহাওয়ার অংশ হিসেবে। কাজেই, এই শিক্ষাগুলিকে দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে। আপনি কেবল একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়া দেখে কিংবা সব পাতার হলদে হয়ে যাওয়া দেখেই ঠাওর করতে পারবেন না যে, এটা শরৎকাল। আপনাকে শরৎকালের গোটা আবহাওয়া এবং তাপমাত্রাকে মনশ্চক্ষুতে অবলোকন করতে হবে এবং তা অনুভব করতে হবে, যাতে করে আপনি বুঝতে পারেন যে, শরৎ কালটা কী এবং তা উদ্ভিদ জগতের কি কাজে লাগে। ঠিক তেমনিভাবে, একটি সোয়ালো পাখী (শীতকালে দেশান্তরে যায় এমন পাখী) এলেই গ্রীষ্ম আসে না। কার্যতঃ, শরৎ জীবনকে নিরুদ্যম করে আর বসন্ত করে উদ্দীপ্ত । এটা শুধু তাপমাত্রার পরিবর্তন না, এটা গোটা আবহাওয়ারই রূপান্তরণ। তখন মনে হয় যেন বাতাস জীবনের শ্বাস ফেলছে। সমাজব্যবস্থাগুলিও ঋতু বা মৌসুমের মতই, এদেরও আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব।

বস্তুবাদী সমাজের দম্ভ এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি

ইসলাম ঠিক একইভাবে এই বিষয়টাকেও পেশ করে। প্রথমে, আমি এমন একটা সমাজের বর্ণনা দিতে চাই, যা কোরআন করীমের মতে অনৈসলামিকঃ

اَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ
وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۭ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ
مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

'তোমরা জেনে রাখো, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাকচিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। এর দৃষ্টান্ত বারিধারার ন্যায়, যার (দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সব্জী কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা পরিপক্ক হয়, এবং তুমি তাকে হলুদবর্ণ দেখতে পাও, যা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এবং পরকালে রয়েছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী ভোগ্যবস্তু ব্যতীত কিছু নয়। (আল্ হাদীদ - ৫৭ঃ২১)

আবার, বস্তুবাদী জীবনের দম্ভ ও ফুটানি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের কথা হচ্ছেঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَعْمَٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ
بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا
وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۝

'এবং যারা অস্বীকার করেছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিশাল মরুভূমিতে অবস্থিত মরীচিকার ন্যায়, যাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি মনে করে পানি। এমন কি সে যখন তার নিকটে পৌঁছে তখন সে তাকে দেখে যে, তা কিছুই নয়। এবং আল্লাহ্‌কে নিজের নিকটে দেখতে পায়। তখন আল্লাহ্ তাকে তার হিসাব পূর্ণ মাত্রায় চুকিয়ে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর। (আল্ নূর- ২৪ঃ৪০)

পবিত্র কোরআন এটাকে বর্ণনা করেছে মরীচিকা রূপে যা কিনা তৃষ্ণার্ত মানুষকে বার বার আশা দিয়ে দিয়ে নিরাশ করে এবং তার কাছ থেকে সর্বদাই দূরে দূরে থাকে, এমন কি সেই ব্যক্তি তার নাগাল পাবার জন্য তার পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে অবশেষে এতটা অবসন্ন হয়ে পড়ে যে, তখন পিছনে ছুটবার আর ক্ষমতাই তার থাকে না। অর্থাৎ তখন সে তার শাস্তি পেয়ে যায়। তখন সে উপলব্ধি করতে বাধ্য হয় যে, এটা একটা ফাঁকা , একটা শূন্য লক্ষ্যস্থল, যেখানে পৌঁছবার সে চেষ্টা করেছে এতকাল। সহসাই, সেই মরীচিকার দূরে সরে যাওয়া থেমে যায় এবং তাকে শাস্তির পিছনে ছুটে চলার তিক্ত তাৎপর্য উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়। এটাই সেই শাস্তি যা দেওয়া হয় তাদেরকেই যারা জীবনের দাম্ভিকতার অনুসরণ করে, এবং এভাবেই, পবিত্র কোরআনের মতে, শেষ হয়ে যায় অনুরূপ সব সমাজও। এর বিপরীতে, ধর্ম এমন একটা আদর্শের কথা বলে, যা ঘোষণা করে যে, এই পার্থিব জীবনটাই সবটুকু নয়, শেষ নয়; বরং এর পরও একটা জীবন আছে– পরকালের জীবন।

আমরা যদি এখানে -এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী মৃত্যু বরণ না করি–বরং কোন না কোন আকারে বেঁচেই থাকি, যা কিনা ইসলাম ও অন্যান্য অনেক ধর্মই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে শেখায়– যদি পার্থিব জীবনকে পরকালের জীবন থেকে আলাদা করা না যায়; এবং যদি উভয় জীবনকে এভাবেই বুঝতে হয় যে, একটা আর একটার ধারাবাহিকতা; তাহলে এই পৃথিবীর বুকে ব্যক্তির উপরে সামাজিক প্রভাবের যে ভূমিকা তাকে উপেক্ষা করাটা নিতান্তই অজ্ঞতার কাজ হবে। কারণ, অশুভ, অনৈতিক এবং অস্বাস্থ্যকর প্রভাবসমূহ পরকালের জীবনে একটা অসুস্থ আত্মার জন্ম দিতে বাধ্য।

পারলৌকিক জীবনের প্রত্যাখ্যান

পরকালের জীবন সম্পর্কে ইসলামের যে দর্শন, তার বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। তবে, এখানে এতটুকু বল্‌লেই হয়তো যথেষ্ট হবে যে, ইসলামের মতে, এখানে – পৃথিবীতে আমরা যেভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করি, তা আমাদের আত্মাকে ঠিক সেভাবেই প্রভাবিত করে, যেভাবে প্রভাবিত করে গর্ভের সন্তানকে ভ্রূণের অবস্থা থেকেই তার গর্ভধারিণী মায়ের কোন রোগ। সেই শিশু জন্মাবধি প্রতিবন্ধী হয়ে যেতে পারে, তা হলে, তার জীবনটাই তার জন্য একটা জাহান্নাম হয়ে দেখা দিবে। তাকে তখন, আর দশটা সুস্থ সুঠাম ছেলেমেয়ের মধ্যে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় জীবন কাটাতে হবে। এই দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা তার জন্য আরও বেশী কঠোর হবে এবং তীব্র হবে তখন, যখন তার বিবেকের পূর্ণতা আসবে। এটাই হচ্ছে, সংক্ষেপে, ইসলামের মতে, আমরা কী করে আমাদের নিজেদের বেহেশ্‌ত এবং দোযখ নিজেরাই গড়ে তুলি, তারই দৃষ্টান্ত।

এ প্রসঙ্গে, এটা এখন পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা যে, যে কোন সমাজ ব্যবস্থা -যা দায়িত্বহীন, বিশৃংখল এবং অশুভ আচরণের জন্ম দেয়, তা সে বাইরের দর্শকের কাছে যতই আকর্ষণীয় আর যতই লোভনীয় হোক না কেন, তাকে অবশ্যই প্রত্যাখান করতে হবে।

মুমিনদের পক্ষ থেকে পরজগৎ সম্পর্কীয় এই সব কথা বলতে এবং এই জাতীয় দাবী করতে তো কোন অসুবিধা নেই। কেননা, কেউ তো আর পরকালের জগৎ থেকে ফিরে এসে তাদের দাবীগুলো পরখ করে দেখছে না বা তাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যও দিচ্ছে না? তবে, নীড়ের দুটো পাখীর বদলে হাতের একটা পাখী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে দোষটা কি? এটাই হচ্ছে বস্তুবাদী জবাব ইসলামী দর্শনের বিপক্ষে,– যে দর্শনে বলা হয়েছে, কীভাবে সমাজ গঠন করতে হবে এবং কোন্ কোন্ নীতির ভিত্তিতে তা গঠিত হতে হবে।

ইসলামী দর্শনের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই পৃথিবীর অর্থাৎ ইহকালেরও জীবন এবং পরকালেরও জীবন। এই জীবন একটা ধারাবাহিক প্রবাহ, যাতে একটা সাময়িক ছেদ পড়ে মাত্র মৃত্যু ঘটলে। এবং এই যে মৃত্যু , তা আসলে এক জীবন থেকে আর এক জীবনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার একটা পর্যায় মাত্র। এর বিপরীতে, বস্তুবাদী দর্শন ধারণা করে যে, জীবন একটা সীমিত ব্যাপার, যা বিবেকের একটা আকস্মিক বিস্তার মাত্র। এবং যা মৃত্যুর মুহূর্তে নাস্তির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং, এই সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্ক শুধু সীমিত ইহজীবনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের সঙ্গেই। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার জীবিত থাকাকালীন সময়ের জন্য সমাজের কাছে জবাবদিহি করার জন্য দায়ী থাকে। এবং তা-ও শুধু তার জীবনের যে অংশটুকু গোচরীভূত হয় বা ধরা পড়ে তার জন্যেই। বাকী যে অংশ সমাজের অগোচরে থাকে, তা তার চিন্তা, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, হীন যন্ত্ররূপেই হোক, আর সূক্ষ্মভাবে গোপনে সংঘটিত অশুভ কোন অপরাধই হোক-যা ধরা পড়ে না, তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হয় না।

তাছাড়া, সমাজের বিরুদ্ধে কৃত কোন অপরাধকে কেবল তখনই অপরাধরূপে গণ্য করা হবে যখন সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে যে, হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই সেই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে, সঠিক বা ন্যায্য-বিচার না হওয়ার সম্ভাবনা তো থাকেই, তদুপরি এই সমাজ ব্যবস্থায়, বিচার কার্যপ্রণালী শুধু ভাসাভাসা এবং সীমাবদ্ধই নয়, বরং তা সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের পক্ষে সহায়কও বটে। এই ব্যবস্থা কায়েমী স্বার্থের প্রসার ঘটায় এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে চরম স্বার্থপরতাকে উৎসাহিত করে।

আরও একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোন নিরীশ্বরবাদী বা আধা-নিরীশ্বরবাদী সমাজে, যেখানে মৃত্যুর পরবর্তী জবাবদিহিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয় কিংবা তা এমন হাল্কাভাবে ও অস্পষ্টভাবে মানা হয় যে, তা কার্যতঃ অর্থহীন হয়ে পড়ে-সেখানে অপরাধের এমন কোন সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করাই একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যা কোন যথার্থ নৈতিক দর্শন কর্তৃক সমর্থিত হতে পারে। নিরীশ্বরবাদী সমাজের লোকেরা যখন কোন আইন ভঙ্গ করে তখন যে তারা সেটা অপরাধ করে, সে ব্যাপারে তারা নিজেরা সত্যিই সত্যিই রাজী (কনভিন্সড্) কিনা, তা বুঝে ওঠা মুশ্‌কিল। কথা হচ্ছে, আইন কি? এটা কি কোন একচ্ছত্র রাজার কথা? কোন নিরংকুশ শাসকের কথা? না কি কোন সর্বাত্মক শাসনব্যবস্থার সিদ্ধান্ত? নাকি এটা কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতন্ত্রের নির্দেশ? এবং তা গ্রাহ্য হবে কোন নৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে সঠিকরূপে প্রণীত বলে? তাছাড়া নৈতিক দর্শনটাই বা কি?

সে যদি কোনও পরম সত্তার কোনও ধারই না ধারে, অথবা তার যদি পরকালের প্রতি বিশ্বাস না থাকে এবং তার যদি ইহকালের জীবনের আচরণ সম্পর্কে প্রশ্নের

সম্মুখীন হওয়ার কোন ভয় না থাকে, তাহলে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবে সে তার সুবিধাজনক অবস্থান থেকে যা বলবে, তা একটা দায়িত্বশীল সমাজের জন্য যা প্রয়োজন তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। তার তো আছে মাত্র ইহকালের এই সীমিত জীবন। তার সমাজের প্রয়োজন শুধু তার সুখ-সুবিধার জন্যই। সে শুধু তার নিজস্ব প্রয়োজনের তাকিদেই তার সমাজের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিতান্ত অপারগ হয়েই।

সে যদি তার নিজের স্বার্থের অনুকূলে কোন সুযোগ পেয়ে যায়, এবং খুব চালাকীর সাথে সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে আনন্দে কাটাবার জন্য কিছুটা সময় করে নিতে পারে, তাহলে সে তা করবে না কেন? তথাকথিত কোন সে 'নৈতিক' বিধি-নিষেধ তাকে বাধা দিবে?

অপরাধের প্রতি এই যে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, যার সূচনা হয়েছিল নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুবাদী সমাজগুলোতে, তা এখন সময়ের ব্যবধানে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এবং ঠিক এটাই বলা হয়েছে কোরআন করীমে বস্তুবাদী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যরূপেঃ

অবিশ্বাসীরা ঘোষণা করেঃ

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

" আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই, আমরা মৃত্যু বরণ করি এবং জীবিত থাকি; বস্তুতঃ আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হব না।" (আল্ মুমেনূন-২৩ঃ৩৮)

এছাড়াও, অবিশ্বাসীরা পূর্ববর্তী নবী- রসূলদেরকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসার সুরে বলেঃ

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝

"এবং তারা এও বলে, কী! যখন আমরা হাড়গোড়ে পরিণত হব এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি বাস্তবিকই আমাদের (আবারও) এক নতুন সৃষ্টির আকারে উত্থিত করা হবে?" (বনী ইসরাঈল - ১৭ঃ ৫০)

قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝

"তারা বলে, কী! যখন আমরা মৃত্যু বরণ করবো, এবং মাটি হয়ে যাব এবং হাড়-হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা বাস্তবিকই পুনরুত্থিত হব?" (আল্ মুমেনূন-২৩ঃ৮৩)

এটাই হচ্ছে, কোরআন মজীদের মতে, বস্তুবাদী সমাজের সকল অশুভ ও অকল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু। এবং এ কারণেই, এত বেশী জোর দেওয়া হয়েছে পরকালের জীবনের প্রতি এবং বিচার দিবসের প্রতি।

ইবনে মাসূদ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) একটি আয়তক্ষেত্র আঁকলেন এবং এর মাঝ দিয়ে লম্বালম্বি একটা রেখা টানলেন, _____ _____ এই মধ্যরেখাটির উপরে আড়াআড়ি করে আরও কতকগুলো রেখা টানলেন। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চাইলেন যে, এই চিত্রটি একটি মানুষ এবং এর চতুষ্পার্শ্বের আয়তক্ষেত্রটি মৃত্যু, মধ্যরেখাটি তার কামনা-বাসনা, এবং ছোট ছোট রেখাগুলো তাঁর জীবনের পরীক্ষা ও বিপদ আপদ। তিনি বললেন যে, এগুলোর একটাতেও যদি তার পদস্খলন ঘটে, তাহলে সে পরবর্তীগুলোর যে কোনটার শিকারে পরিণত হবে। *(বুখারী)*

অন্য একটি হাদীসেও বলা হয়েছে যে, মৃত্যু হচ্ছে আমোদ-প্রমোদের পরিসমাপ্তি।

বস্তুবাদী সমাজের চারটি বৈশিষ্ট্য

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ
الْمُصَلِّينَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۝ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ
الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

"তোমাদেরকে কিসে সাকারে (জাহান্নামে) প্রবিষ্ট করলো? তারা বলবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্গত ছিলাম না। এবং আমরা মিসকীনদেরকে আহার্য দান করতাম না। এবং বাজে গল্পকারীদের সঙ্গে মিলে আমরা বাজে গল্প করে বেড়াতাম। এবং বিচার দিবসকে আমরা মিথ্যা আখ্যা দিয়ে অস্বীকার করতাম।" (আল মুদ্দাস্‌সির-৭৪ঃ ৪৩-৪৭)

এর চাইতে সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণরূপে নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে পেশ করা সম্ভব নয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছেঃ

(১) এবাদত করতে ব্যর্থ হওয়া,

(২) দরিদ্রকে আহার্যদানে ব্যর্থ হওয়া,

(৩) বাজে ও বৃথাকাজে ব্যাপৃত থাকা,
(৪) বিচার দিবসকে বা জবাবদিহিতাকে অস্বীকার করা।

বাকী আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে, আমাদের একটা বিভ্রান্তির অপনোদন করা উচিত, নইলে যে কোন সমাজের অবস্থার সঠিক রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়বে। কেননা যে সকল সমাজে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস বেশ লক্ষ্যণীয়ভাবে শক্ত বলেই মনে হয় এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসও যাদের ধর্মের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে স্বীকৃত, সেখানেও খোদা বিশ্বাসী এবং পরকালের হিসাব নিকাশে বিশ্বাসী লোকদের মধ্যেও যে অনুরূপ অশুভের ও খারাপীর বিস্তার দেখা যায়, তার তো কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যাদান করা মুশকিল।

এমন হলে, এখানে প্রশ্ন উঠে যে, এই সমাজগুলো, অন্যসব বৈশিষ্ট্যে একদম পূরোপূরি বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও, খোদাতে এবং পরকালে কীভাবে বিশ্বাস করে? এই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া কঠিন হবে না, যদি আমরা তাদের সেই বিশ্বাসের গভীরতাটা একবার পরখ করে দেখি। বস্তুতঃ, খোদার প্রতি মাত্র একটা দূরবর্তী থিওসফিক্যাল বিশ্বাস অন্য বিশ্বাসীদের সামাজিক আবরণের উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, ঐ জাতীয় বিশ্বাসগুলো কেবল তাত্ত্বিক মাত্র, এগুলো কখনোই ঐশী বা পবিত্র চরিত্র-গঠনে কার্যকর হয় না। খোদার প্রতি খাঁটি বিশ্বাস এবং মিথ্যা, মিথ্যাচারিতা, চরম স্বার্থপরতা, অন্যের অধিকার হরণ, দুর্নীতি ও নিপীড়ন কী করে এক সঙ্গে থাকতে পারে? ঐ সকল সমাজের খোদা সম্পর্কিত ধারণাটা হচ্ছে একটা সৌখীন প্রলেপ মাত্র। একেবারেই অবাস্তব। এবং তার পক্ষে মানব চরিত্র গঠনে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখার কথাটা একটা হাওয়াই গল্প ছাড়া আর কি! অনুরূপভাবে, পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাস এবং জবাবদিহির বিষয়টাকেও একটা দূরবর্তী সম্ভাবনার আবছা ছায়ায় পর্যবসিত করা হয়েছে। বাছাই-বর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিটা মুহূর্তে ইহলৌকিক বা তাৎক্ষণিক স্বার্থটাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং পরকালের জীবনের বিবেচনাটাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যখন আমরা বস্তুবাদী সমাজগুলোর কথা বলি, তখন আমরা কেবল সেই সব সমাজের কথাই বলি না, যেগুলি খোদার ধারণার বিরুদ্ধে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রায় সব আস্তিক্যবাদী ও নাস্তিক্যবাদী সমাজকে স্ব স্ব আদর্শের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মনে হলেও, বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলোর মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যই বিদ্যমান।

জবাবদিহিতা

পবিত্র কোরআন, পক্ষান্তরে, ঘোষণা করেঃ

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن
يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

"যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র। তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা তোমরা প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব নিবেন; অতঃপর তিনি যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন, এবং যাকে চাইবেন শাস্তি দেবেন, এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপরে সর্বশক্তিমান। (আল বাকারা - ২ঃ২৮৫)

পবিত্র কোরআন আরও বলেঃ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

"এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পশ্চাদানুসরণ করো না। নিশ্চয়, কান, চোখ এবং হৃদয়–এদের প্রত্যেকটি সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বনী ইসরাঈল – ৭ঃ৩৭)

এখানে 'হৃদয়' বলতে কোরআন করীম বুঝিয়েছে চূড়ান্ত জীবন-শক্তিকে যা ক্রিয়াশীল রয়েছে প্রতিটি মানবীয় কর্মের পিছনে। পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত 'ফুয়াদ' - এর অর্থ হচ্ছে মানুষের সেই চূড়ান্ত ফয়সালাকারী ইচ্ছা যা মস্তিষ্ককে পরিচালিত করে ঠিক সেইভাবে যেভাবে কেউ কম্পিউটার পরিচালনা করে। কাজেই, চূড়ান্ত ইচ্ছাই হচ্ছে সকল শুভ ও অশুভের উৎসস্থল, এবং এটাই সেই ইচ্ছা যাকে মৃত্যুর পরে একটা নতুন জীবন রূপে, চক্ষু ও কর্ণ সহকারে, জবাবদিহি হতে হবে।

এখন আসুন আমরা নিরীশ্বরবাদী সমাজগুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পরখ করে দেখি। লক্ষ্য করা যায় যে, নাস্তিকতা ও পরকালে অবিশ্বাস অর্ধ– সচেতন অবস্থায় অস্পষ্ট এবং অসনাক্ত থেকে যায়। ধর্মগুলির ক্ষেত্রে, বাহ্যতঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে এবং

পরকালে যে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, তার কাছে সেগুলোর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কখনও কখনও কারো সচেতন মনে এই গুপ্ত সত্যকে স্থান দেওয়াটাই একটা সংকটের সৃষ্টি করে। আবার, কখনও কখনও, প্রজন্মের পর প্রজন্ম অতীত হয়ে যায় তাদের এই বিশ্বাসের চপলতা ও ভঙ্গুরতা উপলব্ধি না করেই। যখন একটা যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে আর একটা নতুন যুগের সূচনা হয়, তখন গোটা সমাজটাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তার বিশ্বাসগুলোকে পরখ করে দেখতে চায়। এবং এটাই সেই ক্রান্তিকাল যখন নাস্তিকতা এবং পরকালে অবিশ্বাস -যা এতদিন অগোচরে ছিল, অপ্রতিহত ছিল-তা গোচরীভূত হতে থাকে। একটা সমাজ, যা নির্বিচারে ও নির্বিবাদে সুখ ভোগের মধ্যে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের বিশ্বাসকে সজ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করে, সেখানে নৈতিক অধঃপতন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দ্রুত প্রসার লাভ করে।

সভ্যতার গতি রুক্ষতা থেকে পরিমার্জনা বা মসৃণতার দিকে ধাবিত, তা সেই সভ্যতা মানবেতিহাসের যে কোন দেশেরই হোক, আর যে কোন কালেরই হোক। মানুষের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণাগুলো, যা মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে আন্তঃসলিলা চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে, তা অপরিবর্তনশীল থাকে। পরিবর্তিত যা হয়, তা হচ্ছে সেই সব পরিবর্তনের প্রতি সাড়া বা প্রতিক্রিয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কেউ তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারে গোশ্ত খেয়ে বা শাক-সব্জী খেয়ে। সেই গোশ্তের বা শাক-সব্জীর মান বা সেগুলোর টাটকা-তাজা থাকাটার মধ্যে তারতম্য থাকতে পারে। কেউ সেগুলো রান্না-বান্না করে খেতে পারে, কেউবা কাঁচা খাওয়াই পসন্দ করতে পারে।

একটা সমাজ যখন উন্নত হতে থাকে, তখন তার যাবতীয় মৌলিক প্রেরণার প্রতিক্রিয়াগুলোরও বিবর্তন ঘটতে থাকে এবং সেগুলো ক্রমাগতভাবে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে, যদিও এর পথ নিরূপিত হয় অধিকাংশ জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহের দ্বারা, কিন্তু সমাজের অগ্রযাত্রা অব্যাহতই থাকে, কখনও বা মন্থর, কখনও বা দ্রুত গতিতে।

যখন কোন সভ্যতা পরিপক্ক হয় বা পরিণতি লাভ করে, তখন অতি-মিশ্রণ বা অতি–জটিলতা এবং অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয়াদি প্রগতির ধারাকে উল্টোখাতে প্রবাহিত করে দেয়। ক্ষয়িষ্ণু সমাজগুলোতে তখন (সভ্যতার) গতি বিপরীতমুখী হয়ে মসৃণতা বা পরিমার্জনা থেকে রুক্ষতার দিকে ধাবিত হয়। এটি একটি ব্যাপক বিষয় এবং এর বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। আমি দুঃখিত যে,এটা আমার আজকের বক্তব্যের বিষয় নয়। কিন্তু তবু, আমি বিষয়টির কয়েকটি দিকের উপরে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

সমাজগুলো যখন উদগ্র-আধুনিকতার কারণে অধঃপতিত হতে থাকে কিংবা মাথাভারী এবং ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে, তখন সেগুলো উল্টো মুখে নিম্নগামী হতে থাকে এবং তাদের প্রেরণা-প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে জান্তব আচরণ প্রত্যাবর্তিত হয় । ব্যাপারটা প্রতিটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে গোচরীভূত না-ও হতে পারে, তবে তা সুখান্বেষণের প্রচেষ্টায় প্রায় সর্বত্রই মানবীয় সম্পর্কের বেলায় এবং আচার আচরণে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। বিষয়টা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে, যদি আমরা মানুষের যৌন আচরণের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি।

যৌন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে গোটা প্রাণিজগতেই প্রকৃতিদত্ত সুখানুভূতি জড়িত রয়েছে। যে পার্থক্যটা আমরা মানব-সমাজে দেখতে পাই, তা হচ্ছে, অমার্জিত প্রবৃত্তির কেবল নিবৃত্তিকরণ থেকে, জান্তব প্রবৃত্তির তুষ্টি সাধন থেকে, ক্রমাগতভাবে শালীন ও মার্জিত আচরণে উত্তরণ।

প্রকৃতির এটা কোন মতেই কাম্য নয় যে, যৌনবৃত্তিই হোক চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। চুড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে, সর্ব কালেই বংশবৃদ্ধিকরণ এবং প্রজাতিসমূহের বিস্তার ও সম্প্রসারণ। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা দ্বিতীয় পর্যায়ের। তবে, সমাজগুলো যখন অধঃপতনের শিকার হয় তখন ব্যাপারটা প্রায় বিপরীত হয়ে যায়।

বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের বা নিয়ম প্রণালীর ক্রমান্বয় বিকাশ, এই নিয়ম প্রণালীর সঙ্গে সম্পৃক্ত আচার-অনুষ্ঠান এবং নরনারীর পারস্পরিক মিলনের রীতি-প্রথা প্রভৃতি, সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমাজের একটা স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ বলে বিবেচিত হতে পারে, এবং বিবেচিত হতে পারে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে। কিন্তু এই বিকাশ উপর থেকে নির্দেশিত হোক কিংবা তা আপনা থেকে সংঘটিত কোন এলোপাতাড়ি ঘটনাই হোক, এই সত্যটা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, এক্ষেত্রে মৌল প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করার যে সাড়া-প্রক্রিয়া তা ক্রমাগতভাবে ভব্য ও মার্জিত হয়ে উঠেছে।

নারী-পুরুষের অবাধ ও বাছবিচারহীন যৌন সম্ভোগের কারণে সমাজদেহে আবারও সেই একই ব্যাধির লক্ষণসমূহ দেখা দিচ্ছে। যৌন সম্পর্কের প্রতি এটা শুধু একটা গা-সওয়া উদার মনোভাবই নয়, বরং এর মধ্যে, বস্তুতঃ এমন আরও কিছু নিহিত রয়েছে, যা মানবীয় স্বার্থ ও ক্রিয়াকাণ্ডের একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এলাকার গোটা আবহাওয়াটাকেই পাল্টে ফেলে। এইরূপ যৌন-সম্পর্কের বৈধতা বা অবৈধতা নিয়ে বিতর্ক করাটাকেও ইদানিং সেকেলে ব্যাপার বলে অবজ্ঞার চোখে দেখা হচ্ছে। অবশ্য, এমন গোড়া ধর্মানুরাগী গোষ্ঠীও আছে, যারা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, বিভিন্ন গণমাধ্যমে, যে কেউ লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, এই সব প্রাচীনপন্থী কট্টর ধর্মানুরাগী লোকদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

যৌন সম্পর্কে পাশ্চাত্যে এই ধারণা পোষণ করাটা ক্রমান্বয়ে একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, যৌন ব্যাপারটা একটা প্রাকৃতিক কামনা বা চাহিদা, এবং তা কোন প্রকার বাধানিষেধ ছাড়াই মেটানো উচিত। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কথাবার্তায় যে একটা লজ্জাশীলতা ছিল তা এখন সেকেলে হয়ে গেছে। নগ্নতা, অর্ধ-নগ্নতা, দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন, সম্ভ্রমহীন খোলামেলা আলোচনা, পাপ স্বীকার ও প্রকাশ করা, প্রভৃতি এখন জনসমক্ষে সত্যের প্রকাশ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

কেউ কিন্তু, আর সব প্রাকৃতিক মানবীয় কামনার ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন যুক্তি দেখাতে আসবেন বলে মনে হয় না। এটা কি একটা সাধারণ জৈব কামনা নয়, যা কিনা মানুষের মধ্যেও আছে যে, যার যা কামনা তা-ই সে পেতে চায়? এটাও কি একটা সাধারণ জৈব তাড়না নয় যে, কেউ ক্রুদ্ধ হলে বা উত্তেজিত হলে সে চাইবে, সে যেন তার অন্তরের সেই তাড়নাকে সাধ্যমত হিংস্র উপায়ে প্রকাশ করতে পারে? একটা দুর্বল কুকুর একটা শক্তিশালী কুকুরের মতই উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু শক্তিশালী কুকুরটা যখন কামড়াবে তখন দুর্বল কুকুরটা অন্ততঃ ঘেউ ঘেউ তো করবে।

সমাজের ঐ সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রথা (Taboo) তাহলে কি? যেমন, সভ্য আচরণ-বিধি, সম্ভ্রম-শালীনতার ধারণা ইত্যাদি, যা কিনা মানুষের স্বভাবজ প্রবৃত্তির অবাধ আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে? তাহলে শুধু যৌন প্রবৃত্তিটাই কেন এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হবে? কেন সেটাকে অবাধে প্রকাশ করতে বা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে? এবং কেনই বা সেটার প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ, প্রথা-ঐতিহ্য, সম্ভ্রম-শালীনতা থাকবে না বা তার প্রয়োগের যথার্থতা বা যথা অধিকার ইত্যাদির কোন বালাই থাকবে না?

আজকাল আমরা যা ঘটতে দেখছি তা এমন প্রকট ব্যাপার যে, তাকে সতর্কতার সঙ্গে আলাদা করে নিয়ে তার বিশ্লেষণ করা দরকার। যাকে আমরা অভিহিত করছি যৌন সম্পর্কের অনুমোদন যোগ্যতা বলে তার বহিঃপ্রকাশ এমন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, এতে করে মানবীয় কর্মকাণ্ডের অন্য সব ক্ষেত্রেই দস্যুবৃত্তি চালানো হচ্ছে, এবং অন্যান্যদেরকেও আঘাত করা হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে; বিকৃত রুচির সুখভোগের অদম্য বাসনা সেই পতনশীল প্রবণতা থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে যা আসলে সভ্যতার মহত্তম সৌধকেই ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে, এবং জীবনধারাকে সেই বন্য অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সমাজ কর্তৃক ব্যক্তির উপরে আরোপিত নানান আচার-আচরণ. বিধি-ব্যবস্থা, টাবু (Taboo) বা আদেশ নিষেধের বহুল বৃদ্ধিই শুধু আমরা লক্ষ্য করি না, বরং সেই সঙ্গে

আমরা এ-ও লক্ষ্য করি যে, এক্ষেত্রে রোমান্স, কোর্টশীপ বা প্রাক-বিবাহ প্রণয় নিবেদনেরও আশ্‌কারা দেওয়া হচ্ছে। কবিতা, সাহিত্য, চিত্রকলা, গান–বাজনা, স্টাইল, ফ্যাশান, প্রদর্শনী, সুগন্ধি বা সেন্ট-এর প্রতি আকর্ষণ এবং সুশীল ও সুসভ্য আচরণের অনুশীলন প্রভৃতি, সার্বিকভাবে না হলেও অনেকাংশে সেই একই মৌলিক প্রবৃত্তিরই প্রকাশ যা আচরিত হচ্ছে সামাজিক আচরণেরই আকারে।

এমন একটা সময় আসতে পারে যখন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিদ্রোহ করবে এবং হাজার বছরের অর্জিত সব সামাজিক প্রগতিকে প্রত্যাখ্যান করে বসবে। অবশ্য সেই বিদ্রোহ যে সমস্ত কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করবে তেমন না-ও হতে পারে। তবু 'হিপ্পীজম, বোহেমিয়ানিজম (বাউণ্ডুলেপনা), স্যাড়িজম বা লম্পট আচরণ, পশুসুলভ ও বন্য ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি হচ্ছে উল্লিখিত প্রবণতার মাত্র কতিপয় দৃষ্টান্ত।

যে কেউ তার সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখতে পাবে যে, সেখানে দ্রোহী ও তরবীয়ৎহীন যুবকদের একটা দল বিচরণ করছে, এবং এতে করে সে বুঝতে পারবে যে, কী সব ঘটে চলেছে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। মনে হবে যেন, ময়লা আর দুর্গন্ধই জায়গা করে নিয়েছে পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধির স্থলে। পাক-সাফ লেবাসের জায়গা দখল করে নিয়েছে নোংরা-নাপাক আর স্বেচ্ছায় অসতর্কভাবে পরিহিত পরিচ্ছদ। সেই দিন আর নেই যখন কারো পোষাক আশাকের প্রতি এক নজর তাকালেই ভীষণ একটা বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হতো। ছেঁড়া-ফাড়া জীন্‌স, বিশেষ করে দেহের নিম্নভাগের কিছু কিছু অংশ দেখা যায় এমনভাবে ছেঁড়া জীন্‌স, এখন একজোড়া নূতন প্যান্ট পাজামার চাইতে বেশী দামী। অবশ্য, সমাজের গোটাটাই যে অতীতের সব ঐতিহ্যের প্রতি অনুরূপভাবে দারুণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে তা নয়। তবে, দেহের ভিতরে যখন কোন ব্যাধির সৃষ্টি হয় তখন গোটা দেহটাই যে ক্ষতে ক্ষতে ছেয়ে যায় এমনতো নয়। বরং দেহের এখানে সেখানে দু'চারটা ক্ষত দেখা দেয়, এতে করেই বুঝা যায় যে, গোটা দেহটাই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সমাজ দেহে এমনটি হলে তখন দায়িত্বহীনতা বাড়তে থাকে। বিশৃংখলা এবং অনিয়ম তখন একটা নিয়মে পরিণত হয়। তখন সমাজের এবং মানবীয় স্বার্থের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবক্ষয় দৃশ্যমান হতে থাকে।

সুখের অন্বেষায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আরও অধিক অগ্রগতির জন্যে প্রয়োজন হয় পরিবর্তনের এবং নতুনত্বের। অতীতে সুখলাভের জন্য যে সকল সামগ্রী ব্যবহৃত হতো এখন সেগুলো আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। ধুমপান এবং প্রাচীন কালের প্রচলিত মাদক দ্রব্যাদি এখন আর ক্রমবর্ধমান অস্থির সমাজের চাহিদা মেটাতে পারছে না। এখন সব ধরনেরই মাদক বা ড্রাগ পাওয়া যাচ্ছে। এখন মাদকাসক্তির বিস্তার রোধের সকল ব্যবস্থাই অপ্রতুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু মাদকাসক্ত ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন আরও

তীব্র মাদকের। তাই উৎপাদিত হচ্ছে ক্রাক (Crack)-এর মত শক্তিশালী, তীব্র নেশাকর ও মারাত্মক ড্রাগ।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বর্তমান শতাব্দীর গত কয়েক দশক ধরে বিগত কয়েক শতাব্দীর সঙ্গীতের উন্নতির সঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর গত কয়েক দশকের গান বাজনার ক্ষিপ্রতা এবং শব্দের তীব্রতার মানের বিস্ফোরিত পরিবর্তনের তুলনা করলে অনেক মজার মজার এবং কৌতূহলোদ্দীপক উপাত্ত পাওয়া যাবে।

সংগীত বিষয়ে আমার খুব একটা জানা শোনা নেই। কাজেই, এ সম্পর্কে আমি যদি এমন কিছু বলে ফেলি যা কিনা সঙ্গীতের জগতের সাথে তেমন একটা সম্পর্কিত নয়, তাহলে যেন আমাকে ক্ষমা করা হয়। তবে, আমার বোধি আমাকে এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে যে, পাশ্চাত্য জগতে বিগত কয়েক শতাব্দীতে সঙ্গীতের যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার যাত্রা ছিল উৎকর্ষ, নির্মল আনন্দ ও মহত্বের দিকে। সেই সঙ্গীত যুগপৎ মানবমনে ও মানবহৃদয়ে শান্তি আনতে পারতো। সর্বোত্তম সঙ্গীত ছিল সেটাই যা মানবচিত্তে ও মানবহৃদয়ের মধ্যে নিহিত সুপ্ত যে সঙ্গীত তাকে সনাক্ত করতো এবং তারই ভেতরে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে যেত। সুরসঙ্গতি এবং শান্তিই ছিল চূড়ান্ত লক্ষ্য যার প্রতি ধাবিত ছিল সঙ্গীতের বিবর্তন। বড় বড় গীতিকার ও শিল্পীদের রচনায় এমন অনেক অংশ থাকতো যা অগ্নিগিরির উদ্‌গীরণ, প্রচণ্ড তুফান এবং বজ্রপাত সংঘটিত হওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারতো। এবং তা অনুভূতির জগতে এরূপ আবেদন ও আলোড়ন সৃষ্টি করতো যার উপমা কেবল প্রকৃতির বুকে সংঘটিত ঐসব ঘটনাবলীই। এ সবের স্মৃতি অনপনেয়রূপে জমাকৃত ও সংরক্ষিত থাকতো জীবনের স্মৃতিযন্ত্রের অভ্যন্তরে। সময়ে সময়ে যেই সঙ্গীতের ক্লাইমেক্স সুরলহরীর এমন উচ্চমানে পৌঁছে যেত যে মনে হতো যেন সমগ্র বিশ্বজগটাই ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাচ্ছে। তথাপি, মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতারা স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকতো, সংগীতের মহাবন্যায় তলিয়ে যেত। তারা নিষ্পলক নেত্রে নিস্তব্ধ হয়ে থাকতো, যতক্ষণ না সহসা সেই পিন-পতন নীরবতায় ছেদ পড়তো। এবং তখনই, কেবল তখনই, সারাটা হলঘর প্রচণ্ড করতালি আর উল্লাসে ফেটে পড়তো। কখনই, কোনও তীব্র ভাবাবেগ তাড়িত অত্যন্ত শক্তিশালী সঙ্গীতও শ্রোতাদেরকে উন্মত্ত, উগ্র বা বিদ্রোহাত্মক করে তুলতো না। সকল সঙ্গীতেরই বাণী ছিল মহৎ, শান্তিময় ও সুসঙ্গত। তাতে মানুষের মধ্যেকার চরম উৎকর্ষতাই বিকশিত হতো, জাগ্রত হতো, আর অপসৃত হতো তার চরম সব অপকর্ষতা।

আফসোস! বিগত কয়েক দশক ধরে আমরা যা দেখছি তা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। সমসাময়িক প্রজন্মের কানগুলো বধির করে দেওয়া হচ্ছে এমন সব গান বাদ্যের দ্বারা,

যা পারে শুধু জীবনের আদিম ও অশীলিত প্রবৃত্তিগুলোকেই জাগ্রত করতে। উচ্ছৃংখল ও অস্থির একটা প্রজন্মের কানে তো কেবল সেই সংগীতকেই সুসঙ্গত ও সুখকর মনে হয় যা তাদেরকে মাতাল করে তুলতে পারে। সেই সঙ্গীত যত উগ্র ও প্রচণ্ড হয় ততই জনপ্রিয় হয়। ক্লাসিক্যাল ও পপুলার মিউজিক সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার দরুন কোন মন্তব্য করা হয়ে থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত যে, এটাই হচ্ছে সেই উগ্রতা, প্রচণ্ডতা, দ্রোহ এবং উন্মত্ততা, এবং সৌন্দর্য-বিধ্বংসী অসুন্দর যা অতি দ্রুত মহৎ মানবীয় গুণাবলীর ধ্বংস সাধন করছে।

প্রফেসর ব্লুম (Prof. Bloom) যিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্পর্কে একজন জানাশোনা ব্যক্তি, তিনি মনে হয় এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে ঐকমত্যই পোষণ করেন। তিনি তাঁর, 'দি ক্লোজিং অব দি এ্যামেরিকান মাইন্ড্স্ (The Closing of the American Minds) পুস্তকে সমসাময়িক যুগের কিশোর ও তরুণদের মনের সংবেদনশীল অনুভূতিসমূহের অবক্ষয়ের জন্য বিলাপ করেছেন। বলেছেন যে, এই কিশোর ও তরুণরা অনবরত রক সঙ্গীতের (Rock Music) প্রভাবাধীনে থাকার দরুন পশুতে পরিণত হচ্ছে। এ জাতীয় সঙ্গীতকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, এগুলো আত্মার জন্য নেশাযুক্ত নোংরা খাদ্য।

সমাজের এই রুগ্ন অবস্থার নানাবিধ প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট উপসর্গ ফুটে বেরুচ্ছে, এবং তা ক্রমাগতভাবে মানবজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। যার দরুন, মানুষের স্বস্তি, শান্তি, তৃপ্তি, নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানুষ তো খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও করতে পারে। কিন্তু সে তো সর্বশক্তিধর প্রকৃতির (Nature) অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। এবং এই প্রকৃতি তো এটা ভালভাবেই জানে যে, কী করে তার বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের শাস্তি দিতে হয়। সকল বস্তুবাদী সমাজে অশুভ (Evil) ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এর জন্য দায়ী যে প্রধান উপকরণটি তা-ও ঐ একই। এ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে আমরা শুধু তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য সংক্ষেপে উল্লেখ করছিঃ

(ক) ক্রমবর্ধমান নাস্তিকতা;

(খ) এক সত্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যিনি জীবন্ত ও কার্যকর প্রভাব বিস্তার করেন মানুষের সব কর্মকাণ্ডে এবং তাদের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষয়িষ্ণুতা;

(গ) ঐতিহ্য ও নীতিশাস্ত্রগত মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়া; এবং

(ঘ) লক্ষ্যকে ভুলে যাওয়ার বর্ধিষ্ণু প্রবণতা এবং খোদ পন্থাকেই (Means) লক্ষ্য বলে নির্ণয় করা।

এই-ই তো হচ্ছে পরিস্থিতি, যা বিরাজ করছে পৃথিবীর তথাকথিত 'সভ্য' এবং 'উন্নত' সমাজগুলোতে। ধীরে ধীরে, নৈতিক ও নীতিশাস্ত্রের (Moral and Ethical) মূল্যবোধগুলি তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাবও বিস্তারিত হয়ে পড়ছে সরকারগুলোর আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের উপরে। গ্রাহ্য হওয়ার মত খোদা-প্রদত্ত কোন আইন (ব্যবস্থা বা শরীয়ত) যখন আর নেই (তাদের সামনে), এবং যখন নিরংকুশ নীতিশাস্ত্রের মূল্যবোধও নেই, এবং মহান ঐতিহ্যকেও যখন প্রত্যহ চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে এবং অমান্য করা হচ্ছে, তখন নৈতিক আচরণকে সুশৃংখল করার আইন প্রণয়নও হয়ে পড়ছে শিথিল ও যথেচ্ছ সম্প্রসারণশীল। এমতাবস্থায়, যে পটভূমিতে নৈতিক আচরণ সংক্রান্ত আইন-কানুনের ভিত্তি স্থাপিত হয়, সেটাই স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

এই বিষয়টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হবে যদি এ ব্যাপারে বিগত কয়েক শতকের আইন প্রণয়নের তুলনামূলক গবেষণা করা যায়। অস্কার ওয়াইল্ডের (Oscar Wilde) দিন এখন গত হয়ে গেছে যখন সমমৈথুন সমাজে একটা পাপ বলে বিবেচিত হতো, এবং সমাজ সেজন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করতো। সেদিনও আর নেই যখন সতীত্ব শুধু একটি মহৎ নৈতিক গুণ হিসেবেই গণ্য হতো না, বরং তা বিবেচিত হতো সামাজিক ট্রাস্ট বা আমানত হিসেবে, যার খেয়ানত করা হলে বিচারের সম্মুখীন হতে হতো। এখন আর অপরাধের প্রতি নমনীয়তা বিপদসংকেতরূপে বিবেচিত হচ্ছে না। আর এটাই হচ্ছে সমস্যা।

অপরাধের সংজ্ঞাই এখন মৌলিক পরিবর্তনের কবলে পড়েছে। গতকালও যা অপরাধ বলে বিবেচিত হতো, আজ আর তা হচ্ছে না। যা লজ্জার কারণে বা তিরস্কারের ভয়ে গোপন রাখা হতো এখন তা প্রকাশ করা হচ্ছে, প্রদর্শিত হচ্ছে বেশ গর্বের সাথেই। এই দর্শনটাই যদি সঠিক হয় এবং উত্তরণের উপযোগী হয় তাহলে, সমস্ত ধর্মীয়, নীতিশাস্ত্রীয় ও নৈতিক দর্শন অচল ও অবাঞ্ছিত হয়ে যাবে। সেগুলো এখন আর হাল যামানার কোনও কাজে আসবে না।

প্রকৃতির মধ্যেকার চালিকাশক্তি, জড় এবং প্রাণী উভয় জগতেই অভিন্ন। এবং সেটাই হচ্ছে, অপরাধ ও শাস্তির এবং সদ্‌গুণ ও পুরস্কারের, মূলনীতি যা সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। এই মূলনীতি জড়জগতে ক্রিয়াশীল দেখা যাবে প্রকৃতির নিয়মাবলীর অচেতন কার্যকারিতায়। একই মূলনীতিতে প্রাণী-জগতেও মানবসৃষ্টির পূর্বেকার বিবর্তন

চালিত হয়েছিল যা প্রাপ্ত হয়েছিল একটা অর্ধ-চেতন বা অর্ধ-সুপ্ত অবস্থা। কেউ যদি মানব সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত বিবর্তনের স্তরগুলোর নিম্নতম ধাপগুলো থেকে পরিভ্রমণ করে আসে, তাহলে তার এই ভ্রমণ হবে স্বল্প-চৈতন্য থেকে অধিক-চৈতন্যের দিকে। বিবর্তনের ভাষায়, অপরাধ ও শাস্তি এবং সদ্‌গুণ ও পুরস্কারের এই মূলনীতিকেই বলা হয়েছে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'। বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্যে এটাই হচ্ছে চালিকাশক্তি ও গতি-শক্তি, যা বিবর্তনের ধারাকে ক্রমাগতভাবে ঠেলে দিচ্ছে সম্মুখে এবং উর্ধ্বে।

এটা বুঝে উঠা তো অসম্ভব যে, যখন এই প্রক্রিয়াটা সর্বোত্তম সৃষ্টি যে মানুষ তার মধ্যে এসে চরমত্বে পৌঁছে গেল, এবং যখন চৈতন্য এমন সব দিগন্তে উত্তীর্ণ হলো যা মানবেতর সমস্ত কল্পনাশক্তির যাবতীয় দুর্বার কল্পনাকেও অতিক্রম করে গেল, ঠিক তখনই সহসাই অপরাধ ও শাস্তির সেই মূলনীতিকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো এবং তা অচল করে দেওয়া হলো। সৃষ্টির যদি কোন উচ্চতর লক্ষ্য থেকেই থাকে, তাহলে তার কিছুটা জবাবদিহিতা থাকতেই হবে, নইলে তো গোটা ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে পড়বে।

এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে, বড় বড় বুদ্ধিজীবীরা এবং ভাবুকরাও এই সুস্পষ্ট ও স্ব-প্রকাশিত সত্যটাকে দেখতে পান না। এবং বিষয়টা আপেক্ষিক তত্ত্বের আবিষ্কারক আলবার্ট আইনস্টেইনের কাছেও একইরূপ। তাঁর কথায়ঃ

'আমি এমন এক খোদার কথা কল্পনাও করতে পারি না যিনি তাঁর নিজস্ব সৃষ্ট বস্তুকে পুরস্কৃত করেন এবং শাস্তি দান করেন, যাঁর উদ্দেশ্য কিনা আমাদেরই উদ্দেশ্যের মডেলে গঠিত,-একজন খোদা, যিনি আছেন তো বটে, কিন্তু তিনি, এক কথায়, মানবীয় দুর্বলতারই একটা কল্পনা মাত্র।' (আলবার্ট আইনস্টেইন)।

যদি, প্রভু ও স্রষ্টা এক খোদা থেকেই থাকেন, যাঁর অস্তিত্ব আলবার্ট আইনস্টেইনও অস্বীকার করতে পারবেন না, এবং যদি সকল বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী যা সৃষ্টির মধ্যে কার্যকর রয়েছে তা সবই পরিকল্পিত হয়, সৃষ্ট হয় এবং নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সেই একই সর্বোচ্চ সত্তা (Suprime Being) কর্তৃক, তাহলে এটা তো তাঁর (খোদার) তরফে ধারণা করাও সম্ভব নয় যে, তিনি অপরাধ ও শাস্তির নীতি প্রত্যাহার করে নিয়ে তাঁর সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্যকেই পরিত্যাগ করেছেন, এবং মানুষকে ছেড়ে দিয়েছেন নিয়মশৃংখলাহীন ও জবাবদিহিহীন আচরণের এক বিশৃংখলার মধ্যে।

তাঁর (আইনস্টেইন) মন্তব্যের অপর অংশ সম্পর্কে বলতে হয় যে, এটা পরিষ্কার যে, তিনি শুধু সৃষ্টির প্রগতিশীল উন্নতির পথে অপরাধ ও শাস্তির ভূমিকা উপলব্ধি করতে

ব্যর্থ হননি, বরং যে 'মানুষ সৃষ্টি হয়েছে খোদার প্রতিবিম্বরূপে', 'তিনি সেই মানুষের অর্থও সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন।

মানুষ যদিও সৃষ্টি হয়েছে খোদার প্রতিবিম্বরূপে, তথাপি সে পৃথিবীর বুকে খোদার পরিপূর্ণ বা পারফেক্ট মডেল হিসেবে সৃষ্টি হয় নি। তা-ই যদি হতো, তাহলে দুনিয়াটা বেহেশ্‌তের চাইতেও সুন্দর হতো, এবং সকল মানুষ হুবহু একই রকম হতো। অবশ্য, এটা একটা বিতর্কযোগ্য বিষয় যে, তেমন একটা স্থানকে আদৌ বেহেশ্‌ত্ বলা যাবে কিনা, অথবা তা একটা একঘেঁয়েমীপূর্ণ স্থান হবে কি না। কেননা, তেমনটা হলে সেখানে থাকবে না কোনও বৈচিত্র্য, কোনও পরিবর্তন, অথবা গন্ধ, বর্ণ প্রভৃতির কোনও পার্থক্য। পরিবর্তে, সেটা হয়ে পড়বে একটা প্রশান্ত ও অসংখ্য-অগণিত একই শ্রেণীর বর্ণহীন বিন্দুসমষ্টির সমুদ্র। এটা তো মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়, তাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে– খোদাতা'লার প্রতিবিম্বরূপে, সে তো 'Created in the image of God.' এই শব্দগুচ্ছ বা ফ্রেজটি গভীর জ্ঞান-সমৃদ্ধ এবং এর মধ্যে মানুষকে যে সম্ভাবনাময় ক্ষমতা দান করা হয়েছে, তারই কথা বলা হয়েছে। এতে সেই চূড়ান্ত লক্ষের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যা অর্জন করার জন্য মানুষকে, অবশ্যই প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সেই লক্ষ্য ঠিক ততটাই পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত হতে হবে যতটা মানুষের পক্ষে হওয়া সম্ভব, এবং তা সম্ভব কেবল খোদায়ী গুণাবলী অর্জন করে খোদার মত হয়ে ওঠার মাধ্যমে। এটা কোন একটা নির্দিষ্ট স্থির লক্ষ্য নয় যেখানে কেউ পৌঁছে গিয়ে এই গৌরবে আনন্দ ভোগ করতে থাকবে যে, সে তো খোদার প্রতিবিম্ব হয়েই গেছে, আর না ব্যস্ হয়ে গেছে। খোদা যেমন অসীম অথবা তিনি যেমন তাঁর গুণাবলীতে সীমাহীন, তেমনি তাঁর দিকের প্রত্যেকটি সফরও সীমাহীন। এক্ষেত্রে, পূর্ণতার অর্থ নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় ক্রমাগতভাবে উত্তীর্ণ হতে থাকা।

আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ও পবিত্র, সর্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ, সর্বাপেক্ষা দয়াশীল, চিরকৃপাময়, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, প্রভু-স্রষ্টা এবং বিচার দিবসের মালিক। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ
هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ
يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্য সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত; তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। তিনিই আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই; যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, পরম শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তা দাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রতিবিধায়ক, অতীব গরীয়ান। তারা যা শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। তিনি আল্লাহ, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আদি-সুনিপুণ স্রষ্টা, সর্বোত্তম আকৃতি দাতা। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই! আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলেই তাঁর গুণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে, এবং তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।" (আল্ হাশর -৫৯ঃ ২৩-২৫)

এই-ই তো হচ্ছেন সেই খোদা যিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি কখনই মানবীয় দুর্বলতার শিকার হন না। পবিত্র কোরআন বার বার বিশ্বাসীদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেঃ

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝ ٱلَّذِى خَلَقَ
ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝
ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن
تَفَٰوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝

"পরম বরকত ও কল্যাণময় তিনি যাঁর হাতে সকল আধিপত্য, এবং তিনিই সব কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান; যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী অতীব ক্ষমাশীল; যিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ। তুমি রহমান আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তুমি কি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাও?

অতঃপর তুমি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে তোমার নিকটেই ফিরে আসবে এমতাবস্থায় যে তা অতি শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়বে (তবু কোন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না)"। (আল্ মুল্ক্- ৬৭ঃ২-৫)

'খোদার প্রতিবিম্ব'- কথাটির তাৎপর্য অনুধাবন করার পর কেউ যদি বিশ্বজগৎ সৃষ্টির সমস্ত বলের (Forces) প্রতি তার দৃষ্টি ফেরায় – সেই 'বিগ ব্যাঙ' (Big Bang)-এর সময় থেকে নিয়ে আজকের দিন পর্যন্ত, তাহলে সে দেখতে পাবে যে, অচেতন থেকে সচেতন পর্যন্ত সৃষ্টির সারাটা ভ্রমণই হচ্ছে, বস্তুতঃ খোদার প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠারই ভ্রমণ এবং মানুষের মধ্যে খোদায়ী গুণাবলীর ক্রমবিকাশ সাধন।

ইসলামের সামাজিক আবহাওয়া

ইসলাম, অপর পক্ষে, এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে চায় যা উপরে বর্ণিত আবহাওয়া থেকে স্বতন্ত্র, যেন তা শরৎ থেকে বসন্তে রূপান্তরণ।

ইসলামী সমাজের যে ধারণা (Concept), তার আওতায় ইসলাম স্বভাবের কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সুশৃংখল করে এবং পরিশীলিত রাখে, নইলে তা যদি অনিয়ন্ত্রিত রাখা হয়, তাহলে তা আবেগ-অনুভূতির রাজ্যে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে ছাড়বে। ইসলাম সেই কামনা বাসনাকে নিরুৎসাহিত করে, প্রতিহত করে যা, পরিশেষে, সমাজে সুখের বদলে দুঃখকেই ডেকে আনে। ইসলাম, একইসঙ্গে, নবনব রুচিরও চর্চা করে এবং এমন সব কর্মের মাধ্যমে সুখ ও তৃপ্তি লাভের ক্ষমতা সৃষ্টি করে, যা অসভ্য ও অশিক্ষিত লোকদের কাছে বিবর্ণ ও বিস্বাদ ও নীরস মনে হবে। ইসলাম রুচিসমূহকে পরিশীলিত করে, এবং বাজে ও নোংরা প্রবৃত্তির তাড়নাসমূহকে সংহত ও সুশীল করে তোলে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কীভাবে নিরূপণ করবো যে, বিরাজমান এই সমসাময়িক প্রবণতাগুলো সমাজের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়? আমার কাছে এর উত্তর মনে হয় সোজা। একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় যে সকল উপসর্গ দেখে, ঠিক একইভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে একটি সমাজেরও। যখন কোন ব্যক্তি ব্যথা-বেদনায় ভুগতে থাকে, অস্বাভাবিক বা অর্ধস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে, অথবা যখন তাকে দেখে মনে হয় যে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কারণে তার মনের বা হৃদয়ের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তখন সেই ব্যক্তিটি যে অসুস্থ ও দারুণভাবে পীড়িত এ কথা বলে দেওয়ার জন্য কোন বিজ্ঞব্যক্তি বা কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন পড়ে না; এবং এই জাতীয় সমস্ত উপসর্গই এখন দেখা দিয়েছে হাল যামানার সমাজে।

কত যথার্থই না ছিল যীশুর (আঃ) সেই কথাগুলি যখন তিনি বলেছিলেনঃ

"তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। লোকে কি কাঁটাগাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুরফল সংগ্রহ করে? সেই প্রকারের প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে। ভাল গাছে মন্দ ফল ধরিতে পারে না, এবং মন্দ গাছে ভাল ফল ধরিতে পারে না।" (মথি-৭ঃ ১৬-১৮)

জনগণ আজ এই ফলের তিক্ততার বিরুদ্ধে নিজেরাই গলা ফেটে কান্না জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু, তারা কেন জানি না, এই বৃক্ষটিকে বদলাতে চাচ্ছে না অপর একটা ভাল বৃক্ষের সঙ্গে। তারা দেখতেই পাচ্ছে না, না বৃক্ষটির কোনও দোষ, না তার ফলের।

ইসলামী সামাজিক নিয়ম-বিধি মন্দ বৃক্ষটিকে উপড়ে ফেলে দেয় এবং পরিবর্তে একটা স্বাস্থ্যবান ভাল বৃক্ষকে রোপণ করে। কোরআন করীমের মতে, আদম (আঃ)-কে যে সেই বৃক্ষের ফল খেতে বারণ করা হয়েছিল তার অর্থ ছিল সংক্ষেপেঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۝
تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ কীভাবে একটি পবিত্র বাক্যকে একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় বলে উপমা বর্ণনা করেছেন, যার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং তার শাখাপ্রশাখাসমূহ আসমানে বিস্তারিত? সে তো স্বীয় প্রভুর অনুমতিক্রমে সদা ফল দিতেছে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমাসমূহ বণনা করছেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা ইব্রাহীম-১৪ঃ২৫, ২৬)

এখানে, বৃক্ষ একটি প্রতীক মাত্র। একই প্রতীকি ভাষায় পবিত্র কোরআন একটি সুস্থ দর্শন-বিরোধী সেই একই অসুস্থ দর্শনের কথা বলেছে। সেই মন্দ বৃক্ষ এবং অবিশ্বাসীদের অবস্থা বর্ণনা করেছে পরবর্তী দু'টি আয়াতেঃ

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ
مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ۝ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ

فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ
وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۝

"এবং মন্দ বাক্যের উপমা মন্দ বৃক্ষের ন্যায়, যাকে যমীনের উপর থেকে উৎপাটিত করে ফেলা হয়েছে যার কোন স্থায়িত্ব নেই। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ এই স্থায়ী বাক্য দ্বারা তাদেরকে ইহজগতে স্থায়িত্ব দান করেন এবং পরজগতেও, এবং আল্লাহ্ যালেমদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেন। এবং আল্লাহ্ যা চান তা-ই করেন।" (১৪ঃ২৭,২৮)

এই প্রসঙ্গে 'বাক্য' ('কলেমা' বা word) কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে একটা দর্শন, একটা পদ্ধতি, একটা নিয়ম বোঝাতে, ঠিক যেমন 'বাক্য' (word) ব্যবহৃত হয়েছে আরও অধিক গূঢ় অর্থে যোহন-এর প্রথম শ্লোকেঃ

"আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।" (যোহন-১ঃ১)

মন্দ দর্শন এবং মন্দ নিয়ম মন্দ বৃক্ষের ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য, যা যোগ্যতমের উদ্বর্তনের পরীক্ষায় ব্যর্থতাই বরণ করে থাকে। এবং, অবশেষে, তা উৎপাটিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে এখানে সেখানে প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতে। অপরপক্ষে, একটা সুস্থ দর্শন, পদ্ধতি বা নিয়মের উপমা হচ্ছে একটি সুস্থ বৃক্ষ যার শিকড় প্রোথিত থাকে মৃত্তিকার গভীরে এবং যার অত্যুচ্চ শাখা-প্রশাখাসমূহ বিস্তারিত হয়ে পড়ে পবিত্র এক বেহেশ্‌তী আবহাওয়ার মধ্যে। এই বৃক্ষ বেহেশতী আলোতে লালিত এবং এটা সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর ফল দান করে প্রত্যেক ঋতুতেই। পবিত্র কোরআন বিশ্বাসীদের বর্ণনায় বলেছে যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। তাদের এই বিশ্বাসের উপরেই নিরাপদভাবে এবং দৃঢ়ভাবে স্থাপিত তাদের গোটা নীতিগত ও নৈতিক অট্টালিকা। এটাই ইসলামী নৈতিকতাকে ও নীতিশাস্ত্রকে পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্য দান করেছে। যা সামাজিক, ধর্মীয় ও গোত্রীয় জীবনের কোন জানা ক্ষেত্রেই কোন বৈষম্যকে অনুমোদন করে না।

মানবীয় সকল কর্মকাণ্ডের পথনির্দেশক নীতি বর্ণিত হয়েছে কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ
فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

"এবং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবং সকল বিষয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই উপরে ভরসা কর; এবং তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে তোমার প্রভু গাফেল নন।" (সুরা হূদ – ১১ঃ১২৪)

একইভাবেঃ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

"নিশ্চয় সৃষ্টি করার এবং আদেশ দেওয়ার সত্ত্বাধিকার তাঁরই, বরকতময়, সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।" (আরাফ-৭ঃ৫৫)

ইসলামী সমাজের মৌলিক আদর্শ

এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের একেবারে কেন্দ্রীয় বাণী হচ্ছেঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

"আল্লাহ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার করবার (সুবিচারের চাইতেও বেশী করবার এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্যের চাইতেও অধিক দান করবার) এবং আত্মীয় স্বজনকে (এবং দান করা যায় এমন অন্যান্য লোকদেরকেও) দান করার আদেশ দিচ্ছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা থেকে (যা আজকাল প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায় রেডিও, টেলিভিশন, এবং পৃথিবীর বহু সমাজের রাস্তাঘাটেও) এবং মন্দকাজ (শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বরং মানবীয় বিবেকের বিচারেও) এবং বিদ্রোহ করা থেকে বারণ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" (আন্ নাহল – ১৬ঃ৯১)

এই আয়াতের প্রথমাংশ সামাজিক নিয়ম-নীতির চাইতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য। এতে ইসলামী ধারণা বা কনসেপ্ট অনুযায়ী সমাজের ভাগ্য - তাড়িত লোকদের প্রতি সুবিচার, ন্যায়পরতা এবং উপকারের একটা সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে তোলা হয়েছে। আয়াতের দ্বিতীয় অংশে অংকিত হয়েছে এমন এক সমাজের প্রতিচ্ছবি যে সমাজকে সৃষ্টি করতে চায় ইসলাম।

আয়াতের এই অংশে আল্লাহ্ সার্বজনীনভাবে বিবেচিত সকল প্রকারের মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যেমন অসদাচরণ করা, মুখের উপর অপমান করা, তিরস্কার করা ইত্যাদি। আসলে, যাবতীয় সামাজিক মন্দ কাজ, তা সে সম্পর্কে কোন ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষায় কিছু বলা থাক আর না-ই থাক, যা মানব সমাজে সর্বত্রই সবার কাছে নিন্দিত, গর্হিত, তা করা থেকে বারণ করেছেন আল্লাহ্।

একইভাবে, ইসলাম এমন প্রত্যেক প্রকারের প্রবণতা, আচরণ, এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং সে সবের নিন্দা করে যা সমাজে বিশৃংখলা, বিদ্রোহ এবং সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। 'বিদ্রোহ' শব্দটিকে এখানে এই গূঢ়ার্থে গ্রহণ করতে হবে যে, যে কোনও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে (order) অবৈধ বা অন্যায়ভাবে নষ্ট বা বিপর্যস্ত করার যে কোন প্রচেষ্টাই বিদ্রোহ। কিন্তু, এটাই সবটা নয়। কেননা, পবিত্র কোরআনে আরবী 'বাগীঈ' শব্দটি শুধু সশস্ত্র বা রাজনৈতিক অভ্যুত্থান বুঝাতেই ব্যবহৃত হয়নি, বরং তা ব্যবহৃত হয়েছে সমাজের মহান ঐতিহ্য, নীতিশাস্ত্রীয় মানদণ্ড, ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা এবং নৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে বুঝাতেও।

অবশেষে, এই বলে সমাজকে সুস্পষ্টরূপে সতর্ক করা হয়েছে যে, এই উপদেশ দেওয়া হলো মানুষের নিজেরই কল্যাণার্থে। আর এখানেই একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিপূর্ণতা। এই সঙ্গে আরও বলা যায় যে, এই আয়াতের প্রথম অংশটি ইসলামী সামাজিক শিক্ষার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যে সমাজ অপর মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয় এবং মানবতার সেবায় সদা আগ্রহী নয়, তাকে কোনমতেই ইসলামী সমাজ বলা যাবে না, তা সে যতই ইসলামী সমাজের অন্যসব শিক্ষাকে মেনে চলুক না কেন।

এখন আমরা পবিত্র কোরআনে নির্দেশিত ইসলামী সমাজের আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চাই।

ইসলাম সংহতি, আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার উপরে জোর দেয় এবং সেই সমস্ত কার্যব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যা মনের ও হৃদয়ের শান্তি সৃষ্টি করে। ইসলাম সমাজের জন্য এমন সব প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে তা সুখের অন্বেষায় বিগড়ে যেতে না পারে। কাজেই, কোন আচরণ তা সে শুরুতে যতই নির্দোষ মনে হোক না কেন, তা যদি সমাজকে ছেড়ে দেওয়ার অবস্থার দিকে ধাবিত করবে বলে আশংকা থাকে, তবে তাকে রুখতে হবে। নইলে সমাজে যে ক্ষতি সাধিত হবে, তা হবে বিপুল ও বহুমুখী। এহেন সমাজ পরিণামে বিশৃংখলার মধ্যে ডুবে যেতে বাধ্য, যেমনটা আমরা দেখছি আজকের দুনিয়াতে।

অনুরূপ সমাজের সুখের জন্য যথেচ্ছ অবাধ প্রবণতা, আর যাই হোক, পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে ফেলে এবং পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে। এর প্রতিপক্ষে, ইসলাম পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, ভগ্নীত্ব এবং অপত্য সম্পর্কের পরিচর্যা করে এবং তা রক্ষা করে আগ্রহ সহকারে। ইসলাম সেই বন্ধুত্বকে উৎসাহিত করে যা পার্থিব হওয়ার চাইতে অনেক বেশী স্বর্গীয়।

সতীত্ব

সমাজে নারীদের অবস্থানের জন্য কোন পরিকল্পনার শুরুতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, ইসলামের মতে সতীত্ব, সাধুতা, আনুগত্য, সংযম ও পাক-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করা।

যৌন-তাড়নার অবাঞ্ছিত ও আকস্মিক–সম্মিলনের (short-circuiting) বিরুদ্ধে সুষ্ঠু পৃথকীকরণ ব্যবস্থা সম্বলিত সতীত্বের জীবন যাপন করার প্রতি জোর দিয়েছে ইসলাম, যা কিনা ইসলামী সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামী সমাজের এই শিক্ষা পরিবার-পদ্ধতির টিকে থাকার এবং নিরাপদে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং তা বর্তমান সময়ের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

ইসলাম পরিবারের প্রতিটি ইউনিটের পরিসরকে নামে মাত্র পর্যবসিত না রেখে তা প্রকাশিত করতে চায়। তা হবে এমন একটি পরিবার যার অভ্যন্তরে পারস্পরিক ভালবাসবার এবং ভালবাসা পাওয়ার আকাংখা পরিতৃপ্ত হবে; এবং তা শুধু যৌন-বাসনা পূরণের মধ্যেই সীমিত থাকবে না, বরং তা অধিকতর মার্জিত ও রুচিশীল বা পরিশীলিত বন্ধুত্বের ও যোগাযোগের মাধ্যমে পূরণ হবে, যেমন তা হয়ে থাকে স্বাভাবিক কারণেই রক্তের সম্পর্কের মধ্যে, তা সে সম্পর্ক নিকট হোক আর দূর হোক।

এটা একটা তাজ্জবের ব্যাপার যে, আধুনিক সমাজের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাও এটা দেখতে পান না যে, সমাজের মধ্যে যৌন-সম্ভোগের লালসাকে একবার অবাধে বিচরণ করতে দিলে তাতে মানবীয় দুর্বলতার কী পরিণতি হয়। তখন তা অন্য সব পরিশীলিত মূল্যবোধকে ধ্বংস করেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তা রোগজীবাণুর মতই সেই সব মূল্যবোধের রক্ত শোষণ করতে থাকে।

সিগমন্ড ফ্রয়েড, নিঃসন্দেহে, এই ধরনের একটা সমাজেরই ফসল। তিনি প্রতিটি মানবীয় বৃত্তিকেই বিশ্লেষণ করতে বসেছিলেন যৌন-প্রবৃত্তির রঙিন চশমা পরে। তাঁর কাছে, সবচেয়ে পবিত্র যে সম্পর্ক, মা–শিশু সম্পর্ক, তা–ও নিছক যৌনসম্ভূত। এমনকি, পিতা কন্যার যে সম্পর্ক তার মধ্যেও কোন পবিত্রতা নেই, আছে যা তা নাকি যৌন-সম্পর্কিত বা যৌনসম্ভূত। তাঁর মতে, মানুষ যা করে, তার প্রায় প্রত্যেকটি কাজই, তা

সে জেনে করুক আর না-জেনেই করুক, তার মূল কারণ হচ্ছে তার গভীর অবচেতন যৌন-তাড়না। আমি অবাক হয়ে ভাবি যে, ফ্রয়েডের সময়ের সমাজেও আজকের মত নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা ছিল কি না। তবে এতটা নিশ্চয়ই ছিল যা মানব-মনে সম্পূর্ণরূপে যৌন-প্রভাবিত বোধ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ফ্রয়েডের ধারণা যদি ঠিকও হয়, তাহলে এটা আরও বেশী জরুরী যে, সমাজের মধ্যে অসতর্কভাবে এমন সব বিপজ্জনক শক্তিকে ক্রিয়াশীল থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না যা সহসাই অঘটন ঘটাতে পারে।

হায়! আধুনিক সমাজগুলোর বর্তমান আবহাওয়া ইসলামের সামাজিক আবহাওয়ার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করার কোনও চেষ্টাও করে না। মানুষের সব কর্মকাণ্ডে এবং মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে খোদাতা'লার ভূমিকা আছে এই ধারণা বা কনসেপ্টের সঙ্গে মানুষ একমত হোক বা না হোক; এবং খোদাতা'লার বান্দা অনুযায়ী সে তার আচরণ গড়ে তুলুক আর না-ই তুলুক, একটা জিনিষ একেবারেই নিশ্চিত যে, মানুষ না খোদার কাজকে (অর্থাৎ প্রকৃতিকে), না খোদার বাণীকে (অর্থাৎ যাবতীয় সত্যকে) পরাভূত করতে পারে। ঐশী কাজ এবং ঐশীবাণী যে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে অখণ্ডনীয় বলেই মানতে হবে। যে কোন সামাজিক আচরণ যা মানুষ অবলম্বন করে সরাসরি খোদার বাণীর বিরুদ্ধে, তা পরিণামে বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। মানুষ যত আকাংখাই করুক না কেন, সে কখনই অসীম ও অবাধ সুখভোগ করতে পারবে না। যতটুকু সে পারবে তা শুধু কিছু মূল্যবোধ ও কিছু অভিরুচির লেনদেন মাত্র। একটা সমাজ যা মাদকদ্রব্য বা ড্রাগের সাহায্যে জীবনের দায়িত্বাবলী ও বাস্তবতাকে এড়িয়ে চলতে চায়ঃ একটা সমাজ যা যৌন ক্রিয়াকলাপে, বাজে উত্তেজনায় এবং উল্লাসে মগ্ন থাকতে চায়ঃ একটা সমাজ যেখানে রুচিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হয় এবং তজ্জন্য সুখভোগের উদ্দেশ্যে অধিকতর কামনা-বাসনার উদ্রেককারী যন্ত্রপাতি ও উপকরণের কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি করা হয়, যে বাজার পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয় শক্তিশালী সব সিন্ডিকেটের দ্বারা, যেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা; সেই সমাজ ঐ সব কিছুই করে মহত্তর মানবীয় মূল্যবোধ, মানসিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিনিময়ে সামগ্রিকভাবেই। দু'টোই তো আর আপনি একইসঙ্গে পেতে পারেন না। আপনি পিঠাটা খাবেনও রাখবেনও, তা তো হতে পারে না।

এর ঠিক উল্টোটার উপরেই জোর দেয় ইসলাম। সুখভোগ থাকবে বটে, তবে তা গোটা সমাজের মানসিক শক্তি ও নিরাপত্তার বিনিময়ে নয়। সেই সব যাবতীয় প্রবণতাকেই ইসলাম কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করে যা বাধাহীন থাকলে ক্রমাগতভাবে পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে এবং স্বার্থপরতা, দায়িত্বহীনতা, অশ্লীলতা, অপরাধ ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে।

এই দু'টি দর্শন কর্তৃক সৃষ্ট দু'টি আবহাওয়ার মধ্যে তফাৎ আকাশ পাতাল।

আমার কাছে এটা আশ্চর্য লাগে যে, কিছু সংখ্যক লোক কী করে এটা আশা করে যে, একটা সমাজে উচ্চাভিলাষকে বাড়িয়ে তুলে অথবা কামনা-বাসনাকে অবাধে বিচরণ করতে দিয়েও সেই সমাজে মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পৃথিবীর কোন সমাজই, তা সে অর্থনৈতিকভাবে যতই সুদৃঢ় হোক না কেন, তা লালসাপূর্ণ ইচ্ছা-অভিরুচিকে সীমাহীন ও বাধাহীনভাবে বাড়তে দিলে তা কখনই বরদাস্ত করতে পারবে না।

এমনকি, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী সমাজগুলোতেও ধনীও আছে, গরীবও আছে এবং যারা জীবনের অতি প্রয়োজনীয় সব কিছু থেকে বঞ্চিত তারাই সমাজের অনেক বড় অংশ। পক্ষান্তরে, তারাই সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; যারা জীবনের সমস্ত চাহিদাই মেটাতে সক্ষম, তবু, সেটাও প্রশ্নাতীত নয়। কারণ, সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে, সম্ভবতঃ, সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিরাও তাদের বাসনা-কামনা সম্পূর্ণরূপে মেটাতে পারে না। তবে, তুলনামূলকভাবে গরীব যারা, সংখ্যাগুরুও বটে, তাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তাদের পক্ষে ধনীদের মত বিলাসবহুল জীবনযাপন করা তো দূরের কথা, তারা তাদের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলোই পূরণ করতে পারে না। এবং এই গরীবদের আবেগ-অনুভূতি আর আশা-আকাংখা নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করা হয় আধুনিক সব গণ-মাধ্যমে। এই গণমাধ্যমগুলো দিনে রাতে, গরীবদের কুঁড়ে ঘরে গৌরবময় জীবনের রঙিন স্বপ্ন দেখায়- স্বপ্ন দেখায় প্রাসাদসম আবাসগৃহের, বিশাল বিশাল বাগানের, বিলাসবহুল গাড়ীর বহরের, হেলিকপ্টারের, ব্যক্তিগত এরোপ্লেনের এবং দেহরক্ষী সশস্ত্র বাহিনীর, স্বপ্ন দেখায় হলিউড ও বেভারলি হিলের জীবনধারার যেখানে আছে গানবাজনা ও হৈ-হুল্লোড় করার সরাইখানা, আছে নাচের ও আনন্দ-উল্লাসের পার্টি অথবা সার্বজনীন নৃত্যশালা, জুয়া-ঘর এবং ধারাবাহিক নাটকাদির ভেল্কিবাজি, যেখানে সবচেয়ে, গরীবও চাইলে প্রবেশাধিকার পেতে পারে। তথাপি, সর্বাপেক্ষা ধনীদের মধ্য থেকেও অতি স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই, পৃথিবীর বুকে, অনুরূপ স্বর্গে পৌঁছে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। এই শ্রেণীর লোকেরা, অবশ্যই, তাদের চারিধারের দরিদ্র ও নোংরা পরিবেশের প্রতি সকল আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাদের কাছে বাড়ীঘরেরও কোনও আবেদন আর থাকে না। তাদের সুখের সেই কল্পনায় তখন সংস্কৃতি এবং সভ্যতাও আর পাশাপাশি বিরাজ করতে পারে না। এই প্রেক্ষাপটে, তাদের নিজেদের জীবনের সকল বাস্তবতাই অর্থহীন হয়ে পড়তে থাকে। এটাই যদি হয় একটা সমাজের চূড়ান্ত উন্নতি, যে সমাজটা বৃথা সুখভোগ আর অবাস্তব কল্পনা দ্বারা চালিত, যেখানে গৃহের শান্তি ও মায়ামমতা দিনে দিনে শূন্যে মিলিয়ে যায়, সেখানে ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকার মত তাদের আর কী-ই বা থাকে।

ঐতিহ্যগত পারিবারিক ইউনিট– যা কিনা তার সদস্যদেরকে পরস্পরের আস্থা, নির্ভরশীলতা এবং শান্তি প্রদায়ী মমতার উপরে একত্রিত রাখে, তার পুনঃস্থাপনের জন্য আজ একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যদিও সম্ভবতঃ, এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক দেরী করে ফেলেছি আমরা।

এ সম্পর্কে ইসলামের একটা সুস্পষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। এর একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে, যার দ্বারা একটা সার্বজনীন পরিবার পদ্ধতিকে নিরাপদ রাখা যায়, প্রহরা দেওয়া যায় এবং সংরক্ষিত রাখা যায়। এবং যেখানে পরিবার–প্রথা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, সেখানেও তা পুনর্গঠিত করা যায়।

ইসলামের মতে, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃঢ়–বিশ্বাস আর উপলব্ধির মাধ্যমে শৃংখলা গড়ে তুলতে হবে, এবং হারানো ভারসাম্য পুনঃস্থাপিত করতে হবে।

নারী-পুরুষের পৃথকীকরণ

ইসলামের পর্দা-প্রথাকে পাশ্চাত্যের লোকেরা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছে। পর্দাকে (আক্ষরিক অর্থ-আবরণ) তারা দেখেছে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা শ্রেণীগত পৃথকীকরণ ব্যবস্থারূপে। এই ভুল বুঝাবুঝিটার সৃষ্টি হয়েছে, অংশতঃ, মুসলিম জাহানের বহু এলাকায় ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার অপপ্রয়োগের দরুন, এবং বাদবাকীটা হয়েছে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলোর নেতিবাচক ভূমিকার জন্য। পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমের এটা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামের কথা উঠলেই তার প্রতি একটা কুৎসিৎ আচরণ প্রদর্শন করা হয়। অথচ, ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা হিন্দুর ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ ধর্মের ব্যাপারে তেমনটা করা হয় না।

নারী পুরুষের পৃথকীকরণের যে নির্দেশ ইসলাম দেয়, তা কোনভাবেই প্রাচীন অন্ধকার যুগের সংকীর্ণমনা দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত নয়। বস্তুতঃ, সমাজে নরনারীর অবাধ মেলামশার প্রশ্নটা বা এর উল্টোটার সঙ্গে সময়ের অগ্রমুখিতা বা পশ্চাদমুখিতার কোন সম্পর্ক নেই। গোটা ইতিহাসেই দেখা যায় যে, সমাজগুলো সামাজিক বা ধর্মীয় তরঙ্গমালার হয় তুঙ্গে উঠে অগ্রসর হয়েছে, নয় তো তার তলায় পড়ে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

নারীমুক্তি আন্দোলনের ধারণাটা কোনমতেই সমাজের কোন প্রগতিশীল প্রবণতা নয়। এমন বহু জোরালো প্রমাণ রয়েছে যে, মানবেতিহাসের নিকট অতীতে যেমন, তেমনি দূর অতীতেও নারীরা শ্রেণী হিসেবেই মানব সমাজে, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে, যথেষ্ট শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল।

সমাজে নারী ও পুরুষের মুক্ত ও অবাধ মেলামেশার ব্যাপারটা কোন নতুন বা অভিনব কিছু নয়। সভ্যতা এসেছে এবং গেছে। আচরণের পদ্ধতি এক ধরন থেকে অন্য ধরনে পাল্টিয়েছে। অজস্র সামাজিক প্রথা ও প্রবণতা বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ঘটে চলেছে চলমান এই বর্ণালী দৃশ্যের প্রতিটি পট-পরিবর্তনে। আজও পর্যন্ত কোনও একটা প্রথা বা প্রবণতা স্থিরতা পায়নি, যদ্বারা আমরা নিশ্চিতরূপে এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, সারাটা ইতিহাসে, সমাজ (নারীপুরুষের) পৃথকীকরণ পর্যায় থেকে মুক্ত ও অবাধ মেলামেশার পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়েছে, কিংবা অন্তরীণাবস্থা থেকে নারীরা মুক্তি ও স্বাধীনতার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে।

নারী-অধিকারের নব যুগের সূচনা

এখানে আমরা আরবের ইতিহাসের সেই অন্ধকার যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চাই, যে সময়টাতে ইসলাম জন্ম গ্রহণ করেছিল। আমরা, মুসলমানরা, বিশ্বাস করি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঐশী নির্দেশের অধীনে, যদিও অমুসলমানরা মনে করে যে, ইসলাম মুহাম্মদের (সাঃ) নিজেরই শিক্ষা। এদের ধর্মবেত্তাদের অনেকের অভিমত যা-ই হোক না কেন, আসলে সত্য এটাই যে, নারী ও পুরুষের পৃথকীকরণের যে শিক্ষা ইসলাম দেয়, তা কোনক্রমেই আরব আচরণের প্রতিফলন নয়।

সে সময়ে নারীদের প্রতি আরবী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল চরমভাবে পরস্পর বিরোধী। একদিকে, যৌনাচারের যথেচ্ছ অনুমতি, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, এবং সুরা, নারী আর গানবাদ্যের উন্মত্ত উৎসব; অপর দিকে, কন্যা সন্তানের জন্মকে অমর্যাদাকর ও চরম লজ্জাস্কর মনে করা। এমনকি, কোন কোন 'গর্বিত' আরব এই কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাদের সদ্য প্রসূত কন্যাকে নিজের হাতেই কবর দিত বলেও কথিত আছে। এটাই ছিল তখনকার আরবী সমাজের বৈশিষ্ট্য।

নারীদেরকে মনে করা হতো অস্থাবর সম্পত্তি। তাদের কোন অধিকার ছিল না যে, তারা স্বামী, পিতা, ভ্রাতা বা পরিবারের অন্য কোন পুরুষ সদস্যের কোন বিরোধিতা করে। তবু, এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম ছিল। তখন, এমনও দেখা যেত যে, নেতৃত্বের অসাধারণ গুণসম্পন্ন কোন মহিলা তার গোত্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

ইসলাম এ সমস্ত কিছুকেই পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। এবং তা করেছিল সামাজিক টানাপোড়েনের স্বাভাবিক অগ্রগামিতার ফলশ্রুতিরূপে। একটা সামাজিক ব্যবস্থা নির্দেশিত হয়েছিল উর্ধ্ব থেকে, যার সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের স্বাভাবিক শক্তিনিচয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

পৃথকীকরণের শিক্ষার মাধ্যমে যৌন-অরাজকতা এক চোটেই বন্ধ করা গিয়েছিল। নারী পুরুষের সম্পর্কের নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল, এবং তা হয়েছিল গভীর নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। একই সঙ্গে, নারীর মর্যাদা এতো উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল যে, তাদেরকে আর কোনভাবেই সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীর মত অসহায়রূপে গণ্য করা সম্ভব হতো না। তাদেরকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে সমান অংশীদারিত্ব দেওয়া হতো। অথচ, ইতোপূর্বে, তাদেরকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হতো অস্থাবর মালামালরূপে। এখন তারা নিজেরাই সম্পত্তির ওয়ারিশ, ওয়ারিশ শুধু পিতারই নয়, স্বামীরও, সন্তানেরও, এমনকি আত্মীয়েরও। তারা এখন তাদের স্বামীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। কথার জবাব দিতে পারে। তারা এখন তাদের যুক্তি পেশ করতে পারে। এবং, অবশ্যই, ভিন্নমতও পোষণ করতে পারে। তারা যেমন তালাক পেতে পারে, তেমনি চাইলে, তালাক দিতেও পারে।

ইসলামে নারীরা 'মা' হিসেবে এমন সুউচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত যে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোনও সমাজে কখনই ছিল না, এখনও নেই। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সাঃ) নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐশী-নির্দেশের আলোকে ঘোষণা দিয়ে গেছেনঃ

'মায়ের পায়ের তলায় বেহেশ্‌ত'

তিনি (সাঃ) এই অঙ্গীকার বাণী শুধু পরকালে মৃত্যুর পরেই, পূর্ণ হবে বলে বলেননি; বরং তিনি এই বাণীতে এমন এক সামাজিক জান্নাতেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে লোকেরা তাদের জননীদেরকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করবে, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে এবং তাঁদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও আরাম আয়েশের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এবং,-

এই যে প্রেক্ষাপট, এরই নিরিখে বুঝতে হবে ইসলামের পৃথকীকরণের শিক্ষাকে। এটা কোন পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য করা হয়নি; বরং তা করা হয়েছে গৃহে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার জন্যে; স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অধিকতর আস্থা গড়ে তোলার জন্যে; মানবীয় মৌলিক কামনা-বাসনা মিতাচারী করার জন্যে; সেগুলোকে সংহত, নিয়মিত ও সুশৃংখল করার জন্যে; যাতে করে সেগুলিকে সামাজের মধ্যে শক্তিশালী দানবরূপে ছেড়ে না দিয়ে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত রাখা যায়, এবং তা ঠিক সেভাবেই যেভাবে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ সদা কাজ করে চলে প্রকৃতির মধ্যে।

পৃথকীকরণকে সম্পূর্ণরূপে ভুল বোঝা হয়েছে। মনে করা হয়েছে, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নারী সম্প্রদায়ের উপরে এক প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যার ফলে, তারা মানবীয় কার্যাদিতে ইচ্ছামত অংশ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু, এই ধারণা ঠিক নয়।

পৃথকীকরণের ইসলামী ধারণাকে বুঝতে হলে তা বুঝতে হবে নারীদের সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষার্থে এবং সমাজে নারীদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রেক্ষাপটে, যার মাধ্যমে ঐ সব উদ্দেশ্য লংঘনের আশংকা তিরোহিত হয়।

নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে এবং নরনারীর মধ্যে চুপিসারে সংঘটিত সব (অশ্লীল) ক্রিয়াকলাপকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। নারী পুরুষ উভয়কে শুধু পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতেই বারণ করা হয়নি, অধিকন্তু সকল প্রকারের দৈহিক সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে, যাতে করে, অদম্য তাড়নার উদ্রেক ঘটতে না পারে। নারীদের কাছে এটাই তো প্রত্যাশিত যে, তারা শালীন ও সম্ভ্রমশীল পোষাক পরিধান করবে। তাদেরকে এই উপদেশও দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে, যার দরুন রাস্তার লোকেরা তাদের উপরে কুদৃষ্টি দিতে পারে। কস্‌মেটিক্‌স্ লাগাতে বা অলংকারাদি পরতে বারণ করা হয়নি; বরং যা করতে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, ওর দ্বারা যেন পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা না হয়।

আমরা খুব ভাল করেই বুঝি যে, সারা দুনিয়ার সমাজগুলোর বর্তমান মন-মানসিকতায় এই শিক্ষাকে বেশ কঠোর, সীমাবদ্ধ এবং বিবর্ণ বা আকর্ষণহীন বলে মনে হবে। কিন্তু গোটা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলেই যে কেউ বলবেন যে, ঐ অভিমতটা হঠকারী এবং ভাসাভাসা। সুতরাং, এই শিক্ষাকে বুঝতে হবে গোটা ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপেই।

ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় নারীরা যে ভূমিকা পালন করে, তা যেমন কোন হেরেমের উপপত্নীদের মত নয়, তেমনি তা এমন কোন গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দীত্বও নয়, যে গৃহে তাদের প্রগতি বাধাগ্রস্ত এবং যেখানে তারা জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত। তবে, ইসলামী সমাজব্যবস্থার যে কুৎসিৎ চিত্র অংকিত হয়েছে, তার জন্য দায়ী ইসলামের ভেতরের এবং বাইরের দুষমনরাই, এবং সেই সঙ্গে এমন সব পণ্ডিতেরাও যারা ইসলামী জীবন-পদ্ধতিকে বুঝতে সম্পূর্ণ ভুল করেছেন।

একমাত্র বিষয় যা ইসলাম কখনই সমর্থন করবে না, তা হচ্ছে নারীদেরকে খেলার পুতুলে পর্যবসিত করা, তাদেরকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা অথবা পুরুষদের ইচ্ছা

অভিরুচির কৃপার উপরে ছেড়ে দেওয়া। নারীদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণের কোন অবকাশ নেই ইসলামে।

এটা নারীদের প্রতি স্রেফ একটা নিষ্ঠুরতা হবে যে, সমাজে সামগ্রিকভাবে চাহিদা বেড়ে চলেছে বিধায় নারীদের তা পূরণের জন্য সর্বদা তাদের চাউনী, চেহারা, পোশাক-আশাক ও রূপচর্চার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। নারী-সৌন্দর্য তো প্রদর্শিত হচ্ছেই। এমনকি, কোন খাদ্যদ্রব্য বা কোন দৈনন্দিন সামগ্রী যেমন সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি বিক্রীর বিজ্ঞাপনেও নারী মডেল না হলে চলে না। কৃত্রিম স্টাইল বা কেরদানী করা ও ব্যয়বহুল জীবন পদ্ধতিকে প্রয়োজনীয় করে তোলা হয়েছে তার স্বপ্ন পূরণের জন্য। কিন্তু, এ ধরনের সমাজ কখনই ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে না, এবং তা কখনও মিতাচারী ও সুস্থ থাকতে পারে না।

ইসলামের মতে, নারীকে অবশ্যই যথেচ্ছ ব্যবহার করা এবং ভোগের সামগ্রীরূপে ভূমিকা পালন করা থেকে মুক্ত করতে হবে। তাদের হাতে অবশ্যই এমন যথেষ্ট সময় থাকতে হবে যাতে তারা তাদের গৃহের প্রতি যে দায়িত্ব এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি যে দায়িত্ব তা পালন করতে পারে।

নারীর সম-অধিকার

আপনারা নারী মুক্তি আন্দোলন এবং নারীর অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে বহু কথা শুনে থাকবেন। এ ব্যাপারে ইসলাম একটা ব্যাপক মৌলিক নীতির কথা বলে যার মধ্যে সব কিছুই আছেঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ
وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

".. এবং ন্যায় সঙ্গতভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য (পুরুষদের উপর) আছে, যেরূপে কতক অধিকার (পুরুষদের জন্য) নারীদের উপর আছে।' (অর্থাৎ নারীদেরও ঠিক পুরুষদের উপর সমান অধিকার আছে, যেমন আছে পুরুষদের অধিকার নারীদের উপর। সুতরাং, মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে নারীও পুরুষের মধ্যে না আছে কোন প্রকারের কোনও অসমতা, না কোনও তারতম্য।) *কিন্তু নারীদের উপর (এক প্রকার) প্রাধান্য আছে পুরুষদের। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"(২ঃ২২৯)*

কোরআন করীমের অন্য একটি আয়াতের একাংশে বলা আছেঃ

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

'পুরুষদেরকে স্ত্রীলোকদের উপর অভিভাবক (করা হয়েছে) কেননা আল্লাহ্ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব (প্রাধান্য) দিয়েছেন এই কারণে যে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে (নারীদের জন্য) খরচ করে'। (সূরা নিসা-৪ঃ৩৫)

আরবী 'কাউয়ামুনা' (অভিভাবকরা-যারা তাদের পোষ্যদেরকে সঠিক পথে চালাবার জন্য দায়ী) শব্দটি থেকে অনেক আলেম (মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন) নারীর উপরে পুরুষের নিরংকুশ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চান। অথচ, আয়াতটিতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, পোষ্যদের উপরে উপার্জনকারীদের একটা প্রাধান্য রয়েছে। সুতরাং পোষ্যরা যাতে সঠিক পথে চলে সেজন্য নৈতিক চাপ সৃষ্টি করবার একটা বাড়তি সুবিধা বা এখতিয়ার রয়েছে অভিভাবকদের।

মৌলিক মানবাধিকারের প্রশ্নে এখানে কোনভাবেই একথা বলা হয়নি যে, নারীদের অধিকার সমান নয়, কিংবা নারীদের উপরে পুরুষদের সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আয়াতের শেষাংশে উপরে উল্লেখিত এখতিয়ারের কথাই বলা হয়েছে এবং পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষদের এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, নারীদের মৌলিক অধিকার ঠিক পুরুষদেরই সমান সমান। আরবী 'ওয়া' অক্ষরের তর্জমা হবে এখানে, 'এই কারণে' অথবা 'যখন'-'যতক্ষণ পর্যন্ত' এবং এটাই এখানে নির্ভুল তর্জমা।

একাধিক বিবাহ

পশ্চিমা দেশগুলোতে এটা একটা সাধারণ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামের এই বিষয়টি (পুরুষ কর্তৃক একইসঙ্গে একাধিক বিবাহ) সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে গেলেই তাকে যে প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে হয়, তা হচ্ছেঃ ইসলাম কি কোন পুরুষকে চার বার বিয়ে করবার এবং একইসঙ্গে চার জন স্ত্রী রাখবার অনুমতি দেয়? পাশ্চাত্য জগতের বহু জনসভায় এবং আমন্ত্রিত বুদ্ধিজীবীদের বহু বিশিষ্ট সম্মেলনে বক্তৃতা করার ব্যাপক অভিজ্ঞতা আমার আছে। কোথাও কখনও এই প্রশ্নটি তোলা হয়নি, এমন ঘটনা আমার মনে পড়ে না।

প্রায় ক্ষেত্রে কোন না কোন মহিলা দাঁড়িয়ে পড়েন এবং , অবশ্যই, ক্ষমা চেয়ে নিয়ে, সরল মনেই প্রশ্ন করেন যে, ইসলাম চারজন স্ত্রী রাখবার অনুমতি দেয় কি না। উত্তর তো, এমনিতেই, সবারই জানা। তবে, ইসলামের এই বিষয়টাই পাশ্চাত্য দুনিয়ায়

'সম্ভবতঃ' সব চাইতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত। আর একটা বহুল প্রচারিত বিষয় হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ, যদিও এর সঙ্গে ইসলামের কোন সংশ্রবই নেই। (দ্রেঃ 'Murder in the Name of Allah' by the Speaker) ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে কী সমানাধিকার দেয়, যখন তা একজন পুরুষকে চারজন স্ত্রী রাখবার এবং একজন নারীকে মাত্র একজন স্বামী রাখবার অনুমতি দেয়? এই প্রশ্নটিও পূর্বোক্ত প্রশ্নটির একটা ভিন্নরূপ যা কিনা, আমার বিশ্বাস, কাজে লাগান হয় শুধু ইসলাম সম্পর্কিত ভাল ধারণাকে নস্যাৎ করার একটা অজুহাতরূপে, এবং যা হয়তো অনেক প্রশ্নকর্তা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই করেন। স্বল্প আনুষ্ঠানিক বৈঠকগুলোতে, যেখানে ভদ্রতা বা শিষ্টাচার তেমন একটা মেনে চলা হয় না, সেখানে প্রশ্নটা মাত্র সাধারণ আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে না, ঠাট্টা-বিদ্রূপেরও রূপ নেয়।

কয়েক যুগ আগের কথা, তখন আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সোস '(SOAS= School of Oriental and African Studies)-এর ছাত্র ছিলাম। একজন পাকিস্তানী ছাত্রকে তার সহপাঠী এক ইংরেজ ছাত্র প্রায়শঃ ঐ প্রশ্নটা তুলে জ্বালাতন করতো, এবং এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো। একদিন, আমার মনে আছে, পাকিস্তানী ছাত্রটি, সম্ভবতঃ, তার উপরে বেশী চাপ সৃষ্টি করার দরুন, সহসাই ইংরেজ ছাত্রটিকে প্রশ্ন করে বসলোঃ আচ্ছা, তোমরা তো আমাদের চার স্ত্রী রাখার ব্যাপারে আপত্তি তোল, কিন্তু তোমরা তো তোমাদের চার পিতা রাখার ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন তোল না? (পাকিস্তানী ছাত্রটি ইংরেজি Forefather শব্দটিকে Four Father রূপে ব্যবহার করেছিল) 'চার' (Four = Fore) শব্দটির উপরে সে এমনভাবে জোর দিয়ে কৌতুক সহকারে উচ্চারণ করেছিল যে, ইংরেজ ছাত্রটি থতমত খেয়ে গিয়েছিল এবং ব্যাপারটা সাংঘাতিকভাবে পাল্টে গিয়েছিল। দৃশতঃ, ব্যাপারটা ছিল একটা মস্করা মাত্র। কিন্তু আপনি যদি এটাকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, এর মধ্যে মস্করার চাইতে বেশী আরও কিছু ছিল। কেননা, এর মধ্য দিয়ে সমাজে বিরাজমান একটা দুঃখবহ পরিস্থিতির দিকে ইংগিত করা হয়েছিল। এবং এর মধ্য দিয়ে ইসলামী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আধুনিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা করারও একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্যাপারটা শুধু চিন্তা-ভাবনামুক্ত ছাত্রদেরই খোশগল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটাকে এমনকি, সমাজের চিন্তাশীল ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিরাও বিদ্রূপের সঙ্গেই নাকচ করে দেওয়াটাকে কোন কঠোর বা অভদ্রজনোচিত ব্যবহার বলে মনে করেন না।

খুব বেশী দিনের কথা নয়, আমি ফ্রাঙ্কফোর্টের একজন বিচারকের কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছিলাম। আমি সেই জজ সাহেবকে জানতাম একজন খুব বিজ্ঞ,

তোমরা তাদেরকে তাদের দেন-মোহর দিয়ে দাও বিয়ের উদ্দেশ্যে, অবৈধ কামনা চরিতার্থে নয়, এবং গোপন প্রণয়িনীরূপেও নয়.....'।(আল্ মায়েদা-৫ঃ৬)

একইসঙ্গে, কোরআন মজীদ কৌমার্য অবলম্বনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এটাকে একটা মানব-সৃষ্ট প্রথা বলে ঘোষণা দিয়েছে (৫৭ঃ২৮)। কাউকে একলা বাকী দুনিয়াটা থেকে আলাদা রুদ্ধ করে রেখে তো কোন লাভ নেই, অথবা প্রাকৃতিক কামনা-বাসনাসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার মাধ্যমে কাউকে শাস্তি দান করেও লাভ নেই। ইসলামে বিবাহ-প্রথা দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। আমার হাতে এখন এত সময় নেই যে, আমি বিয়েতে বর ও কনে নির্বাচনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করি, বা তালাক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত আইনকানুন ও সমাধান নিয়ে কথা বলি।

'একাধিক বিবাহ'-এর কথাতেই ফিরে আসা যাক। কোরআন করীম পাঠে জানা যায় যে, যুদ্ধোত্তরকালীন বিশেষ পরিস্থিতির আলোকেই বিষয়টা আলোচিত হয়েছে। যুদ্ধের পরে দেখা যায় যে, সমাজে একটা বিরাট সংখ্যক ছেলেমেয়ে এতীম হয়ে গেছে, বহু যুবতী নারী বিধবা হয়ে গেছে, এবং নারী ও পুরুষের সংখ্যাসাম্যে সমতা দারুণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর জার্মানীতে এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলাম যেহেতু জার্মানীর কোন প্রধান ধর্ম নয়, সেহেতু জার্মানী এই সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারেনি। খৃষ্টধর্মের এক-বিবাহ প্রথার কঠোর শিক্ষা এর কোন সমাধান দিতে পারে না, পারেনি। সুতরাং জার্মানীকে সেদিন যুদ্ধের পরিণতিতে সামাজিক ভারসাম্যহীনতায় নিদারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। সেখানে তখন, এত বিরাট সংখ্যক বয়স্ক অবিবাহিতা নারী এবং যুবতী-বিধবা ছিল যে, তাদের বিয়ে শাদীর কোন ব্যবস্থাই করা সম্ভব হয়নি। বিশাল ইউরোপ মহাদেশে শুধু জার্মানীই যে একমাত্র এই বিরাট ও চরম বিপজ্জনক সামাজিক সমস্যাদির শিকারে পরিণত হয়েছিল, তা নয়। গোটা পাশ্চাত্য সমাজের জন্যই তখন এই সমস্যাটা এত বিশাল একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তার মোকাবেলা করাই সম্ভব ছিল না। পরিণামে, নৈতিক অধঃপতন এবং নরনারীর অবাধ মেলামেশার জোয়ারকে থামানো যায়নি, প্রতিহত করা যায় নি। যার দরুন, তা স্বাভাবিক কারণেই বিরাজমান ভারসাম্যহীনতাকে উত্তাল বেগে বৃদ্ধি করেছে, তার বিস্তার ঘটিয়েছে।

যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি সহজেই দেখতে পাবেন যে, এই সকল সমস্যা-সংকুল অবস্থার একমাত্র সমাধান হচ্ছে পুরুষকে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দান করা। এটা এজন্য বলা হচ্ছে না যে, এতে করে তাদের জৈবিক তাড়না মিটবে, বরং এটা এজন্যই বলা হচ্ছে যে, এতে করে বিপুল সংখ্যক স্ত্রীলোকের মৌলিক চাহিদাগুলোকে মেটানো সম্ভব হবে। এটাই যৌক্তিক এবং এটাই বাস্তব সমাধান। এই সমাধানকে যদি

প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে সমাজের জন্য যে একমাত্র বিকল্প থাকবে তা হচ্ছে, একটা অপরাধক্লিষ্ট, বাঁধনহারা সমাজের অতলে দ্রুত নিপতিত হওয়া। হায়! এটাই বুঝি আজ বেছে নিয়েছে পাশ্চাত্য জগৎ! আপনি যদি এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গীকে অধিকতর বাস্তবতার নিরিখে এবং আবেগমুক্ত মন নিয়ে আবারও পরীক্ষা করে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, প্রশ্নটা আসলে নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে দায়িত্বশীলতা এবং দায়িত্বহীনতার মধ্যে যে কোন একটাকে বাছাই করে নেওয়ার। ইসলাম পুরুষকে একই সঙ্গে একাধিক বিয়ে করবার অনুমতি দেয় শুধু এই শর্তে যে, পুরুষরা সেই কঠিন ও সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি সামলানোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে পূর্ণরূপে দায়িত্বাবলী পালনের মাধ্যমে, এবং তারা তাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমতা বজায় রেখে চলবে এবং তাদের প্রতি যথার্থ সুবিচার করবেঃ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟
مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟
فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ۝

"যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়-বিচার করতে পারবে না, তাহলে তোমরা (অন্য) নারীদের মধ্য থেকে (যারা এতীম নয়) তোমাদের পসন্দমত দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিয়ে কর, তবে তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা ন্যায়-বিচার করতে পারবে না (এবং সমান সুবিচার করতে পারবে না), তাহলে (মাত্র) একজনকে অথবা তোমাদের ডানহাতের অধিকারভুক্তগণকে বিয়ে কর। এটাই নিকটবর্তী (উত্তম ব্যবস্থা) যাতে তোমরা অবিচার না কর"। (সুরা আন্ নিসা-৪ঃ৪)

এর বিকল্প যা, তার চেহারা অনেক বেশী কুৎসিৎ না হয়েই পারে না। একটা সমাজে যদি অধিক সংখ্যায় অবিবাহিতা নারী থাকে, তাহলে তো তাদেরকে পরপুরুষ আকৃষ্ট বা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করার জন্য দোষ দেয়া যাবে না, বিশেষতঃ সেই সমাজটা যদি ধর্মকর্ম পালনে তেমন নিষ্ঠাবান না হয়। আর যাই হোক নারীরাও তো মানুষ। তাদেরও তো আবেগ-অনুভূতি আছে, আছে অতৃপ্ত কামনা-বাসনা। যুদ্ধজনিত মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের কারণে যখন মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে একজন সঙ্গীর জন্যে, যখন বিয়ে শাদীর বা ঘর বাঁধবার কোন নিশ্চয়তা থাকে না, যখন কোন জীবন-সাথী থাকে

না, সন্তানদের কোন আশা-ভরসা থাকে না, তখন তো সেই জীবন শূন্যতায় ভরে ওঠে; তখন তো সেই জীবনে ভবিষ্যতের আকাশ খাঁ খাঁ করতে থাকে, এবং তা ধূসর ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় নারীকে যদি বৈধ উপায়ে জায়গা করে দেওয়া না হয় এবং তাকে আপসে আদান-প্রদানের নীতির ভিত্তিতে খাপ খাইয়ে নেওয়া না হয়, তাহলে তো সমাজে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে বাধ্য। নারীরা তখন যে করেই হোক অবৈধ উপায়ে অন্যান্য স্বামীদের উপরে ভাগ বসাবে। এবং তার পরিণতি ন্যাক্কারজনক না হয়ে যায় না। আনুগত্য বিভক্ত হয়ে পড়বে। সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা নষ্ট হয়ে যাবে। ঘরের শান্তির ভিত্তিতে ফাটল ধরবে। অবিশ্বস্ত স্বামীরা মনে অপরাধবোধ নিয়ে বসবাস করতে থাকবে, ফলে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা আরও বেশী করে অপরাধ করার প্রতি ধাবিত হবে। এই অবস্থার প্রধান শিকারে পরিণত হবে আনুগত্যের মহৎ আদর্শ। রোমান্স তার বিমল আনন্দ হারাবে এবং তা ইতরামির স্তরে নেমে যাবে এবং ক্ষণিকের মোহে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

যারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমানাধিকারের কথা বলেন, তাঁরা ভুলে যান যে, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে নারী পুরুষের কার্যাবলী ভিন্ন এবং সেজন্য তাদের দৈহিক গঠনও ভিন্ন। কাজেই , এই ভিন্নতার কারণে সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকারের প্রশ্নটা অবাস্তব।

নারীরাই পারে শুধু সন্তানের জন্ম দিতে। তারাই কেবল ন' মাসের অধিককাল ধরে ভবিষ্যতের মানব-প্রজন্মের বীজের পরিচর্যা করতে পারে। নারীরাই তাদের বাচ্চাদেরকে, অন্ততঃ বাচ্চাদের শৈশবকালে, লালন পালন করতে পারে, যা কিনা পুরুষেরা পারে না। সন্তানের সঙ্গে দীর্ঘদিনে রক্ত সম্পর্কের কারণে সন্তানের উপর পুরুষের চাইতে নারীর মনস্তাত্ত্বিক বন্ধন ও প্রভাব অধিকরতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। নারী ও পুরুষের দৈহিক গঠন সংক্রান্ত এই পার্থক্যকে যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপেক্ষা করা হয়, এবং তদনুযায়ী সমাজে উভয়ের ভূমিকার পার্থক্যকেও উপেক্ষা করা হয়, তাহলে সেই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সমাজে সুস্থ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ না হয়ে যায় না। প্রধানতঃ, নারী ও পুরুষের মধ্যেকার এই গঠন সংক্রান্ত পার্থক্যের কারণেই ইসলাম উভয়ের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ভূমিকা পালনের কথা বলে।

নারীদেরকে, অবশ্যই, পরিবারের জন্য উপার্জনের দায়িত্ব থেকে, যথাসম্ভব, মুক্ত রাখতে হবে। এই দায়িত্ব তো নীতিগতভাবে পুরুষদের উপরেই বর্তায়। তবু, নারীদেরকেই বা কেন সংসারের আর্থিক বোঝা টানার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে বাধা দেওয়া হবে। চাইলে তারাও তা করতে পারবে। তবে, সেজন্য তারা তাদের সন্তান-জন্ম দেওয়া এবং পরিবারের সেবা-যত্ন করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়িত্বাবলী

পালনে অবহেলা করতে পারবে না। কেননা, এগুলোই হচ্ছে নারীদের প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব। এগুলোই আগে পালন করতে হবে এবং এটাই হচ্ছে ইসলামের কথা।

তাছাড়া, নারীদের গঠন তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও হাল্কা। তবু, বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ্ তাদের দেহে বরদাস্ত করার অধিকতর ক্ষমতা দান করেছেন। এই ক্ষমতার পিছনে কারণ হচ্ছে, তাদের জীবকোষে (Cell) একটা অতিরিক্ত অর্ধ-ক্রোমা জোমের (Half-Chromosome) বিদ্যমানতা, যার দরুন নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। স্পষ্টতঃই, এই ক্ষমতা তাদেরকে দান করা হয়েছে সেই অতিরিক্ত বোঝা বহনের জন্য, যা চাপানো হয় তাদের উপরে তাদের গর্ভধারণ, সন্তান-প্রসব এবং স্তন্য-দানকালীন সময়ে। অবশ্য, এই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু, নারীকে বাহ্যতঃ অধিকতর মজবুত ও শক্তিশালী দেখায় না। তাদেরকে শুধু শুধু সমানাধিকারের নামে বা অন্য কোন নামে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কঠিন সব দৈহিক কাজে নিয়োজিত করা ঠিক হবে না। তাদের প্রতি অধিকতর নমনীয় হতে হবে, দয়া-মায়া প্রদর্শন করতে হবে। ঘরের দৈনন্দিন কাজে নারীদের উপরে হাল্কা বোঝা চাপাতে হবে, এবং বাইরেও তাদের উপরে জোর করে পুরুষের সমান বোঝা চাপানো যাবে না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেছে যে, একটা গৃহের অভ্যন্তরীণ পরিচালনাকে যদি দায়িত্বপালনের একটা বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এবং তা যদি কোন নারী, অথবা কোন পুরুষের উপরে বর্তানো হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, পুরুষের চাইতে নারী তা পালন করছে অনেক বেশী দক্ষতার সঙ্গে। একই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের লালনের যে দায়িত্ব নারীদের উপর তাও প্রকৃতিদত্ত। এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও পুরুষেরা সামান্যই অংশ নিতে পারে।।

নারীদেরকে পুরুষদের চাইতে অধিক অধিকার আসলে দিতে হবে ঘরে থাকবার জন্য। যদি, একই সময়ে, তাদেরকে তাদের জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব পালনেও ব্যাপৃত থাকতেই হয়, তাহলে তারা যে সময়টুকু হাতে পাবে , তা তাদের নিজেদের জন্য বা গোটা সমাজের জন্য কাজে লাগাতে হবে। এথেকেই এসেছে সেই কনসেপ্ট বা ধারণাঃ 'নারীর স্থান ঘরে।'। অবশ্য এমনও কোন কথা নেই যে, তারা তাদের বোরকা বা এপ্রোনের ভেতরেই আটকে থাকবে, কিংবা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকবে। ইসলাম কোন ক্ষেত্রেই নারীর অধিকার খর্ব করে না। তারা তাদের অবসর মুহূর্তে অবশ্যই বাইরে যাবে তাদের কোন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য, কিংবা তাদের পসন্দমত কোন সুস্থ কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের জন্য। তবে, শর্ত এই যে, তারা যেন এমন কিছু না করে যাতে ভবিষ্যৎ মানব-প্রজন্মের স্বার্থ ও অধিকার বিপদের সম্মুখীন হয়, যে স্বার্থ ও অধিকার আমানত স্বরূপ ন্যস্ত করা আছে তাদেরই স্কন্ধে। আর সব কারণের

মধ্যে এটাও একটা কারণ, যেজন্য ইসলাম অতি-সামাজিকীকরণ বা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। কেননা, ইসলামের কথা হচ্ছেঃ "গৃহই নারীর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল" যা বর্তমান যামানার অধিকাংশ সমস্যার জন্যই অতি বিজ্ঞ ও বাস্তব সমাধান। নারীরা যখন তাদের কাজকর্মকে ঘরের বাইরে দূরে কোথাও সরিয়ে নেয়, তখন তা করতে হয় তাদের পারিবারিক জীবনের শান্তির বিনিময়ে, সন্তান পালনের দায়িত্বের বিনিময়ে।

'মা'-কে কেন্দ্র করে তাঁর চার ধারে আবর্তিত হয়ে যে পারিবারিক জীবন গড়ে ওঠে, তার জন্য প্রয়োজন অন্যান্য রক্ত-সম্পর্ককেও জোরদার করা এবং আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যথার্থ নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। পরিবারের ইউনিটগুলো আলাদা আলাদাভাবে বাস করলেও, একটা বৃহত্তর পরিবারের এই ধারণাকে ইসলাম যে সমস্ত কারণে সমর্থন করে এবং উদ্বুদ্ধ করে, তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ

১) বৃহত্তর পরিবার সমাজের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হওয়াকে প্রতিরোধ করে;

২) যদি একটা পরিবারের মধ্যেকার ভাই-বোন, পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র ইত্যাদি সম্পর্কের মধ্যে অটুট ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার বন্ধন সৃষ্টি করা যায়, তাহলে এর মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই একটা পরিবারের সামগ্রিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে এবং তা রক্ষা পাবে। এই স্বাভাবিক বন্ধন সত্যিকারের সমন্বয় ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে আরও বেশী মজবুত হবে অন্যান্য আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমে; যেমন, চাচা-চাচী, ফুপু-ফুপা, মামা-মামী, খালা-খালু, ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নি, চাচাতো-মামাতো-খালাতো-ফুপাতো ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নাতি-পুতি ইত্যাদি বন্ধনের মাধ্যমে। 'আমার নিজের'- এই বোধ ও সচেতনতা থেকে উদ্ভূত যে উষ্ণ সম্পর্ক এবং নির্মল আনন্দ তার অন্বেষণের নতুন নতুন রাস্তা তখন খুলে যাবে এই বৃহত্তর পারিবারিক পদ্ধতির স্বার্থে।

৩) এই অবস্থায় পরিবারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে পড়ার আশঙ্কা কমে যাবে। এক-পরিবার নামে একই ছাদের নীচে বসবাস করাটা আজকাল যেমন দেখা যায় অর্থহীন হয়ে পড়েছে, তেমনটা আর থাকবে না। পরিবারের সদস্যগণ পরিবারের কেন্দ্রীয় আলোকবর্তিকাস্বরূপ মুরব্বীদের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকবে। প্রায় সব পরিবারের কর্মকাণ্ড এই অক্ষের (Axis) চারিধারে আবর্তিত হতে থাকবে। কোন নিঃসঙ্গ, ভুলে যাওয়া, কোন প্রত্যাখ্যাত বা অবহেলিত ব্যক্তি তখন সামাজিক ব্যবস্থার চিলে-কোঠায় বা মেঝের তলার ঘরে পড়ে থাকবে না, অথবা পরিবার থেকে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মত বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে না।

এটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে, ইসলামি ধারণা বা কন্‌সেপ্ট গৃহ ও পরিবার সম্পর্কে, যা কিনা সমাজের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ইউনিট হিসেবে পরিগণিত। দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের জন্যই, প্রধানতঃ, আজ আমরা পৃথিবীর আধুনিক সমাজগুলোতে এমন বহু ঘটনা দেখতে পাচ্ছি যে, পরিত্যক্ত, বৃদ্ধ, অথবা অকর্মণ্য পিতামাতাকে পরিবারের বোঝা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

বয়স্কদের সেবা-যত্ন

বয়স্কদের সেবা-যত্নের দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের উপরে চলে যাচ্ছে। বয়স্কদের সেবা-যত্ন জাতীয় অর্থনীতির উপরে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু, এক্ষেত্রে রাষ্ট্র যত বেশী খরচই করুক না কেন তা তাদের জন্য শান্তি ও তৃপ্তি বয়ে আনতে পারবে না। প্রত্যাখ্যাত বা পরিত্যক্ত হওয়া অথবা ফেলে দেওয়া মানুষের মর্মান্তিক অনুভূতি এবং গভীর বেদনাদায়ক উপলব্ধি এবং অন্তরে ক্রমবর্ধমান নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতা ইত্যাদি, এমন সব সমস্যা যা পুরণ করাই সম্ভব নয়। কোন পরিবার তাদের কোন দূর আত্মীয়ের দেখাশোনা করবে, এমন কথা ইদানীং কল্পনাও করা যায় না।

আধুনিক সব সমাজে, সময় যতই অতিবাহিত হচ্ছে ততই, বয়স্কদের জন্য 'হোম' বা গৃহের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু, রাষ্ট্রের পক্ষে সব সময় প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি, সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য নিম্নতম প্রয়োজনও মেটানো যাচ্ছে না। দৈহিক রোগ-ব্যাধি তো নিরাময় করা যায়, কিন্তু গভীর মনস্তাত্ত্বিক আঘাত-উদ্বেগ, যার দরুন আধুনিক সমাজগুলোতে বেশ একটা বড় সংখ্যায় লোকেরা ভুগছে, তার চিকিৎসা করা অনেক দুরূহ ব্যাপার।

মুসলিম-প্রধান দেশগুলোতে মূল্যবোধের অবক্ষয় যতই ঘটুক না কেন, তেমন অবস্থা চিন্তাও করা যায় না, যা বাদবাকী সমসাময়িক সমাজগুলোতে বিরাজ করছে। এসব দেশে বৃদ্ধ বা বয়স্কদেরকে শ্রদ্ধাহীন বা নির্দয়ভাবে দেখাশোনা করাটাকে মনে করা হয় অমর্যাদাকর ও অসম্মানজনক। নিজেদের বয়স্ক আত্মীয়-স্বজনদেরকে রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়াটা, রাষ্ট্র তাদের সেবা-যত্নের দায়িত্ব সেচ্ছায় গ্রহণ করলেও, বহু মুসলমানের কাছে একটা লজ্জার ব্যাপার।

কাজেই, গৃহের এবং পরিবারের মধ্যে একজন মুসলিম নারীর যে ভূমিকা তা, তার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলেও, শেষ হয়ে যায় না। সে যেমন গভীর বন্ধনে আটকা থাকে ভবিষ্যতের সঙ্গে, তেমনি আটকা থাকে সে অতীতের সঙ্গেও। এটা তার সেই দয়া, তার মানবিক বোধ, এবং যাদের সেবা-যত্নের দরকার তাদের দেখাশোনা করবার

সেই সহজাত ক্ষমতা, যা প্রয়োজনে সমাজের বয়স্কদের উদ্ধারের জন্য তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা তখন আগের মতই কদর পায়, শ্রদ্ধাস্পদ থাকে, এবং পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই থাকে। 'মা' তাদের দেখাশোনার ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা পালন করেন। তাদেরকে সঙ্গ দান করেন চাকরানীরূপে লাচার হয়ে নয়, বরং মানবীয় সম্পর্কের প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক আগ্রহ-অনুভূতি নিয়ে। ফলে, তিনিও নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, তিনি নিজে যখন বৃদ্ধা হবেন, তখন এই সমাজ তাকে উৎখাত করে দেবে না বা একটা পুরাতন বস্তু মনে করে ফেলে দিবে না।

অবশ্য, প্রত্যেক সমাজেই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম আছে, এবং এমন কিছু মুসলিম পরিবারও আছে সেগুলোতে অতীতের পুরোনো অবশিষ্টাংশ সব কিছুকেই বিরক্তিকর বোঝাস্বরূপ মনে করা হয়, বিশেষতঃ যে পরিবারগুলো তথাকথিত আধুনিক প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত। তবে, সামগ্রিকভাবে, মুসলিম সমাজগুলোতে অন্য সব সমাজের মত পরিত্যক্ত পিতামাতার জন্য ' হোম' বা গৃহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তেমন একটা দেখা দেয়নি।

এ প্রসঙ্গে, একটা মজার কথা আমার মনে পড়লো। কথাটা শুনে হয়তো অনেকেই হাসবেন, তবে অনেকের চোখে পানিও আসতে পারে। একটা বাচ্চা ছেলে তার দাদার প্রতি তার পিতার দুর্ব্যবহার দেখে দেখে মনে মনে খুব দুঃখ ও অস্বস্তি বোধ করতো। সে প্রথমে একবার দেখলো যে, তার পিতা তার দাদাকে একটা ভাল আরামদায়ক কক্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা কম আরামদায়ক কামরায় থাকতে দিল। এবং এমনিভাবে, একটার পর একটা কামরা বদলাতে বদলাতে অবশেষে তার দাদাকে চাকর-বাকরদের ঘরে একটা জায়গা করে দিল। একবার প্রচণ্ড শীতের মৌসুমে তার দাদা তার কষ্ট ও অসুবিধার কথা জানিয়ে বল্লো যে, এই কামরাটা তো ভীষণ ঠাণ্ডা। তাছাড়া, তার কাছে তো তেমন লেপ-কাঁথাও নেই, সে থাকবে কী করে। এতে, ছেলেটির পিতা পুরান ছেঁড়া-ফাড়া কাপড়ের একটা বোচকা খুলে খুঁজতে লাগল, কোন কম্বল-টম্বল পাওয়া যায় কিনা। অবস্থাটা দেখে ছেলেটি তার বাবার কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে বললো, 'বাবা গো! সব ছেঁড়া-ছুটা কাপড়গুলোই দাদাকে দিওনা কিন্তু, আমার জন্যে কিছু রেখে দিও, নইলে আমি আবার তোমাকে দিব কি, যখন তুমি বুড়ো হবে!

বলাই বহুল্য, বাচ্চাটার অসন্তোষের এই নির্দোষ প্রকাশের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে বর্তমান যামানার বয়োবৃদ্ধ প্রজন্মের দুঃসহ দুঃখ আর মর্মবেদনা।

মুসলিম সমাজগুলোতে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে তাকে ব্যতিক্রমই বলতে হবে। ঠিক তেমনি ব্যতিক্রমী বা অতি বিরল ব্যতিক্রমী ঘটনা হবে, যদি আধুনিক সমাজগুলোর কেউ বা কোন আত্মীয়-স্বজন কোন বয়স্ক ব্যক্তির সেবা-যত্ন করে।

মুসলমানকে শেখানো হয়েছেঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَٱخْفِضْ
لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى
صَغِيرًا ۝

"এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাকিদপূর্ণ এই আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো এবাদত করবে না এবং পিতা মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন বা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের উভয়কেই তুমি 'উফ্' পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক ও মমতাপূর্ণ কথা বলবে। তুমি মমতার সাথে তাদের উপর বিনয়ের বাহু অবনত রাখবে এবং বলবে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক তুমি তাঁদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম করো, যেভাবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন (আমার) ছোট বেলায়।" (বনী ইসরাঈল-১৭ঃ২৪-২৫)

এই আয়াত দু'টি আলোচ্য বিষয়ের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্তা'লার একত্বের পরে- আর সবকিছুর মধ্যে সর্বপ্রথম- তাদের ভালবাসা, স্নেহ-মমতা ও দয়ামায়া প্রকাশের মাধ্যমে-দৃষ্টি দেওয়া তাদের পিতামাতার প্রতি, যাঁরা বৃদ্ধ বয়সের কঠিন সময়ে উপনীত হয়েছেন।

অধিকন্তু, এই আয়াত দু'টিতে সেই পরিস্থিতিরও উল্লেখ করা হয়েছে যখন পিতামাতা উভয়ের বা তাদের একজনের আচরণ অত্যন্ত রূঢ় এবং কখনও কখনও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। তখন, এর প্রতিক্রিয়ায় যেন তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তির কোন সামান্যতম প্রকাশও কারো ঠোঁটে উচ্চারিত না হয়। বরং সে অবস্থায়ও যেন তাদের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন অক্ষুণ্ন থাকে।

দু'টি প্রজন্মের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্কের উপরে যে জোর দেওয়া হয়েছে তা ক্রমাগতভাবে এই নিশ্চয়তা দিয়ে চলেছে যে, কোনও প্রকার প্রজন্ম-ব্যবধান বা 'জেনারেশন-গ্যাপ' সৃষ্টি হবে না। কেননা, এই ধরনের জেনারেশন-গ্যাপ সব সময়েই পারস্পরিক ঐতিহ্যগত মুল্যবোধের আদান-প্রদানের গতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

সুতরাং, ইসলামের সামাজিক দর্শন এই শিক্ষা দেয় যে, কোন প্রজন্ম যেন তার ও তার পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি হতে না দেয়। প্রজন্ম-ব্যবধান বা জেনারেশন-গ্যাপের কোন স্থান নেই ইসলামে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী পরিবারের যে ধারণা তা শুধু একটি বাড়ীর সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিম্নোক্ত আয়াতেও মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন কেবল পিতামাতার জন্যই খরচ না করে, বরং তারা যেন নিকট আত্মীয়-স্বজনদের জন্যেও খরচ করে। অগ্রাধিকারের কারণে পিতামাতার পরে উল্লেখ করা হয়েছে এদের কথা। এবং তা করা হয়েছে এইজন্যে যে, এতে করে যেন পিতামাতার মর্যাদার হানি না হয় এবং পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ
إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ
ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ
وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن
كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

"এবং তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত করবে এবং তার সঙ্গে কোনও কিছুকে শরীক করবে না এবং সদয় ব্যবহার করবে পিতামাতার সাথে এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশীদের সাথে এবং সঙ্গী সহচর এবং পথচারীগণের সাথে এবং তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের সাথে। আল্লাহ্ তাদেরকে আদৌ ভালবাসেন না যারা অহংকারী (এবং) দাম্ভিক।" (আন্ নিসা – ৪ঃ৩৭)

পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে যে, তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণে মনোযোগী হতে হবে।

যদি সমসাময়িক সমাজগুলো এই সমস্ত নির্দেশাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে, বহু সমস্যা, যা আজ পরিদৃষ্ট হচ্ছে এবং যা উন্নত সমাজের জন্য কলংকস্বরূপ, তা সবই মিটে যাবে। বয়স্কদের জন্য কোন 'হোম' এর প্রয়োজন হবে না। কেবলমাত্র তাদের জন্য ছাড়া, যাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, দেখাশোনা করার মত কোনও নিকট-আত্মীয়

নেই। একটি ইসলামী সমাজে পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে ভালবাসার উপরে বারবার এত বেশী জোর দেওয়া হয়েছে যে, কোন সন্তানের পক্ষে তার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খাতিরে, তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পবিত্র কোরআন যেভাবে শিক্ষা দান করে তা এক কথায় অনন্য । এই গ্রন্থ শিক্ষা দেয় যে, তোমার এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চাইলে, যা একান্তভাবে জরুরী তা হচ্ছে, তোমার এবং তোমার স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্ক চমৎকার হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখিত একটি আয়াত (৪ঃ৩৫) যার মধ্যে অভিভাবকদের (কাউয়ামুন) কথা বলা হয়েছে তা স্বামীর স্কন্ধের উপরে একটা অত্যন্ত ভারী দায়িত্ব চাপিয়েছে। যদি তার স্বভাব-চরিত্র সুস্থ পারিবারিক জীবনের জন্য আদর্শ আবহাওয়া সৃষ্টির উপযোগী না হয়, তাহলে অভিভাবক (কাউয়াম) হিসেবে সে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবেই। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, 'কাউয়াম' -এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছেন, ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সাঃ) স্বয়ং। তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, না কঠোর ছিলেন, না একনায়ক মনোভাবাপন্ন ছিলেন, না কোনভাবেই উগ্র এবং অতিরিক্ত চাপ-সৃষ্টিকারী ছিলেন। পরিবারের সদস্যদেরকে সঠিক পথে সর্বদা পরিচালিত রাখাটা ছিল একটা বিরাট দায়িত্ব; কিন্তু তিনি যেভাবে তাঁর সেই দায়িত্ব পালন করে গেছেন তা জীবন্ত ও সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। এবং তা বিদ্যমান থাকবে আনাগত ভবিষ্যতের জন্যেও, এবং তাদের জন্যেও যারা 'কাউয়াম' কথাটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য জানতে চাইবে এবং বুঝতে চাইবে।

একটি বিখ্যাত হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ

"ঈমানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উত্তম মুমিন সেই-ই, যার আচরণ সর্বোত্তম; এবং তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবহারে সর্বোত্তম।" (তিরমিযী)

পিতামাতারা যদি সত্যিসত্যিই চায় যে, তাদের সন্তানেরা একটা ধর্মপ্রাণ সমাজের সদস্যরূপে গড়ে উঠুক, তাহলে তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক তাদের সন্তানদের চরিত্র গঠনে কিংবা ভাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পবিত্র কোরআন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ঃ

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ
مَرُّوا كِرَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

"এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, এবং যখন তারা বৃথা বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তখন সসম্মানে অতিক্রম করে। এবং যারা, তাদের প্রভুর আয়াতসমূহ যখন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখন তার প্রতি বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না; এবং যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।" (আল্ ফুরকান- ২৫ঃ৭৩-৭৫)

এই প্রার্থনার মধ্যে রয়েছে যেমন এক অনন্য আকর্ষণ, তেমনি এতে ভরপূর রয়েছে সুগভীর প্রজ্ঞা। এখানে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ উভয় পক্ষকেই এই শিক্ষাদান করা হয়েছে যে, তারা যেন একে অপরের জন্য প্রার্থনা করে এবং তাদের সন্তানদের জন্যেও প্রার্থনা করে, যাতে আল্লাহ্‌তা'লা সর্বদা তাদেরকে গভীর সন্তোষ এবং সুখ ও পরিতৃপ্তি দান করেন, একে অপরের দ্বারা এবং তাদের সন্তানদের দ্বারা, এবং তাদের সন্তানদেরকে যেন খোদা-ভীরু ও ধর্মপ্রাণ প্রজন্মের নেতা বা ইমাম বানান।

এই আয়াতের শিক্ষাকে কেউ যদি তার জীবনে রূপায়িত করে, তাহলে সে এর তাৎপর্য যথার্থরূপে অনুধাবন করতে পারবে। আপনি যদি কোন কিছুকে অস্পষ্টরূপে পেতে চান, তাহলে আপনার স্বভাবের উপরে তার যথার্থ প্রভাব না-ও পড়তে পারে; কিন্তু আপনি যদি তা একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করেন, তাহলে সেই প্রার্থনা আপনার স্বভাবের উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা বিশ্বস্ত হতে ইচ্ছুক, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের এই ইচ্ছা কচিৎ পূর্ণ হতে দেখা যায়। যারা আল্লাহ্‌তা'লার কাছে কায়মনে প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন তাদেরকে বিশ্বস্ত করেন, তারা তাদের প্রার্থনার দ্বারা সেই ব্যক্তিদের চাইতে অনেক বেশী

প্রভাবান্বিত হয়, যারা শুধু অস্পষ্টভাবেই কোন কিছুকে পেতে চায়। উন্নততর আচরণের জন্য প্রয়োজন সত্যিকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা। কেউ যদি অনুরূপ প্রার্থনা করার পরও তার স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে তার প্রার্থনার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করে, তাহলে বলতে হবে যে, সে প্রার্থনা করে যা, কাজ করে তার উল্টোটা।

কেবলমাত্র তরুণ প্রজন্মের জন্যে, তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে কোরআন করীমের উপদেশ হচ্ছেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ۝

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্যে সে অগ্রে কি প্রেরণ করেছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কাজই কর সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন।" (আল্ হাশর-৫৯ঃ ১৯)

পবিত্র কোরআন পিতামাতাদেরকে সর্তক করে দিয়েছে যে, যদি তারা তাদের সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, এবং পিছনে এমন একটা প্রজন্ম রেখে যায় যার আচরণ নিন্দার্হ, তাহলে পিতামাতাদেরকেই খোদার সামনে জবাবদিহি হতে হবে। আবারও, পিতামাতাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদের নিজ নিজ সন্তানদেরকে হত্যা না করে। এবং তা এই অর্থেও যে, পিতামাতা যেন সন্তানের চরিত্র ধ্বংস হওয়ার জন্য সহায়ক না হয়, সেজন্য দায়ী না হয়। (দ্রঃ আল্ আনআম- ৬ঃ ১৫২)

শুধু নিজ নিজ সন্তানদের সঙ্গেই নয়, সামগ্রিকভাবে গোটা তরুণ প্রজন্মের সঙ্গেই দয়া, ভালবাসা ও সম্মানের সহিত ব্যবহার করতে হবে। এ সম্পর্কে শক্তিশালী উপদেশ দিয়ে গেছেন হযরত রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহোতা'লা আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম)ঃ

اكرموا اولادكم

'সর্বদা সন্তানদের প্রতি সদয় থাকবে।' (ইবনে মাজাঃ কিতাবুল আদবঃ বিররুল ওয়ালাদ)

যে কেউ লক্ষ্য করতে পারেন যে, এটাই হচ্ছে সেই জিনিষ যার বড় প্রয়োজন আজকের দুনিয়াটার জন্য। হালে, বৃটেনে একটা জোর বিতর্ক চলছে, বিষয়বস্তুঃ

সন্তানের অপরাধের জন্য পিতামাতাকে, আইনের চোখে, প্রতিনিধিরূপে (vicariously) দায়ী সাব্যস্ত করার জন্য কোন আইন পাশ করা যায় কিনা, এবং অভিযুক্তরূপে কিশোর আদালতে তাদেরও বিচার করা যায় কিনা। এটা এখন গভীরভাবে অনুভব করা হচ্ছে যে, পিতামাতারা যদি তাদের সন্তানদের তরবীয়ত অধিকতর আন্তরিকতার সাথে করতেন, তাহলে আজ গ্রেটবৃটেনের রাস্তায় রাস্তায় এত বেশী অপরাধ সংঘটিত হতো না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শাস্তিমূলক ও নিবর্তন ব্যবস্থাদির দ্বারা সমাজের গুণগত মান কতখানি উন্নত করা যাবে, বিশেষতঃ যখন জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই ধর্মীয় নীতি ও নৈতিকতার কোনও কার্যকারিতা নেই?

নিষ্ফল, বৃথা কার্যকলাপ নিরুৎসাহিতকরণ

উক্ত বিষয়ে আরও বলতে গিয়ে পবিত্র কোরআন ঘোষণা দিয়েছেঃ

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

"এবং যারা সকল বৃথা কার্যকলাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (আল্ মুমেনূন - ২৩ঃ৪)

যারা বিজ্ঞ তারা অযথা অর্থহীন কার্যকলাপে তাদের শক্তি অপচয় করা থেকে বিরত থাকে।

লঘু আমোদ-প্রমোদের জন্য কিছুটা সময় করে নেওয়াটা খারাপ কিছু নয়, তা নিষেধও করে না ইসলাম। কিন্তু আমোদ-প্রমোদ যদি সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের উপরেই প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, তাহলে সেটাকে কোনমতেই অনুমোদন দেয়া যায় না। তাছাড়া, আমোদ-প্রমোদ যদি জীবনের একঘেঁয়েমী কাটানোর পরিবর্তে জীবনের একটা উদ্দেশ্য হয়ে বসে, তাহলে সেটাকে কোরআনের পরিভাষায় 'লগ্‌ব' (বৃথা, নিষ্ফল) বলেই নিন্দা করতে হবে। আমোদ-প্রমোদ যখন জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্মকে ব্যাহত করতে থাকে অথবা কারো সময় নষ্ট করতে থাকে-যে সময়টা সে ভাল কাজে ব্যয় করতে পারতো, তাহলে সেটাকেও আরবী 'লগব' শব্দের তাৎপর্য অনুযায়ী বৃথা বলেই অভিহিত করতে হবে।

টেলিভিশন সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করেছে, কিন্তু ছেলেমেয়েরা তো সারাটা দিন সেই বাক্সটার দিকেই চোখ লাগিয়ে বসে থাকে। কাজকর্ম থেকে ফিরে এসেই লোকেরা টিভি সেটের সামনেই বসে পড়ে। তা সে প্রোগ্রাম যা-ই হোক না কেন। এতে করে তারা তাদের যে দায়িত্ব তাদের ছেলেমেয়ের প্রতি, স্ত্রীর প্রতি এবং

বন্ধুবান্ধব তথা গোটা সমাজের প্রতি, তা অবহেলা করছে। ফলে টিভি এখন একটা আধুনিক অভিশাপে পরিণত হয়েছে। এ যুগে টিভি দেখতে এত বেশী সময় নষ্ট করা হচ্ছে যে, কারো পক্ষে এর ভাল-মন্দ নিরূপণ করাই কঠিন, বরং দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তবু এটা-ই যদি সবটা হতো!

টিভি-তে প্রদর্শিত অপরাধ চলচ্চিত্রগুলোতে প্রায় ক্ষেত্রেই অপরাধের ভাবমূর্তিকে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে, তা ছেলেমেয়েদের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া তো সৃষ্টি করেই না, বরং তার উল্টোটাই করে। এমনকি, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের জন্য তৈরী প্রোগ্রামগুলোতেও, প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, জনপ্রিয় চরিত্রগুলো দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত দুষ্ট কলাকৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে কুফলই ছড়াচ্ছে বেশী, যার দরুন বাড়ীর মধ্যেই শান্তি বিপর্যস্ত হচ্ছে। এই প্রোগ্রামগুলো যতই আকর্ষণীয় ও বিনোদনমূলক হোক না কেন, এগুলো কোনক্রমেই শিক্ষামূলক নয়। এতে সন্দেহ নেই যে, এই প্রোগ্রামগুলো দেখার কারণে বহু অবাধ্য শিশু জন্ম নিচ্ছে, এবং তারা ভবিষ্যতে অপরাধী হওয়ার ক্ষমতা (Potentiality) নিয়েই বেড়ে ওঠছে।

বয়স্কদের জন্য নির্মীত প্রোগ্রামগুলোতে, অপরাধ সংঘটনের জন্য উদ্ভাবিত কলাকৌশলগুলো, অনিচ্ছাকৃতভাবেই, শেখানো হচ্ছে। হাসি-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুকময় অবসর জীবন কেমন হওয়া উচিত, তা এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দঘন করে প্রদর্শিত হচ্ছে যে, তাতে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। হায়! কল্পনা ও বাস্তবতায় যে ব্যবধান তার কিছুটা যদি তারা বুঝতো! এবং বুঝতো যদি যে, কি হওয়া উচিত এবং কি হয়!

পবিত্র কোরআন যে সকল বৃথা সুখের অন্বেষাকে নিষেধ করেছে, তার মধ্যে ছোটখাট ও তুচ্ছ ব্যাপারগুলো পড়ে না বলে অনেকে মনে করতে পারে। এটা এবং আমোদ-প্রমোদের অন্যান্য অনেক রীতি প্রণালী সেই আবহাওয়া সৃষ্টিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে, যে আবহাওয়ায় হতাশার ও ব্যর্থতার মাত্রা বাড়তেই থাকে। যে কেউ ভাবলে অবাক হবে যে, এমনটি যদি হতেই থাকে, তাহলে আরও চরম স্তরে পৌঁছবে কবে!

কামনা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ

পবিত্র কোরআন কামনা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ চায়ঃ ঈর্ষা যদি অদম্য ও অতৃপ্ত বাসনা-কামনার জন্ম দেয়, তবে তারও অনুমোদন দেয়া যাবে না।

এই শিক্ষার মধ্যে নিহিত রয়েছে কামনা-বাসনার সুশৃংখলতা, বিন্যস্ততা ও পরিশীলতা সম্পর্কে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। ইসলাম, অবশ্য এমন কোন ধর্ম নয় যা পলায়নী মনোবৃত্তি সমর্থন করে, কিংবা সন্ন্যাস বা কঠোর বৈরাগ্য-ব্রত অলম্বনের মাধ্যমে সহজাত কামনা-বাসনার নিরোধে 'নির্বাণ' বা বস্তুজগতের বন্ধন থেকে পরিত্রাণ লাভের কথা বলে। 'নির্বাণ'-এর দর্শনের কথা হচ্ছে, কামনা-বাসনাই আমাদেরকে বস্তুর বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে, আমাদেরকে বস্তুবাদিতার দাসে পরিণত করেছে। এবং এথেকে মুক্তি পেতে চাইলে, সমস্ত কামনা-বাসনাকে নিরোধ করতে হবে।

ইসলাম এই দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এই জন্যে যে, এই দর্শন মনুষ্য নির্মীত, অস্বাভাবিক এবং তা সমস্যা সমাধানে অপর্যাপ্ত। 'নির্বাণ'-এর ধারণা বা কনসেপ্ট শান্তির চাইতে মৃত্যুর বেশী কাছাকাছি। এক্ষেত্রে ইসলামের সম্পূর্ণ আলাদা সমাধান রয়েছে। ইসলামের মতে, জীবনের প্রহেলিকা বা মায়া অপসারণের লক্ষ্যে কামনা-বাসনাকে হত্যা করাটা কোন সমাধান নয়।

সামজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক ব্যবস্থার কথাই বলা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, এই উপদেশ যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, তার কামনা-বাসনা বা প্রবৃত্তিগুলোকে সুসংহত করা, সীমিত রাখা এবং বাগে রাখা। অন্যথায়, সকল কামনা-বাসনার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধনের মাধ্যমে কোন মানুষেরই পক্ষে শান্তি লাভ করা সম্ভব হবে না। আগেই যেমন বলা হয়েছে, কামনা-বাসনার নাগাল পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এজন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলোকে আপাতঃদৃষ্টিতে যত সামান্যই মনে হোক না কেন, এগুলোর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অত্যন্ত কার্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণ। কোরআন করীমে উপদেশ দেওয়া হয়েছেঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

"এবং আমরা তাদের মধ্য থেকে কতক লোককে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের যা কিছু উপকরণ উপভোগ করতে দিয়েছি, তার প্রতি তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও বিস্ফারিত করে দেখবে না, (কারণ, এই সব উপকরণ তাদেরকে এজন্যই দেওয়া হয়েছে) যেন আমরা তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করি। এবং তোমার প্রতিপালকের দেওয়া রিয্ক সর্বোত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী।" (তা'হা-২০ঃ১৩২)

পবিত্র কোরআন অপরের সম্পর্কে অতিরিক্ত সন্দেহ বা কুধারণা পোষণ করতে, ছিদ্রান্বেষণ করতে বা নাক গলাতে এবং গীবত বা পরনিন্দা ও পরচর্চা করতে নিষেধ করেছেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ ۝

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার কর। কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করবে না, এবং একে অপরের পিছনে গীবত (কুৎসা) করে বেড়িয়ো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে চাইবে? অবশ্যই এটাকে তোমরা ঘৃণা করবে, এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।" (আল্ হুজুরাত-৪৯ঃ১৩)

ট্রাস্ট গঠন এবং ট্রাস্ট ও চুক্তির অলংঘনীয়তা

ইসলামী সমাজে ট্রাস্ট স্থাপন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামিক সমাজের যে ঐক্যের ধারণা (Concept of Unity) তাতে ট্রাস্ট বা আমানত এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির অলংঘনীয়তা একটা মৌলিক বিষয়রূপে বিবেচিত। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ۝

"মুমিন তারাই, যারা নিজেদের আমানত (বা ট্রাস্ট) সমূহের এবং অঙ্গীকার (বা চুক্তি) সমূহের প্রতি যত্নবান (সতর্ক)।" (আল্ মুমেনূন- ২৩ঃ৯)

অশুভ বা মন্দের উৎসাদনঃ একটি সম্মিলিত দায়িত্ব

জনগণকে (এ ব্যাপারে) শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত নয়। এটা জনগণের নিজেদেরই সম্মিলিত দায়িত্ব যে, তারা নিজেরা ভাল কাজ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

আধুনিক উন্নত সমাজগুলোতে ঘরবাড়ী ও রাস্তাঘাট থেকে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করার এবং সেগুলো সরিয়ে ফেলার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করা থাকে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোতে গৃহকর্ত্রীরা তাদের ঘরের ময়লা আবর্জনা সরাসরি রাস্তার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যার ফলে ময়লা আবর্জনা জমতে জমতে রাস্তাগুলো ভরে ওঠে এবং সেগুলো তখন আর চলাচলের উপযোগী থাকে না।

বাড়ীর লোকজন অবশ্যই তাদের ঘরবাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। কিন্তু, পথঘাটও তো পরিষ্কার রাখার কোন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

একটা দুঃখবহ ব্যাপার হচ্ছে, পাশ্চাত্য যদিও সামাজিক দায়িত্বের এই গুরুত্বটা উপলব্ধি করে যে, জনসাধারণের সমাগম হওয়ার স্থানগুলোকে অর্থাৎ পাবলিক প্লেসগুলোকে পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। কিন্তু তারা এখনও পর্যন্ত এই দায়িত্বের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারছে না যে, সমাজকে অপরাধী মানব-আবর্জনা থেকেও পরিষ্কার রাখতে হবে। কেননা, এই আবর্জনাই তো প্রত্যহ ঘর থেকে নির্গত হয়ে পথঘাট ও পাবলিক প্লেসগুলোকে নোংরা করে তুলছে। ইসলাম এই প্রশ্নটাকে আরও ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে। সামাজিক আবর্জনা কমিয়ে ফেলার প্রাথমিক দায়িত্ব পরিবারের বড়দের উপরেই বর্তায়, যাতে সমাজের প্রতি মন্দ অপেক্ষা ভাল অনেক বেশী করে করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, ইসলাম সমাজের উপরে এই দায়িত্ব অর্পণ করে যে, সমাজ ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে অশুভ বা মন্দের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করবে। তবে, এই জেহাদ না তরবারির, না নিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রণয়নের। বরং তা হবে অনবরত সতর্ক করার, উপদেশ দেওয়ার এবং বিজ্ঞ পরামর্শ দানের । ধৈর্য সহকারে সতর্ক করা, উপদেশ দেওয়া বা নসিহত করা এবং সুপরামর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে, কোরআন করীমের মতে, সামাজিক অশুভ থেকে সমাজকে মুক্ত রাখার সর্বোত্তম পন্থাঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

"এবং তোমাদের মধ্যে এমন এক জামা'ত থাকা দরকার যারা (সর্বদা মানুষকে ভাল কাজ করার জন্য উপদেশ দিবে এবং) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে; এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে, এবং অসঙ্গত কাজ করতে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ এরাই সফলকাম (অর্থাৎ এই ধরনের সমাজগুলোই টিকে থাকবে। এখানে 'মুফলেহূন'

শব্দটির অর্থ এও হতে পারে যে, 'যারা উত্তরণের জন্য যোগ্যতম')। (আলে ইমরান-৩ঃ১০৫)

উপর্যুক্ত আয়াতে করীমা থেকে এটা আন্দাজ করা ঠিক হবে না যে, জনস্বাস্থ্য ও জনহিতকর কার্যাদির রক্ষা ও পরিচালনার যে ইসলামী প্রয়াস, তা সম্পূর্ণরূপেই বেসরকারী এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের করণীয় কিছুই নেই। অবশ্যই, আইনের প্রনয়ণ ও তার প্রয়োগ একান্তভাবেই রাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু, আমি যে বিষয়টার উপরে জোর দিতে চাচ্ছি, তা শুধু এটাই যে, ইসলামের মতে, অপরাধ দমন, নিবারণ বা কমানোর জন্য রাষ্ট্রীয়যন্ত্র একা যথেষ্ট নয়। ঘরে এবং সমাজে একবার অপরাধ প্রবণতাকে সৃষ্টি হতে দিলে বা প্রসার লাভ করতে দিলে, একটা সরকার সবচেয়ে বেশী যতটা করতে পারে তা হচ্ছে, এর শুধু উপসর্গগুলোকেই সময় সময় উৎখাত করে ফেলতে পারে। অশুভ বা মন্দের মূল কারণ এত বেশী গভীরে নিহিত যে, সেখানে আইনের লম্বা হাতও পৌঁছতে পারে না। তাই, প্রতিটি সমাজের সকল পরিবার, ধর্মীয় নেতা ও জননেতাদের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে, সমাজ থেকে অশুভের উৎসাদন করা।

এই আয়াত এবং আরও কতিপয় আয়াতের আলোকে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একবার ঘোষণা করেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা বিয়োগান্ত পরিণতির শিকারে পরিণত হয়েছিল এই জন্য যে, তারা তাদের কর্তৃপক্ষকে অমান্য করেছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। তারা একে অপরকে অন্যায় ও বেইনসাফী করা থেকে প্রতিহত করেনি।

তিনি আরও বলেছেন, *'অবশ্যই, আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা ভাল কাজ ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং মন্দকাজ ও অকল্যাণ করতে নিষেধ করবে। দুষ্কৃতকারীর হাত ধরে ফেলো এবং তাকে সৎভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ কর; তাকে সৎপথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। অন্যথায়, আল্লাহ্‌ তোমাদের কতকের হৃদয়কে তাদের হৃদয়ের সঙ্গে জড়ায়ে ফেলবেন এবং তিনি তোমাদেরকেও তাদের মতই অভিশপ্ত করবেন।' (আবুদাউদ ও তিরমিযীঃ রিয়াযুস সালেহীন-১৯৮ পৃঃ৫০)*

হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর মতানুসারে, একটা জাতির অধঃপতনের অতি মারাত্মক কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে, অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতা প্রকাশ্যে সংঘটিত বা প্রদর্শিত হলেও তার প্রতি জনগণের অসন্তোষ প্রকাশের সাহস হারিয়ে ফেলা। রসূলে পাক (সাঃ) এক হাদীসে এই ধরনের সমাজের সঙ্গে একটা জাহাজের আরোহীদের তুলনা করেছেন এই ভাবেঃ

'নোমান বিন বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন; যারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমাকে মেনে চলে এবং যারা সেই সীমা সম্পর্কে গাফেল থাকে, তাদের উপমা সেই জাহাজের সেই যাত্রীদের ন্যায়, যারা লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়

যে, কারা জাহাজের উপরের ডেকে অবস্থান নিবে এবং কারা নীচের ডেকে। এবং এভাবেই তারা তাদের স্থান ঠিক করে নেয়। যারা জাহাজের উপরের ডেকে স্থান নিয়েছিল তাদের পক্ষে পানির কাছে যাওয়ার জন্য সরাসরি কোন পথ ছিল না। কাজেই, পানি আনার জন্য তাদেরকে বার বার উঠানামা করতে হতো, এবং এতে করে নীচের ডেকে অবস্থান গ্রহণকারীদের অসুবিধার সৃষ্টি হতো। একবার তারা নীচের ডেকের লোকদের কাছে এই প্রস্তাব দিল যে, তাদের আপত্তি না থাকলে তারা, 'উপরের ডেকের লোকেরা', জাহাজের তলদেশে বা পাটাতনে একটা গর্ত বা ফোঁকড় করে নিবে, যাতে তারা সরাসরি পানি সংগ্রহ করতে পারে। এখন, যদি জাহাজের নীচের ডেকের লোকেরা অন্যদেরকে তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করতে দেয়, তাহলে তারা সবাই একত্রে ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যদি তারা এ কাজ করতে না দেয়, তাহলে তারা সবাই বেঁচে যাবে।' (বুখারীঃ রিয়াযুস সালেহীন-১৮৯ পৃঃ৪৮)

আমার ভয় হয়, এই উপমাটি যেন আজকের পৃথিবীর সমাজগুলোর জন্যই প্রযোজ্য।

'কর' এবং 'কর না' (আদেশ ও নিষেধ)

কোরআন করীমের আরও যে সকল আয়াতে, শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহায়ক সামাজিক দায়িত্বাবলীর কথা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

"এবং রহমানের প্রকৃত বান্দা তারাই যারা ভু-পৃষ্ঠের উপর নম্র হয়ে চলে, এবং যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তারা কোন বিবাদ না করে বলে 'সালাম'।" (আল্ ফুরকান- ২৫ঃ৬৪)

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

"এবং যখন তোমাদেরকে সাদর সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়, তখন তোমরা তা থেকে আরও উত্তম সাদর-সম্ভাষণ জানাও, অথবা (কমপক্ষে) তা-ই প্রত্যর্পণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" (আন্ নিসা-৪ঃ৮৭)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

"এবং তুমি লোকের সম্মুখে অবজ্ঞাভরে গাল ফুলিও না, এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকারের সাথে চলিও না, কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না। এবং তুমি নিজ চাল-চলনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, এবং নিজ কণ্ঠস্বরকে মৃদু রাখো, নিশ্চয় সকল কণ্ঠস্বরের মধ্যে গর্দভের কণ্ঠস্বর সর্বাধিক কর্কশ।" (সূরা লোকমান- ৩১ঃ১৯,২০)

ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে যে ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করতে চায় তা এমনিতেই স্বয়ং দায়িত্বহীন আচরণ ও অপরাধ প্রতিহত করে। ইসলাম এমন এক প্রকার সুস্থ যমীন সৃষ্টি করে যা আদতেই জীবাণু ও আগাছার বৃদ্ধি নাশ করে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত বিস্তারিত এবং ব্যাপক শিক্ষা দান করা হয়েছে- 'কর' এবং 'কর না' অর্থাৎ আদেশ ও নিষেধের আকারে, যার সংখ্যা অন্ততঃ কয়েক শ' হবে। এই শিক্ষার যে গূঢ়মর্ম তা প্রায় সকল ধর্মেই অভিন্ন। এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের মতাদর্শগত পার্থক্য তুলে ধরার পরিবর্তে, আমি এখানে, আপনাদের সামনে, এ সকল অভিন্ন শিক্ষার গুটি কতকের ব্যাপারে কোরআন করীমের হাওয়ালা পেশ করবোঃ

'কর (আদেশ)ঃ-

সতীত্বঃ ১৭ঃ৩৩;২৩ঃ৬-৮; ২৪ঃ৩১,৩৪,৬১; ২৫ঃ৬৯; ৩৩ঃ৩৬; ৭০ঃ৩০-৩২
পাক-সাফঃ ২ঃ২২৩; ৪ঃ৪৪; ৫ঃ৭; ২২ঃ৩০; ৭৪ঃ৫,৬
ক্রোধ-দমনঃ ৩ঃ১৩৫
সহযোগিতাঃ ৫ঃ৩
সাহসঃ ২ঃ১৭৮; ৩ঃ১৭৩-১৭৫; ৯ঃ৪০; ২০ঃ৭৩-৭৪; ৩৩ঃ৪০; ৪৬ঃ১৪
সৎকাজঃ ২ঃ১৯৬; ৩ঃ১৩৫; ৫ঃ৯৪; ৭ঃ৫৭
শুভের প্রতি আহ্বান ও অশুভের বারণঃ ৩ঃ১১১
সৎকাজে প্রতিযোগিতাঃ ২ঃ১৪৯
আমানত রক্ষাঃ ২ঃ২৮৪; ৪ঃ৫৯ঃ২৩ঃ৯; ৭০ঃ৩৩

ক্ষুধিতকে অন্নদানঃ ৭৬ঃ৯; ৯০ঃ১৫-১৭
ক্ষমাঃ ২ঃ১১০; ৩ঃ১৩৫, ১৬০; ৪ঃ১৫০; ৫ঃ৭,৯০; ১৪ঃ৮; ৩৯ঃ৮,৬৭; ৪৬ঃ১৬
সত্যসাক্ষ্য দানঃ ৪ঃ ১৩৬; ৫ঃ৯; ২৫ঃ৭৩
কর্মচারীদের প্রতি সদ্ব্যবহারঃ ৪ঃ৩৭
প্রতিবেশীদের প্রতি সদ্ব্যবহারঃ ৪ঃ৩৭
আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহারঃ ২ঃ১৭৮; ১৬ঃ৯১; ৩০ঃ৩৯
কৃতজ্ঞতাঃ ২ঃ১৫৩,১৭৩,১৮৬,২৪৪; ৩ঃ১৪৫; ৫ঃ৭,৯০; ১৪ঃ৮; ৩৯ঃ৮,৬৭; ৪৬ঃ১৬
বিনয়ঃ ৬ঃ৬৪; ৭ঃ১৪,৫৬,১৪৭; ১৬ঃ২৪,৩০; ১৭ঃ৩৮; ২৮ঃ৮৪; ৩১ঃ১৯,২০; ৪০ঃ৩৬
সুবিচারঃ ৫ঃ৯; ৬ঃ১৫৩; ১৬ঃ৯১; ৪৯ঃ১০
জনগণের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাঃ ৪ঃ১১৫; ৪৯ঃ১০
ধৈর্যঃ ২ঃ৪৬,১৫৪,১৫৬,১৭৮; ১১ঃ১২; ১৩ঃ২৩; ১৬ঃ১২৭-১২৮; ২৮ঃ৮১; ২৯ঃ৬১; ৩৯ঃ১১; ৪২ঃ৪৪; ১০৩ঃ৪
অধ্যবসায়ঃ ১৩ঃ২৩; ৪১ঃ৩১-৩৩
পবিত্রতাঃ ২ঃ২২৩; ৫ঃ৭; ৯ঃ১০৩,১০৮; ২৪ঃ২২; ৩৩ঃ৩৪; ৭৪ঃ৫; ৮৭ঃ১৫; ৯১ঃ১০,১১
আত্ম-সংযমঃ ৪ঃ১৩৬; ৭ঃ২০২; ১৮ঃ২৯; ৩০ঃ৩০; ৩৮ঃ২৭; ৭৯ঃ৪১-৪২
এখ্‌লাস বা একনিষ্ঠতাঃ ৩৯ঃ৩,৪; ৯৮ঃ৬; ১০৭ঃ৫-৭
সত্যবাদিতাঃ ৪ঃ১৩৬; ৫ঃ১২০; ৯ঃ১১৯; ১৭ঃ৮২; ২২ঃ৩১; ২৫ঃ৭৩; ৩৩ঃ২৫,৩৬,৭১; ৩৯ঃ৩৩
নিঃস্বার্থপরতাঃ ২ঃ২০৮, ২৬৩; ১১ঃ৫২; ৫৯ঃ১০; ৬৪ঃ১৭; ৭৬ঃ৯,১০; ৯২ঃ২০,২১

'কর না' (নিষেধ)ঃ-

জেনা বা ব্যভিচারঃ ১৭ঃ৩৩
উগ্রতাঃ ২ঃ৩৫,৮৮; ৪ঃ১৭৪; ৭ঃ৩৭
গীবত বা পরনিন্দা, পরচর্চাঃ ৪৯ঃ১৩
গর্ব, দম্ভঃ ৫৭ঃ২৪
মানহানিঃ ৪৯ঃ১২
উপহাসঃ ৪৯ঃ১২

হতাশাঃ ৩৯ঃ ৫৪

হিংসা, ঈর্ষাঃ ১১৩ঃ৬

অপব্যয়ঃ ৭ঃ৩২; ১৭ঃ২৭,২৮

কোন কিছু সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও অনুসরণঃ ১৭ঃ৩৭

ঔদ্ধত্যঃ ১৭ঃ৩৮; ২৩ঃ৪৭; ৩১ঃ১৯

মাপে কম দেওয়াঃ ৮৩ঃ২-৪

অবজ্ঞাসূচক উপনাম দেওয়াঃ ৪৯ঃ১২

কৃপণতাঃ ৪ঃ৩৮; ৪৭ঃ৩৯; ৫৭ঃ২-৫; ৫৯ঃ১০; ৬৪ঃ১৭

অবিশ্বস্ততা; বিশ্বাসঘাতকতাঃ ৪ঃ১০৬, ১০৮; ৮ঃ২৮,৫৯

সন্দেহঃ ৪৯ঃ১৩

মিথ্যা বলাঃ ২২ঃ৩১; ২৫ঃ৭৩

চুরিঃ ৫ঃ৩৯

ইসলাম প্রত্যেক ধর্মের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানায় সবাই মিলে এক সাথে সমাজে ভাল বা শুভকে উদ্বুদ্ধ করতে, তার প্রসার ঘটাতে, চর্চা করতে; এবং মন্দ বা অশুভ থেকে বিরত থাকার জন্য বার বার উপদেশ দিতে, সতর্ক করতে।

এমন যদি হতো, তাহলে পৃথিবীটা কতই না সুন্দর হতো!

জাতি-ভেদ প্রথার প্রত্যাখ্যান

সমসাময়িক যামানাকে যে সকল অভিশাপ জরাজীর্ণ করে ফেলেছে, তার মধ্যে জাতি-ভেদ প্রথা এমন একটা অভিশাপ যা পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সব চাইতে মারাত্মক বিপদের সৃষ্টি করে রেখেছে।

পবিত্র কোরআন শুধু মুসলমানদেরকেই নয়, সমগ্র মানবজাতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ
بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি

করেছেন; এবং উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার সাধন করেছেন এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর, এইরূপ আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও (বিশেষ করে তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপরে পর্যবেক্ষণকারী"। (আন্ নিসা-৪ঃ২)

কারো উপরে কারো শ্রেষ্ঠত্ব (Superiority) নেই।

তেমনিভাবে, পবিত্র কোরআন বলেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

"হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদের এক পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী সর্ববিদিত"। (আল্ হুজুরাত-৪৯ঃ১৪)

এবং

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ
عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا
مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ
ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝

"হে যারা ঈমান এনেছ! কোন জাতি যেন অন্য কোন জাতিকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তারা ওদের চাইতে উত্তম হতে পারে এবং নারীরাও যেন অন্য নারীদেরকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তারা ওদের চাইতে উত্তম হতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি

দোষারোপ করো না; এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপনাম দিয়ে ডেকো না। ঈমান আনার পর দূষণীয় নাম (দ্বারা অভিহিত হওয়া) বড়ই মন্দ বিষয়, এবং যারা এর পর তওবা করবে না, তারাই যালেম।" (আল্ হুজুরাত-৪৯ঃ১২)

দৃশ্যতঃ, মনে হচ্ছে, সমসাময়িক সমাজ জাতিভেদ ও বর্ণবাদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এবং এগুলোর দরুন সৃষ্ট ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। কিন্তু, আপনি যদি এই ইস্যুটাকে অধিকতর সতর্কতার সহিত গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখেন, তাহলে আপনি উপলব্ধি করতে থাকবেন যে, জাতি-ভেদ সর্বত্রই বিদ্যমান রয়েছে।

'জাতি-ভেদ প্রথার' (Racialism) সংজ্ঞা নিরূপণ করাই একটা বড় সমস্যা। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংজ্ঞা বিভিন্ন রকম হতে পারে। জাতি-ভেদ প্রথা, শ্রেণী-চেতনা, ধর্মীয়-শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রীয়-ভেদাভেদ, ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং জাতীয়তা-বাদ– এগুলোর মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা মুশকিল।

পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টানদের হাতে, হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরে, ইহুদীরা যে মর্মান্তিক ও অমানবিক নির্যাতন ভোগ করেছিল, তা অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু বিগত তিরিশ ও চল্লিশের দশকে নাৎসীদের হাতে ইহুদীদের পাশবিক দুর্ভোগের কথা তো এখনই আমাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। সুতরাং যে মুহূর্তে আমরা 'গোষ্ঠীবাদ' বা 'জাতি-ভেদ' শব্দটা শুনতে পাই, সেই মুহূর্তেই আমাদের মন অনবধানবশতঃ সেমেটিক-বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এবং অ-ইহুদীদের হাতে সেমেটিক জাতির দুর্ভোগের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতি নিবিষ্ট হয়।

এটা অবশ্য গোষ্ঠীবাদ বা জাতিবাদের অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথার অত্যন্ত সীমিত উপলব্ধি। এটা এত সীমিত যে, এই দৃশ্যপটের অন্তঃস্থিত বিষয়গুলো কোনভাবেই আমাদের গোচরীভূত হয় না। আমরা উগ্রবাদী ইহুদীদের কথা চিন্তা না করেও পারি না। তারা অ-ইহুদীদের প্রতি সেই একই রকম ভয়ংকর কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকায়, যার লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়েছে এখন তারা নিজেরাই।

কিন্তু, এটাই সবটা নয়। জাতিভেদ প্রথার মধ্যে এমন আরও অনেক কিছু আছে যা আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। জাতিভেদ প্রথা এখনও পরিষ্কাররূপে চিহ্নিত নয় যদিও, তবু তা বিদ্যমান রয়েছে বিভিন্ন চেহারায়। এগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। এছাড়াও ধর্মীয়, গোত্রীয় এবং আঞ্চলিক স্বার্থ-চেতনাও এগুলোর মধ্যে কয়েকটি, যেখানে যেখানে জাতিভেদ প্রথা কাজ করে যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন নামে। অশ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ জাতির যে কুসংস্কার তা-ও জাতিভেদ প্রথারই একটা রূপ। তবে, শুধু শ্বেতাঙ্গদেরকেই এই দোষ দেওয়াটা ঠিক হবে না যে, কেবল তারাই ঐ

সকল জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায় যাদের গায়ের রঙ তাদের মত নয়। কৃষ্ণাঙ্গ জাতিভেদও আছে। পীত জাতি-ভেদও আছে। এবং তাদেরও মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আছে যাদের গায়ের রং না সাদা, না কালো, না পীত, বরং এর মাঝামাঝি এক রকম।

জাতি-ভেদ প্রথার সারকথা হচ্ছে– শ্রেণী-সংস্কার। এটাই, সম্ভবতঃ, জাতিভেদ প্রথার সর্বোত্তম সংজ্ঞা। এক শ্রেণীর মানুষ যখন পূর্ব-সংস্কারবশতঃ নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের অজুহাতে আর এক শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে, তখন জাতিভেদ কুণ্ডলী ছেড়ে সোজা হয় এবং তার কুৎসিৎ ও বিষাক্ত ফনা তুলে দাঁড়ায়। ঘৃণা ছড়ানোর ক্ষেত্রে তখন আর কোনও বাছ-বিচার করা হয় না, ব্যক্তিগত গুণাগুণও বিচার করা হয় না, সার্বজনীনতাই তখন আইন হয়ে দাঁড়ায়।

খুব বেশী শতাব্দী আগের কথা নয়, পশ্চিম গোলার্ধ ভাগাভাগি হয়ে পড়েছিল খৃষ্টান বনাম মুসলমানদের মধ্যে। যেই ভয়ানক ধর্মীয় কুসংস্কারের যুগে ইহুদীরা মুসলিম প্রাচ্যের প্রতি যে ভূমিকাই পালন করে থাকুক না কেন, তা তুলনামূলকভাবে অস্পষ্ট; যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে, ইহুদীরা ছিল সেই খৃষ্টান ইউরোপেরই একটা অংশ বিশেষ, যারা ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শবর্তী মুসলিম জাতিগুলোকে ঘৃণা করতো এবং অবিশ্বাস করতো, এবং তারা পাশ্চাত্যে মুসলিম সম্প্রসারণের ভয়েও শংকিত ছিল।

খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে চরম শত্রুতার সময়কালে জাতি-ভেদ প্রথার মধ্যে একটা নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছিল, এবং তা ছিল বর্ণের পার্থক্য। সে সময়ে, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন ও ভারতের মুসলমানরা ছিল সম্পূর্ণরূপে আলাদা ও নির্বিকার। বিবাদটা ছিল অনেকটা তুর্কো-আরব জোট বনাম খৃষ্টান ইউরোপের বিবাদের মতই।

সেই ইতিহাস যদিও চাপা পড়ে গেছে এবং মানুষে তা ভুলেই গেছে বলে মনে হয়, তবু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সেই ইতিহাস আবারও মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠছে। মানবীয় সমস্যাগুলো কখনই চিরস্থায়ীভাবে শেষ হয়ে যায় না, তা যতই না গভীরে সেগুলোকে পুঁতে ফেলা হোক। বর্তমান যুগের দিকে দৃষ্টি ফেরালেও দেখা যাবে যে, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীটা দু'টো পরাশক্তি ও তাদের মিত্রদের মধ্যে মেরুকরণ করা ছিল, ততদিন পাশ্চাত্যের স্বার্থের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, সে ঐ ধরনের ইস্যুগুলোকে উত্তেজিত করে তুলবে না বা সেগুলোকে উত্তেজিত হতে দিবে না। কিন্তু প্রাচ্য প্রতীচ্যের সম্পর্কের নতুন যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে মধ্যযুগীয় এক 'কালো নাইট' (Knight) তার অশুভ ছায়া ফেলতে শুরু করেছে।

খৃষ্টান-মুসলিম ধর্মকেন্দ্রী-রাজনীতির (Religio-Political) ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুনরায় শুরু হওয়ার বাস্তব বিপদ দেখা দিচ্ছে; এবং এবারে তা হবে এক নতুন আবহাওয়ায়, যা সৃষ্টি হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে। এটা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে উভয় পক্ষের কায়েমী স্বার্থের খাতিরে। আমার ভয় হয় যে, ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের মোল্লা-পুরোহিতেরা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে একটা ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করতে পারে। এবং মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের তাবৎ সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিতে পারে। এটা যদি ঘটেই যায়, তাহলে ইসরাঈল তার স্বার্থের অনুকূলে একটা সুবিধা পেয়ে যাবে। এটা তো আশা করা যায় না যে, অমন একটা পরিস্থিতিতে ইসরাঈল জড়িয়ে পড়বে না, এবং চুপচাপ বসে থাকবে।

তাছাড়া, রাজনীতিকেন্দ্রী অর্থনৈতিক (Politico-Economic) বিভক্তিকরণের যে সীমারেখাগুলো রয়েছে, সেগুলোও একটা নতুন ধরনের জাতি-ভেদ প্রথার জন্ম দিচ্ছে। অর্থাৎ, ধনী-উত্তর এবং নির্ধন-দক্ষিণের মধ্যে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে নতুন ধরনের জাতি-ভেদ চেতনা জন্ম নিচ্ছে। আরও পরিষ্কার করে বলতে চাইলে বলতে হয়ঃ

প্রাচ্য তো প্রাচ্যই, আর প্রতীচ্য প্রতীচ্যই
এ দু'য়ের মিলন সাধন হবে না কখনই।

পরাশক্তিগুলোর সাম্প্রতিক সমঝোতা ও দাঁতাত খৃষ্টান-প্রতীচ্য এবং মুসলিম-প্রাচ্যের মধ্যে আবারও সেই ঐতিহাসিক ধর্মকেন্দ্রী-রাজনৈতিক বিতণ্ডা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করতে পারে। পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সাম্প্রতিক দাঁতাতের দরুন নব্য-সাম্রাজ্যবাদ ও ব্যাপকভিত্তিক জাতি-ভেদ চেতনা জন্ম নিতে বাধ্য। এবং পরিণামে যদি পূর্ব ও পশ্চিম একে অপরের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলে তা আদৌ কোন আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না।

মনে হতে পারে যে, সর্বজনগৃহীত পরিভাষা অনুযায়ী জাতি-ভেদ প্রথার যে সংজ্ঞা, তা থেকে আমি দূরে সরে যাচ্ছি এবং তাকে এমন সম্প্রসারিত করছি যে, তার মধ্যে এমন অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করছি যার সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু, আমার যে অভিমত, তা সেই সব মানবীয় প্রেরণার উপরে এক নিরাসক্ত মনের গভীর গবেষণাপ্রসূত ফল, যা থেকে জন্ম নেয় জাতি-ভেদ প্রথা। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর্নিহিত সেই প্রেরণা বা চালিকা-শক্তিগুলো বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ সেই ব্যাধিও থেকে যাবে। তা সেই বিকৃত মানবাচরণকে আপনি জাতিভেদ প্রথাই বলুন, কিংবা কোন সুন্দর ও সভ্য নামেই অভিহিত করুন। জাতি-ভেদ প্রথাকে, বৃহত্তর অর্থে, বুঝতে হবে গোষ্ঠী-

সংস্কাররূপে, যা নিরংকুশ ইনসাফ ও ন্যায়পরতার পরিপন্থী। আমেরিকান ও রাশিয়ান ব্লকের মধ্যেকার মেরুকরণ দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ায় আমরা এমন একটা নতুন যুগে এসে পড়েছি, যখন আমরা বিভক্তি দূরীকরণের পরিবর্তে বিশ্বজোড়া এক পুনর্বিন্যাসের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আদর্শভিত্তিক বিভাগ অস্পষ্ট হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে চিহ্নিত বিভক্তিসমূহ দেখা দিতে বাধ্য এবং তা অধিকতর স্পষ্টরূপে সংজ্ঞায়িত হতেও বাধ্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেকার আদিম ঐতিহ্যগত বিভক্তিটা অস্পষ্ট হয়ে শেষে একটা তাৎপর্যহীন দ্বিতীয় পর্যায়ে নেমে এসেছিল পুঁজিবাদী-সমাজবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে। সেটা আর এখন নেই। তাই, সর্বাধিক ঘোষিত সেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভক্তিটা আবারও একবার দেখা দিবে এবং তা দেখা দিবে, বিশেষ করে, প্রতীচ্যের উন্নত জাতিগুলো এবং প্রাচ্যের অনুন্নত জাতিগুলোর মধ্যে।

মুক্তিপ্রাপ্ত পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলো এবং রাশিয়া ক্রমান্বয়ে তাদের অবস্থান থেকে সরে যাবে এবং পরিশেষে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে যোগ দিবে, এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি অভিন্ন দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করবে। যদিও, বিদেশী বাজার দখল ও একচেটিয়া করণের প্রতিযোগিতার কারণে তাদের মধ্যে নতুন নতুন বৈরিতাও দেখা দিবে, তবু সামগ্রিকভাবে, পাশ্চাত্য পূর্বের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী রাজনীতিকেন্দ্রী অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পূর্ব-ইউরোপীয় ব্লকটাকে অঙ্গীভূত করে ফেলবে। এতে একটা অধিকতর স্বস্তিও ফিরে আসবে, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেকার ঐতিহ্যগত বিভক্তিটা অধিক গুরুত্ব লাভ করবে।

এর সঙ্গে যোগ দিবে নব্য-সমাজতন্ত্রের জন্ম। যে সমাজতন্ত্রে এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের শ্রেণীকে স্থানচ্যুত করবে জাতিবর্গ। কাজেই, বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের মেরুকরণ তখন আর একজাতির ধনীদের এবং অপর এক জাতির গরীবদের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে হবে না। আগামী কয়েক বছরের জন্য এই সর্বনাশা মেরুকরণ হয়তোবা অবদমিত বা ভোঁতা করে রাখা যেতে পারে, কিন্তু আখেরে ব্যাপক আকারের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষকে কিছুতেই, বরাবরের জন্য এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে না।

আমি গভীরভাবে শংকিত যে, আমরা একটা বিশ্বজোড়া অত্যন্ত জঘন্য নব্য-জাতিভেদ প্রথার যুগে প্রবেশ করছি, যার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং যাকে প্রশ্রয় দিতে পারে ইহুদী বা জাইঅ্যানবাদী (Zionist) নেতৃত্বের একটা অংশ। যদি, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঞ্জামিন বেইত-হাল্লামী কর্তৃক রচিত পুস্তক 'The Israeli Connection: Whom Israeli Arms and Why - (Published in 1988 by I.B.Touris & Co. Ltd., London)-এর কথা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়, এবং

জাইঅ্যানবাদীদের সুসংগঠিত ও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের যে সকল তথ্য প্রমাণ তিনি তার পুস্তকে পেশ করেছেন সেগুলো যদি প্রামাণিক বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তা বিশ্বশান্তির সম্ভাবনার বিপক্ষেই চলে যাবে।

বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীতে ইসরাঈল যে ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও তার যে ভূমিকা পালন করার বাকী আছে, তা থেকে নিম্ন বর্ণিত দৃশ্যই ফুটে ওঠেঃ

ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠাতা-জনক ডেভিড বেন-গুরিওন ১৯৫৭-এর জানুয়ারীতে বলেছিলেনঃ 'আমাদের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার দিক থেকে একটা ইউরোপীয় দেশের বন্ধুত্ব এশিয়ার সমস্ত মানুষের মতামতের চাইতে মূল্যবান। (Medzini, 1976; p.75) p.5 'আরবদের বিরুদ্ধে পুনরায় প্রাধান্য অর্জনের জন্য ইসরাঈলের নিজের উদ্বেগ এবং আমেরিকার সাম্রাজ্য-বিস্তারের পতন রোধের লক্ষ্য একত্রে মিলিত হয়েছে' (পৃঃ ২০৫)।

'আধুনিক দক্ষিণপন্থীরা সেই ইসরাঈলীকে ভালবাসতে চায়, যে হবে লম্বা, সুঠাম, উজী (Uzi) অস্ত্রে সজ্জিত, এবং যে তৃতীয় বিশ্বের চরমপন্থী (Radical) শক্তিগুলোর উপরে বিজয়লাভের জন্য কালো চামড়ার দেশীয়দেরকে হত্যা করবে। এটাই সেই কারণ, যেজন্য ইসরাঈলীদের ভালবাসে আর্জেন্টেনিয়ার জেনারেলরা, প্যারাগুয়ের কর্নেলরা, আফ্রিকান ব্রিগেডিয়াররা।' (পৃঃ ২১৮)।

১৯৭০-এর দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যে আওয়াজ উঠেছে 'তৃতীয় বিশ্বের পতন চাই' (Down with the Third World), তা-ও ইসরাঈলের খুঁটিতে বাঁধা। এর চ্যাম্পিয়ানরা, যেমন– দানিয়েল প্যাট্রিক মঈনিহান এবং জীন কাল্ক প্যাট্রিক ইসরাঈলকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করে এবং প্রেরণা হিসেবে মান্য করে– (পৃঃ ২২২)। 'ব্লাদিমীর যাবোটিনস্কী, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, ডানপন্থী জাইঅ্যানবাদের (Zionism) নেতা ছিলেন, তিনি জাইঅ্যানবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বন্ধুত্বের ব্যাপারে খুবই স্পষ্টবাদী ছিলেন। ..... সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে ইউরোপীয় হাতে রাখার জন্য জাইঅ্যানবাদের সিদ্ধান্ত অটল। ..... প্রত্যেকটি পূর্ব-পশ্চিম সংঘাতে আমরা সব সময়ই পশ্চিমের সঙ্গে থাকবো। কেননা, পশ্চিম পূর্বের চাইতে অনেক বেশী উন্নত সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে আসছে, এবং তা মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের খেলাফৎ ধ্বংস হওয়ার পর থেকে নিয়ে গত হাজার বছর ধরে ..... এবং আমরাই হচ্ছি আজ সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা প্রধান অনুগত বাহক..... আমরা কখনই আরব আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারি না, যা কিনা বর্তমানে আমাদের বিরোধী এবং আমরা এই আন্দোলনের প্রত্যেকটি বিপর্যয়ের সময়ে মনে-প্রাণে খুশী হই। (Brenner,1984, pp.75-77) p.227.

'তৃতীয় বিশ্বের মুক্তির ধারণা জাইঅ্যানবাদের মর্মে আঘাত হানে, মানবাধিকারের ধারণা ইসরাঈলী রাজনৈতিক পদ্ধতির জন্য দারুণ বিপজ্জনক। ফিলীস্তিনীদের উপর যে অবিচার করা হয়েছে তা এত স্পষ্ট ও এত সাংঘাতিক যে, তা নিয়ে খোলাখুলিভাবে কোন আলোচনা করাই সম্ভব নয়। এবং তৃতীয় বিশ্বে ইসরাঈল যা করে চলেছে তার খোলাখুলি আলোচনাও নিশ্চিতভাবে ফিলীস্তিনীদের অধিকারের বিষয়টা তদন্ত করার দিকেই চলে যাবে ..... (ইসরাঈলীরা) বাদবাকী দুনিয়াটার কাজকর্মকে সাত তাড়াতাড়ি ভণ্ডামি বলে নিন্দা করে যখন মানবাধিকার ও সার্বজনীন সুবিচারের ইস্যুগুলো আলোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে তারা শেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। (পৃঃ ২২৬-২৩৭)

'ফিলীপাইনের ম্যানিলা থেকে হণ্ডুরাসের তেগুচিগালপা এবং নামিবিয়ার উইণ্ডহক পর্যন্ত ইসরাঈলী দূতেরা বিরতিহীনভাবে যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তা আদতেই একটা বিশ্বযুদ্ধ। কোন্ শত্রুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ? এই শত্রু হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের জনগণ, যাদেরকে কখনই তাদের বিপ্লবে জয়ী হতে দেওয়া যায় না'। (পৃঃ ২৪৩)

'ইসরাঈলের অবস্থার পূর্বলক্ষণ ততক্ষণই ভাল দেখায়, যতক্ষণ আরব জাহান ও তৃতীয় বিশ্ব বিভক্ত ও দুর্বল থাকে। এই পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটলে অশুভ লক্ষণ দেখা দিবে।' (পৃঃ ২৪৭)

ইসরাঈল যা রপ্তানী করে থাকে, তা হচ্ছে অত্যাচারীর যুক্তি, যা সেই বিশ্বকে দেখার উপায়, যা বাঁধা আছে সফল স্বৈরশাসনের খুঁটিতে। যা রপ্তানী করা হচ্ছে, তা শুধু প্রযুক্তি, অস্ত্রশস্ত্র, বা অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য অভিজ্ঞতা নয়, বরং তা হচ্ছে একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা'। (পৃঃ ২৪৮)

একটা জোর আশা করা যায় যে, জাইঅ্যানবাদের যুদ্ধ যুদ্ধ চীৎকারের বিরুদ্ধে ইসরাঈলী নেতৃত্বের অধিকতর দমনীয় অংশটির কণ্ঠই আখেরে প্রাধান্য লাভ করবে। সমস্ত ইসরাঈলী লেখকদের মধ্যে এক্ষেত্রে এক বিশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন হারকাবী (Harkabi), যাঁকে সম্ভবতঃ মধ্যপন্থী ও যুক্তিবাদী বলে আখ্যায়িত করা যায়। তিনি শুধু উগ্র জাইআনবাদীদের যুদ্ধং দেহী মনোভাবকেই প্রত্যাখান করেন না; উপরন্তু তিনি সেই মনোভাবকে স্বয়ং জাইঅ্যানবাদী স্বার্থের পক্ষে পরিশেষে আত্মঘাতী হবে বলে মনে করেন। হারকাবীর এই অভিমতের সঙ্গে অন্যান্য ইহুদী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা পুরোপুরি একমত নন। হারকাবী, এ ব্যাপারে, তাদের চাইতে অনেক বেশী প্রয়োজনবাদী ও বাস্তববাদী। বিশেষ করে, তাঁর শান্তির জন্য ভূমির প্রস্তাব আরবদের জন্য একটা আশার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যে কোন স্থানেই হোক, মানবজাতির মধ্যে বৈষম্য ও বিভক্তি সৃষ্টির যে কোন প্রচেষ্টা, কিছু লোকের জন্য ক্ষণস্থায়ী কিছু সুবিধা বয়ে আনলেও, পরিণামে তা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই অকল্যাণ বয়ে আনতে বাধ্য। সমসাময়িক এই পরিস্থিতির জন্য ইসলামের বাণী অত্যন্ত ইতিবাচক, এবং ইসলাম এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

ইসলাম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জাতি-ভেদ প্রথা এবং শ্রেণী বিদ্বেষের নিন্দা করে। যে কোন ভাবেই ফিৎনা সৃষ্টিকে ঘৃণা করে। এ বিষয়ে কোরআন করীমের বহু আয়াতের মধ্য থেকে কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। ইসলামের পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি (সাঃ)-

"আল্লাহ্‌র আলো যা না প্রাচ্যের, না প্রতীচ্যের

অর্থাৎ তাঁর মধ্যে উভয়েরই অংশ সমান সমান।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ
اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ
لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ
نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ
لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

"আল্লাহ্ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর আলো। তাঁর আলোর উপমা হলো একটি তাক সদৃশ, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, সেই প্রদীপটি আছে একটি গোলাকার কাঁচের চিমনীর ভিতরে, সেই কাঁচের চিমনীটি এমনই দীপ্তিমান যেন সেটি একটি উজ্জ্বল তারকা। সেটি (প্রদীপটি) এক এমন বরকতপূর্ণবৃক্ষের (তেল) দ্বারা প্রজ্জ্বলিত, যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয় (বরং, তা সারা বিশ্বের), এর তেল এমন যে, তা যেন এক্ষণই (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) জ্বলে উঠবে, আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও। আলোর উপরে আলো। আল্লাহ্ যাকে চান (তাকে) নিজের আলোর দিকে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্ মানবজাতির জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ"। (আন্ নূর- ২৪ঃ৩৬)

তাঁর (সাঃ) সম্পর্কে আরও বলা হয়েছেঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝١٠٧

"আমরা তোমাকে সমগ্র বিশ্বের (এবং সমগ্র মানবজাতির) জন্য রহমত (এবং আশিস ও কল্যাণসমূহের উপায়) স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (আল্ আম্বিয়া-২১ঃ১০৮)

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই এই দেখে যে, অনেক মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন মুসলিম উলেমা, যাদেরকে ভুল করে বলা হয় 'মৌলবাদী', তারা এই মত সমর্থন করেন যে, মুসলমানদেরকে অবশ্য অবশ্যই অমুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে, এবং যতদিন না তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, কিংবা ইসলাম কবুল করে, ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ সম্পর্কে এই যে বিকৃত ও কলুষিত ধারণা, তার সঙ্গে, পবিত্র কোরআন বর্ণিত ইসলামের সামান্যতম সংশ্রবও নেই। এ বিষয়ে বহু আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় শান্তি সম্পর্কিত আলোচনায়। সুতরাং, এখানে তার পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। (দ্রঃ 'আন্তঃধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি')। পরিশেষে আমি আবারও একবার দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, ইসলাম বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে যাতে সত্যিকার ভাবেই মানবজাতিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে একত্রিত করা সম্ভব।

এ ব্যাপারে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সাঃ)-এর যে দৃষ্টিভঙ্গী তা তাঁর (সাঃ) সর্বশেষ ভাষণ, যা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে খ্যাত এবং যা তিনি দিয়েছিলেন তাঁর জীবনের সর্ববিশাল সেই জনতার সম্মুখে, তা থেকে আমি কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি, এবং তা-ই যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হবে এ ব্যাপারেঃ

"হে মানবমণ্ডলী ! আমার কথা কান দিয়ে শোন। কেননা, আমি জানি না যে, আমি পুনরায় এই উপত্যকায় তোমাদের সামনে উপস্থিত হতে পারবো কি না, এবং আজকের মত তোমাদের সামনে খুৎবা দিতে পারবো কিনা। আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের জীবন এবং তোমাদের সম্পত্তিকে একে অপরের আক্রমণ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত পবিত্র করা হয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যেকের জন্য উত্তরাধিকারের অংশ অক্ষুণ্ন রেখেছেন। কারো আইনসম্মত উত্তরাধিকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন দলীল-প্রমাণ কার্যকর হবে না। কোন ঘরে জন্ম গ্রহণকারী শিশুকে সেই ঘরের পিতার সন্তান বলেই গণ্য করা হবে। এইরূপ সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে, সে ইসলামী আইন মোতাবেক শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেউ যদি সেই শিশুর জন্মকে অন্য কারো প্রতি

আরোপ করে, অথবা কেউ যদি তার মালিক হওয়ার মিথ্যা দাবী করে, তাহলে তার উপরে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাবৃন্দ এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ বর্ষিত হবে।

হে মানবমণ্ডলী। তোমাদের স্ত্রীদের উপরে তোমাদের কিছু অধিকার আছে, কিন্তু তোমাদের স্ত্রীদেরও কিছু অধিকার আছে তোমাদের উপরে। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তারা সতীত্ব বজায় রেখে জীবন যাপন করবে। এবং এমন কোন পন্থা অবলম্বন করবে না, যা মানুষের সামনে তাদের স্বামীদের জন্য অসম্মানজনক হয়। ..... যদি তোমাদের স্ত্রীদের আচরণ এমন না হয় যে, তা স্বামীদের জন্য অসম্মান বয়ে আনে, তাহলে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তোমাদের জীবনের মান অনুযায়ী তাদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করা। মনে রেখো তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তোমাদের উপরে ন্যস্ত করেছেন। স্ত্রী লোকেরা দুর্বল, এবং তারা নিজেরা তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারে না। যখন তোমরা বিয়ে কর তখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে ঐ সব অধিকারের আমানতদার নিয়োজিত করেন। তোমরা তোমাদের ঘরে তোমাদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে আস আল্লাহ্র আইনের আওতায়। সুতরাং, তোমরা কোনক্রমেই সেই আমানতের খেয়ানত করবে না, যা আল্লাহ্ সোপর্দ করেছেন তোমাদের হাতে।

হে মানবমণ্ডলী! এখনও তোমাদের হাতে কিছু যুদ্ধবন্দী রয়ে গেছে। অতএব, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তাদেরকে খেতে দাও এবং পরতে দাও ঠিক তা-ই, সেইভাবে এবং সেই স্টাইলে, যে-ভাবে এবং যে স্টাইলে তোমরা নিজেরা খাও এবং পর। তারা যদি এমন কোন অপরাধ করেই বসে, যা তোমরা ক্ষমা করতে পার না, তাহলে তাদেরকে অন্য কারো কাছে দিয়ে দাও। তারা আল্লাহ্রই সৃষ্টির অংশ। তাদেরকে দুঃখকষ্ট দেওয়া অথবা নির্যাতন করা কোনক্রমেই উচিত নয়।

হে মানবমণ্ডলী! তোমাদেরকে আমি যা যা বলছি তা সবই তোমরা শোন এবং মনে রেখো। সকল মুসলমান একে অপরের ভাই। তোমরা সকলেই পরস্পর সমান। সকল মানুষ সমান, তা তারা যে কোন জাতি বা গোত্রেরই হোক না কেন, এবং জীবনের যে কোন অবস্থানেই অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন। [এই পর্যায়ে তিনি (সাঃ) তাঁর দুহাত তুলে এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলির সঙ্গে মিলায়ে নেন এবং বলেন] দু'হাতের আঙ্গুলগুলো যেমন পরস্পর সমান তেমনি সব মানুষেরাও একে অপরের সমান। তোমরা পরস্পর ভাই ভাই।

হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের আল্লাহ্ এক। এবং তোমাদের পূর্বপুরুষও এক। একজন আরবের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই একজন অনারবের উপরে; একজন অনারবেরও কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই একজন আরবের উপরে। একজন সাদা-মানুষ কোনভাবেই একজন

কালো-মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠ নয়; তবে, এই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবে, কে কীভাবে আল্লাহ্ ও মানুষের প্রতি তার কর্তব্য সমাপন করেছে, তারই ভিত্তিতে। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মপরায়ণ বা মুত্তাকী।

এই মাস যেমন পবিত্র, এই যমীন যেমন অলংঘনীয়, এই দিন যেমন পবিত্র, তেমনি আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতকে পবিত্র করেছেন। কোন মানুষের জীবন নাশ করা, সম্পত্তি লুণ্ঠন করা, অথবা সম্মানের উপরে আক্রমণ করা ঠিক তত বড় অন্যায় ও অপরাধ, যত বড় অন্যায় ও অপরাধ এই দিন, এই মাস ও এই যমীনের পবিত্রতা লংঘন করা। আজ আমি তোমাদেরকে যে আদেশ-উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, তা শুধু আজকের জন্যই নয়, তা সর্বকালের জন্য। আমি তোমাদের কাছে আশা রাখি যে, এই সকল আদেশ-উপদেশ তোমরা মনে রাখবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে এই জগৎ ছেড়ে পরজগতে তোমাদের স্রষ্টার সমীপে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

আমি তোমাদের কাছে যা বলে গেলাম, তা তোমরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছায়ে দিবে,হতে পারে, যারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না, তারাই এর দ্বারা অধিকতর উপকৃত হবে যারা শুনছে তাদের চাইতে। (সিয়াহ সেত্তা, তাবারী হিশাম, খামীস ও বায়হাকী)

এই বাণী অতীব শক্তিশালী, স্বতঃসিদ্ধ। তবে, বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আমরা সবাই একই পিতার সন্তান। এই বাণী বস্তুতঃ, এই অবিসংবাদিত গূঢ়ার্থই বহন করে যে, একই পিতৃত্ব থেকে উদ্ভূত মানবজাতির সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে কোনক্রমেই বিভিন্ন ধর্মের নামে বিভক্ত হতে দেওয়া যায় না।

আর্থ-সামাজিক শান্তি

(১) সূচনা

(২) অর্থনৈতিক সুবিচার

(৩) সৎকাজে ব্যয়ঃ অনটনের সময়েও

(৪) গরীবদের জন্য ব্যয়

(৫) কৃতজ্ঞতা

(৬) দান ও অনুগ্রহ করার জন্য মানবীয় প্রতিদান নেই

(৭) ভিক্ষাবৃত্তি

(৮) দান বা সাদকার দ্রব্যাদি

(৯) দান প্রকাশ্যে এবং গোপনে

(১০) সামাজিক দায়িত্বাবলী

(১১) ব্যয়ের বর্ধিত সীমানা

(১২) প্রাথমিক ইসলাম থেকে একটি দৃষ্টান্ত

(১৩) অপরের সেবা

(১৪) মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

"এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য, এবং তাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায়, যার উপরে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে তা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। এবং যদি তার উপরে প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয় তাহলে, অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট এবং তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।" (আল্ বাকারা-২ঃ২৬৬)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝

"মানুষের নিকট কামনার বস্তুগুলির যথা, রমণীগণের, সন্তান-সন্ততির, স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বসমূহের, গৃহপালিত পশুপালের এবং শস্যক্ষেত্রের প্রতি আসক্তিকে মনোহর করে দেখানো হয়েছে। এগুলি সব পার্থিব জীবনের ভোগ্য-সামগ্রী, কিন্তু আল্লাহ্ তিনি, যাঁর নিকট রয়েছে উত্তম আবাসস্থল।" (আলে ইমরান-৩ঃ১৫)

সূচনা

ইসলামের দেওয়ার মত উপদেশ আছে সেই সব ক্ষেত্রের জন্যেও যে সব ক্ষেত্রে সমাজ ও অর্থনীতির দিগন্তগুলো পরস্পর মিলিত হয়েছে। এই সমস্ত উপদেশ বা শিক্ষা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে, আমাদের প্রতিটি সকাল ও সন্ধ্যার গোধূলির আলো অপূর্ব সুন্দরতায় মণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অর্থনৈতিক সুবিচার- পুঁজিবাদে, সমাজবাদে এবং ইসলামে

অর্থনৈতিক সুবিচার একটি চমৎকার শ্লোগান। বিষয়টাকে যেহেতু, অন্যান্য সবাইকে বাদ রেখে, একচেটিয়া করে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালান হয়, সেহেতু এই শ্লোগানটি মুক্ত বাজার অর্থনীতির পুঁজিবাদী সমাজেও যেমন, তেমনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক সামাজিক মতবাদেও সমভাবেই উচ্চারিত হয়ঃ উভয়পক্ষই সুবিচারের কথা বলে। কিন্তু আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এই আশঙ্কা ব্যক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এতে উভয়পক্ষই 'অর্থনৈতিক সুবিচার'-এর সোনালী নীতির প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু, কথা অনেক আছে, পরে বলছি।

নিরংকুশ সুবিচার-এর যে ইসলামী ধারণা বা কনসেপ্ট তা সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক। ইসলামী শিক্ষার সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। তবু এটাও সবটা নয়। ইসলাম আরও এক ধাপ এগিয়ে চলে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে অর্থনীতির যমীনটাকে এমন সম্পূর্ণরূপে ও সুন্দররূপে সমান করার চেষ্টা করা হয় যেন উচুঁ-নীচু বলতে আর কিছু বাকী না থাকে। পানি সেঁচলে যেন সমস্ত যমীনটাই সমানভাবে সিক্ত হতে পারে। অতএব, গরীবদের তরফ থেকে কোন প্রকার দাবীদাওয়ার প্রশ্ন যেমন নেই, তেমনি ধনীদেরও কোন ভয় নেই সমাজের কম ভাগ্যবান লোকদের দ্বারা তাদের 'উদ্বৃত্ত সম্পদ' জবরদস্তি লুণ্ঠিত হওয়ার।

পুঁজিবাদী সমাজে কথা আরও বাড়িয়ে বলা হয়ঃ বলা হয় সমান সুবিধার কথা, সকল খেলার জন্যই সমতল মাঠের কথা এবং সম্পদের সম-বিতরণের চাইতে মুক্ত অর্থনীতির কথা। সুতরাং, সেখানে অধিকার আদায়ের জন্য দাবী উত্থাপনের সুযোগ আছে, আছে চাপ-প্রয়োগকারী গোষ্ঠী বা প্রেশার গ্রুপ, যেমন ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি, গঠনেরও অবকাশ। এরা সরকার বা পুঁজিপতিদের কাছে দাবী জানায় দাবী জানায় সেই সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য যারা জীবনভর একটা বঞ্চনার বোধ নিয়েই কালাতিপাত করে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র যদি তাদের আদর্শ মোতাবেক রূপায়িত হয় তাহলে, সমাজের কোন অংশেরই কোন দাবী উত্থাপনের প্রয়োজন হবে না; তা সেই সমাজ চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় সম্পদের সম-বন্টনের পক্ষে যথেষ্ট ধনী হোক, কিংবা দরিদ্র হওয়ার কারণে চাহিদা মেটাতে অক্ষম হওয়ার দরুন অভাব-অনটনকেই সকলের মধ্যে সম-বন্টন করে নিক। এইরূপ সমাজ অবশেষে এমন একটা অবস্থায় পর্যবসিত হয়ে যাবে, যখন সেখানে আর দাবী-দাওয়ার পক্ষে কোন অর্থবহ ভূমিকাই থাকবে না পালন করার জন্য।

অপরপক্ষে, পুঁজিবাদী পদ্ধতিটা হচ্ছে দাবী-ভিত্তিক। এক্ষেত্রে, সমাজের কম ভাগ্যবান অংশকে তার অসন্তোষ প্রকাশের অধিকার দিতে হবে এবং শুনানীরও অবাধ সুযোগ দিতে হবে। অতএব, এমনটি হলে তো আর প্রয়োজন পড়বে না কোন প্রেশার গ্রুপ গঠনেরও এবং ধর্মঘট, হরতাল, লক-আউট ইত্যাদিরও।

ইসলাম এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলে, যাতে সরকারগুলোকে এবং বিত্তবানদেরকে বার বার মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, তাদের নিজেদের স্বার্থেই তাদেরকে একটি সুষম অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদেরকে বারবার এই উপদেশও মেনে চলতে বলা হয়েছে যে, তারা যেন অন্যান্যদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে। দুর্বল ও দরিদ্রকে যেন তাদের মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার থেকে কখনোই বঞ্চিত রাখা না হয়। তাদের প্রত্যেকের পেশা পসন্দ করবার স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধার সমান প্রাপ্যতা, এবং জীবনধারণের মৌলিক সকল চাহিদা পূরণের অধিকার থাকতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবেই মানবেতিহাসে ইতোমধ্যেই উত্তরণের জন্য সংগ্রামের পথে বহু দুঃখ-বেদনা এবং বিশৃংখলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই, ইসলামে 'নেওয়ার' বা 'রাখার' চাইতে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে 'দেওয়ার' উপরে। সরকারগুলোকে এবং বিত্তশালীদেরকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সমাজে যেন এমন কোন অংশ থেকে না যায়, যারা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবার মৌলিক মানবাধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত। একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রকে তার প্রয়োজন কি, তা জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং তা পূরণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। দুঃখ-যন্ত্রণার আর্তনাদ প্রতিবাদে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বেই এবং প্রয়োজন বা চাহিদার কারণে শান্তি ও শৃংখলা নষ্ট হওয়ার পূর্বেই দুঃখ-যন্ত্রণার কারণসমূহ দূরীভূত করতে হবে এবং প্রয়োজনসমূহ মেটাতে হবে।

বাহ্যতঃ, এক্ষেত্রে, ইসলামী ও সমাজবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো একই রকম মনে হবে। কিন্তু , আসলে, এই সাদৃশ্যটা মাত্র ভাসা-ভাসা। ইসলাম তার লক্ষ্য অর্জন করে ঠিকই, কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মত জবরদস্তির পন্থায় নয়।

হাতে সময় থাকলে আমি বিষয়টা বিশদভাবে পেশ করতে পারতাম এবং বলতে পারতাম যে, কীভাবে ইসলাম এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। তবু আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, এই বিষয়টার ক্ষেত্রে ইসলাম যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তা প্রাণহীনও নয়, যান্ত্রিকও নয়; যেমনটা অবলম্বন করে থাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন। বস্তুতঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গূঢ় নিয়মাবলীর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অন্য আর সবকিছুর মধ্যে ইসলাম এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে যেখানে একজনের ব্যক্তিগত অধিকারের দাবী অন্যান্যদেরও অধিকার বিবেচনা করার সুযোগ করে দেয়। নিজ সমাজের লোকদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সচেতনতার এবং অনুভূতি প্রবণতার লেভেল এমন এক স্তরে উন্নীত হয় যখন সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের সকল সদস্যই বেশী উদ্‌গ্রীব থাকে একটা ব্যাপারে এবং তা হচ্ছে, সমাজ তাদেরকে যতটা দিচ্ছে তারও চেয়ে বেশী তারা সমাজকে দিতে পারছে কি না।

'শ্রমিককে তার পাওনার চেয়ে বেশী দাও' -এই নির্দেশ বারংবার দিয়ে গেছেন হযরত রসূলে পাক (সাঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে (রাঃ), তাঁর অনুসারীদেরকে। *'শ্রমিককে তার শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার পাওনা মিটিয়ে দাও। যারা তোমাদের অধীনে কাজ করে তাদের উপরে এমন কাজের বোঝা চাপিও না যা তোমরা নিজেরা বইতে পারবে না। যতদূর সম্ভব, তোমাদের ভৃত্যদেরকে তা-ই খেতে দাও যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাওয়াও। তাদেরকে একই পোষাক পরতে দাও। কোনক্রমেই ভদ্রতা ও শালীনতার সীমা লংঘন করো না। অন্যথায়, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সমীপে জবাবদিহি হতে হবে। তোমরা পাছে মিথ্যা গর্বে গর্বিত হও, এজন্যে ভৃত্যদেরকে নিয়ে একই টেবিলে বসো এবং এক সাথে খানাপিনা কর।'* -*(হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী থেকে)*।

সৎকাজে ব্যয়ঃ অনটনের সময়েও

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবীয় মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে অত্যন্ত জোরালো ভাষায়। গরীবদের চাহিদার নির্ধারিত নীতিমালার কথা এবং তা কী করে বাস্তবায়িত করতে হবে, তারও কথা বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ

وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝

"যারা খরচ করে সচ্ছলতায় এবং অসচ্ছলতায়ও, এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।" (আলে ইমরান-৩ঃ১৩৫)

গরীবদের জন্য ব্যয়

ভিক্ষার যে ধারণাটা সাধারণভাবে দুনিয়ার সবাই বুঝে থাকেন তা দুধারি। এতে একদিকে যেমন, ভিক্ষাদাতার মহৎ গুণের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়, তেমনি অপরদিকে, ভিক্ষাগ্রহীতার একটা অমর্যাদাকর না হলেও, বিব্রতকর চেহারা ফুটে ওঠে। কেননা, ভিক্ষাগ্রহণটাই তার মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। ইসলাম এই কন্‌সেপ্ট বা ধারণার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে।

কেন যে কিছু লোক গরীব এবং কিছু লোক ধনী, তার একটা আকর্ষণীয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে কোরআন করীমের এই আয়াতেঃ

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۝

"বস্তুতঃ, তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে (একটা অংশের উপরে) অধিকার রয়েছে তাদেরও যারা সাহায্য প্রার্থনা করে (ভিক্ষুকরা) এবং তাদেরও যারা প্রার্থনা করতে পারে না (গরীবরা)।" (আয্ যারিয়াত-৫১ঃ২০)

এই আয়াতের অনুধাবনে যে বিষয়টা, সাধারণতঃ, এড়িয়ে যাওয়া হয়, তা হচ্ছে 'হক্' (আক্ষ. অধিকার) শব্দটির প্রযোগ সম্পর্কিত। এই শব্দটি দ্বারা এখানে, একই সঙ্গে, ভিক্ষাদাতা ও ভিক্ষাগ্রহীতা– উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বহু কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। দাতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সে গরীবকে যা দান করছে, তা আসলে, তার নিজের মালিকানাভুক্ত নয়।

যে কোনও অর্থনীতির পক্ষে এটা নিতান্ত অন্যায় যে, সেখানে কিছু লোককে নিঃস্ব অবস্থায় পরিত্যাগ করা হবে, এবং তারা তাদের জীবিকার জন্য বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে। একটা সুস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেউ নিঃস্ব থাকতে পারে না, বেঁচে থাকার তাগিদে ভিক্ষার জন্য হাত পাততে পারে না। ভিক্ষা গ্রহীতাকেও এই বাণী শোনানো হচ্ছে যে, তার পক্ষে বিব্রত বোধ করার কিছু নেই, কিংবা হীন মন্যতায় ভোগারও কিছু নেই। কেননা, প্রকৃত প্রস্তাবে, আল্লাহ্ই তাকে সুন্দরভাবে ও সসম্মানে

বেঁচে থাকবার মৌলিক অধিকার দিয়েছেন। অতএব, দৃশ্যতঃ, দাতা তোমাকে যা কিছু দান করছে তার মধ্যে তোমার নিজেরও অধিকার বা মালিকানা আছে, যদিও তা কোন না কোনভাবে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে দাতার হাতে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র শিক্ষা সরাসরি মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কখনও কোন নির্দেশের ভারসাম্য যদি কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায় তবে, সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার প্রতিবিধান করতে হবে।

কৃতজ্ঞতা

উপরে যে বিষয়টি আলোচিত হলো, তার মধ্যে অবশ্য, এই আশঙ্কা নিহিত রয়েছে যে, এতে করে কিছু লোক তাদের উপকারীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকতে পারে। তারা অন্যদের কাছ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ কিছু লাভ করে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে এই বলে বিষয়টি চুকে ফেলতে চাইবে যে, আমাদেরকে যা কিছু দান করা হয়, তা তো আমাদেরই অধিকারভুক্ত। কাজেই, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কোনও দরকার নেই আমাদের। এই মনোভাবটা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে তাতে শিষ্টাচার ও শালীন আচরণ নষ্ট হয়ে যাবে।

দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি তাকিয়ে পবিত্র কোরআন বার বার তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, সে যেন কৃতজ্ঞ থাকে, এবং সে যেন তার প্রতি সামান্যতম কৃপার জন্যেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার কর্তব্য। মুমিনদেরকে বার বার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ অকৃতজ্ঞদেরকে ভালবাসেন না। যেমন,

إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ
وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ
رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ
عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۝

"যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের আদৌ মুখাপেক্ষী নন, এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতাকে পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর তাহলে তিনি তা তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে

তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের বক্ষঃস্থলে নিহিত সব বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবগত।" (আল্ যুমার -৩৯ঃ৮)

কৃতজ্ঞ আচরণের প্রতি জোর দিতে গিয়ে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা রসূলে করীম (সাঃ) মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেনঃ

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

"যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।"

এই কথাটির ভেতরের কথা হচ্ছেঃ কোন ব্যক্তি যদি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয় তাহলে, সে খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হলেও খোদা তার কৃতজ্ঞতা কবুল করবেন না। সুতরাং, শালীনতা, শিষ্টাচার, সৌজন্য এবং কৃতজ্ঞতাকে পবিত্র কোরআনের বাণীতে নিরুৎসাহিত করা হয় নি। এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে পূর্বোক্ত আয়াতে -(৩৯ঃ৮)। এটা তো দানগ্রহীতার প্রতি একটি যথোপযুক্ত উপদেশ বাণী যে, সে যেন দান গ্রহণ করার কারণে কোন প্রকার হীনমন্যতায় না ভুগে কিংবা তার সম্মানহানি ঘটেছে বলে মনোক্ষুণ্ন না হয়। এখানে যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছেঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটা মানুষের জন্য সম্মান হানিকর কিছু নয়, বরং এতে সম্মান বৃদ্ধিই পায়। দাতাদেরকে লক্ষ্য করে ইসলাম একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছে। মনে করা হয় যে, কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য হলেও তা গ্রহণ করাটা মর্যাদা ও ভদ্রতার পরিপন্থী। এই মনোভাবটা ইদানিং সভ্য আচরণের একটা অংশ বলে বিবেচিত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্রই। কিন্তু, এই সার্বজনীন আচরণবোধটার সঙ্গে ইসলামী মহৎ আচরণের শিক্ষার একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম দাতাব্যক্তিকে এই নির্দেশ দান করে যে, সে যেন শুধু তার স্বভাবজ প্রবৃত্তির তাগিদে বা সুনাম অর্জনের খাতিরে দানশীলতা না দেখায়, বরং সে যেন দান করে আরও বেশী উন্নত ও মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ইসলাম মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে যেন শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সৎকাজ করে, সে যেন সৎকাজ করে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর কৃপাভাজন হওয়ার উদ্দেশ্যে।

এথেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যখন কোন খাঁটি মুসলমান প্রয়োজনে কোন কিছু দান করে, তখন সে আসলে তা করে, না তার নিজের খাতিরে, না অন্য কারো খাতিরে বরং সে তা করে তার স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে, যে স্রষ্টাই মুলতঃ তাকে দান করেছেন তার সব কিছুই।

এই নীতির আলোকে দেখলে দেখা যাবে যে, সে অন্যদের জন্যে যা কিছু খরচ করে, তা সে করে তার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে,

অপরের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয়। এই অতি মহীয়ান দৃষ্টিভঙ্গীর শিকড় প্রোথিত রয়েছে কোরআন করীমের একটি প্রাথমিক আয়াতে। এই আয়াত মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝

"এবং আমরা তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা থেকে (তারা) খরচ করে (আমাদের পথে)।" (আল্ বাকারা -২ঃ৪)

সুতরাং, শুধু সৌজন্য প্রদর্শনের খাতিরেই কোন খাঁটি মুমিন কৃতজ্ঞতা প্রত্যাখ্যান করে না, বরং এটা সে সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করে যে, গ্রহীতা যদি তার গৃহীত দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়, তবে তা তার করা উচিত একমাত্র খোদাতা'লার কাছে, অন্যের কাছে নয়। খাঁটি মুমিন যারা, যারা ঈমানের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে, তারা দারুণ বিব্রত বোধ করে যখন তাদের দানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেঃ

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۝

"এবং তারা তাঁরই প্রেমে মিসকীন, এতীম এবং বন্দীকে আহার করায়, (এবং তাদেরকে বলে) আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহার করাই, আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না।" (আদ্ দাহর-৭৬ঃ৯,১০)

মানুষকে শুধু আহার করানোটাই যথেষ্ট নয়। বরং তাদেরকে আহার করানো উচিত এই উপলব্ধি থেকে যে, তোমরা যারা আহার করাও তারা নিজেরাও ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা যে কী , তা বুঝ, এবং তোমরাও তাদের সেই কষ্টেরই অংশীদার; এবং সে কারণেই তোমরা না কোন প্রতিদানের আশা রাখ, না কোন ধন্যবাদের।

এই আয়াতের সৌন্দর্য তো চোখ-ঝল্‌সানো। মুমিনদেরকে যদি শুধু এতটুকুই শেখানো হতো যে, তারা যেন কৃতজ্ঞতা প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে একটা বাহ্যিক সদয় ও সুপ্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শন করে এবং বিনয়ী মানুষের মত ব্যবহার করে, তাহলে তো সেক্ষেত্রে ভণ্ডামী বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থেকে যেত। কেননা, আমরা যখন বলি 'না, না,

ধন্যবাদের দরকার নেই' তখনও বস্তুতঃ, এ ব্যাপারে আমরা সচেতন থাকি যে, এতে করে আমাদের ভাবমূর্তি দান গ্রহীতার কাছে বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

ইসলামের শিক্ষা আরও বেশী মহীয়ান, আরও বেশী গরীয়ান, দাতাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সে তার পণ্য দু'বার দুটো পার্টির কাছে বিক্রী করতে পারে না। কেননা, একটা সৎকাজ, হয় খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা যায়, নয়তো মানুষের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার জন্যে। এই উভয় উদ্দেশ্য, এই আয়াত অনুসারে, একই সঙ্গে সাধিত হতে পারে না।

যখন খোদাতা'লার কোন প্রকৃত বান্দা কোনও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলে যে, তার দানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জন; তখন সে তাকে সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্ই হচ্ছেন আসল দাতা। ফলে, দান গ্রহীতার মনে কোন হীনমন্যতার সৃষ্টি হলেও তা অপসৃত হয়ে যায়।

দান ও অনুগ্রহ করার জন্য মানবীয় প্রতিদান নেই

ইসলামের মতে শিষ্টাচার এমন কোনও ভাসাভাসা অভ্যাস নয় যা সভ্যতার মূল্যবোধ থেকে আহৃত, বরং তার মূল গভীরভাবে প্রোথিত আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের মধ্যে। গরীব মিস্কীনদেরকে যা কিছু দান করা হয়, তা যেন এই উদ্দেশ্যে করা না হয় যে, তার বিনিময়ে অবশেষে দান গ্রহীতার কাছ থেকে কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে।

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝

"এবং তুমি এইজন্য দান করো না যেন (বিনিময়ে) অধিক পাও।" (আল্ মুদ্দাস্সের-৭৪ঃ৭)

একবার কাউকে কোন কৃপা করা হলে, ইসলাম চায় যে, কৃপাকারী যেন তা এমনভাবে ভুলে যায় যে, যেন কিছুই ঘটেনি। কারও পক্ষে তার কোন সৎকাজের জন্য উল্লাস প্রকাশ করাকে এবং কারো প্রতি কৃপা প্রদর্শনের জন্য খোঁটা দেওয়াকে সেই সৎকর্মের পক্ষে আত্মঘাতী এবং আত্ম-উৎখাতকারী বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অপর পক্ষে, একজন খাঁটি মুমিন যে ব্যবহার করে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে। এই সকল আয়াতে সঠিক ও বেঠিক ব্যবহারের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে বিশদভাবেঃ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ
لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ
فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ
أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ۝
قَوۡلٞ مَّعۡرُوفٞ وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٞ مِّن صَدَقَةٖ يَتۡبَعُهَآ
أَذٗىۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٞ ۝ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ
صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ
وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ
تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ
شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ۝

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায় যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ'টি করে শস্যদানা থাকে। এবং আল্লাহ্ যার জন্য চান (আরও বেশী) বৃদ্ধি করে দেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, অতঃপর, তারা যা খরচ করে তার সম্বন্ধে পিছনে খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে বেড়ায় না; তাদের জন্য তাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ন্যায়সঙ্গত কথা এবং ক্ষমা সেই দান থেকে উত্তম যার পরে কষ্ট-ক্লেশ আরম্ভ হয়ে যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ এশ্বর্যশালী, পরম সহিষ্ণু। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দানের খোঁটা দিয়ে নিজেদের দানসমূহকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিও না, তার উপমা সেই মসৃণ-শক্ত পাথরের অবস্থার ন্যায় যার উপরে সামান্য মাটি পড়ে থাকে, অতঃপর, তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং সেটাকে পরিষ্কার কঠিন প্রস্তররূপেই রেখে যায়। তারা যা কিছু উপার্জন করে তার কোন অংশই তারা রক্ষা করতে পারে না। বস্তুতঃ, অবিশ্বাসী জাতিকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেন না।" (আল্ বাকারা -২ঃ২৬২-২৬৫)

একই ভাবে ঃ

وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

"এবং যে কোন প্রার্থীই হোক তুমি তাকে তিরস্কার করো না। (আল্ যোহা – ৯৩ ঃ ১১)

ভিক্ষাবৃত্তি

এমনকি, ভিক্ষুকদের প্রতিও শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করতে হবে। কোন ভিক্ষুকের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলবে না। যদিও, ভিক্ষাবৃত্তিকে অপসন্দ করা হয়েছে, তবু নিতান্ত প্রয়োজনে ভিক্ষার অনুমতিও নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যারা বাধ্য হয়ে ভিক্ষা করে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হয় নি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে, ভিক্ষুকের আত্মসম্মান সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও, সমাজ সামগ্রিকভাবে এটা উপলব্ধি করতো যে , ভিক্ষা করার চাইতে ভিক্ষা না করাই নিঃসন্দেহে উত্তম। এই বিষয়টাকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার জন্য হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেনঃ

اليدالعليا خيرمن اليدالسفلى

'দাতার হাত গ্রহীতার হাত থেকে উত্তম।' -(হাদীস)

এর ফলে এমনও হতো যে, অনেক মুসলমান ভিক্ষা করে বেঁচে থাকার চাইতে দারিদ্র্যের কষাঘাতে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করতো। তাদেরকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য পবিত্র কোরআন গোটা সমাজকেই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের মাঝে এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম করে চলেছে, অথচ তাদের এমন কোন সঙ্গতি নেই যে,তারা দারিদ্রের কবল থেকে রক্ষা পায়ঃ

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ
لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ۝

"(উপর্যুক্ত দানসমূহ) ঐ অভাবীদের জন্য যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা ভূ-পৃষ্ঠে চলাফেরা করতে পারে না। (তারা সাহায্য) চাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে অজ্ঞ লোক তাদেরকে ধনী মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের চেহারার লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে; তারা মানুষের নিকট নাছোড়বান্দা হয়ে কিছু চায় না। এবং তোমরা ধন-সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ কর আল্লাহ্‌ নিশ্চয় তার সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।" (আল্‌ বাকারা- ২ঃ২৭৪)

এই নীতি আরও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ
دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝

"আল্লাহ্‌ তাঁর রসূলকে জনপদসমূহের অধিবাসীগণের নিকট থেকে বিনাযুদ্ধে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তা আল্লাহ্‌র জন্য, এবং রসূলের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, এতীমদের জন্য, মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফেরদের জন্য যেন তা তোমাদের মধ্য থেকে বিত্তশালীদের মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত না হয়। এবং রসূল তোমাদেরকে যা দান করে তা গ্রহণ কর, এবং যা তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে তোমরা বিরত থাক, এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শাস্তি প্রদানে অতীব কঠোর।" (আল্‌ হাশর-৫৯ঃ৮)

ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এই নীতির উল্লেখ করেছেন তাঁর এক বাণীতে। যে হাদীসের অংশ বিশেষ হচ্ছেঃ

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه عن حكيم بن حزام رضى الله عنه، عن النبي ﷺ قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول و خير الصدقة عن ظهر غنى. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله. وعن وهيب قال اخبرنا هشام عن أبيه، عن أبي هريرة رضى الله عنه بهذا...

".....হাকিম বিন হিজাম থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম (অর্থাৎ দাতা গ্রহীতার চাইতে উত্তম)। প্রত্যেকের শুরু করা উচিত স্বীয় পোষ্যদেরকে দান করার মাধ্যমে। উৎকৃষ্টতম দান বা সাদাকা হচ্ছে তাই যা কোন সম্পদশালী ব্যক্তি দান করে (তার ব্যয় নির্বাহের পর বাদবাকী সম্পদ থেকে)। যে ব্যক্তি অপরের কাছে আর্থিক সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকবে, তাকে আল্লাহ্ই দান করবেন, এবং তাকে অপরের কাছে হাত পাতা থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবেন .....।"

দান বা সেবার ক্ষেত্রে তো তোমার হাতই উপরে, অর্থাৎ তোমার উচিত দান করা এবং সেবা করা; দান গ্রহণ করা বা কৃপাপ্রার্থী হওয়া তোমার উচিত নয়।

দান বা সাদাকা'র দ্রব্যাদি

আপনি কীভাবে দান করছেন সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আপনি কি দান করছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এমন কিছু দান করেন যা গ্রহণ করতে গেলে আপনি নিজেই লজ্জিত বোধ করবেন, তা হলে তা আল্ কোরআনের দৃষ্টিতে দানের সংজ্ঞার মধ্যে পড়বে না। এটা হবে কোন কিছুকে ডাস্টবীনে নিক্ষেপ করার শামিল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ
أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ
وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ
حَمِيدٌ ۝

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু থেকে যা তোমরা উপার্জন কর, এবং তা থেকেও যা আমরা তোমাদের জন্য যমীন থেকে উৎপন্ন করি, এবং তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তুর সংকল্প করো না যা থেকে তোমরা খরচ কর বটে, কিন্তু তোমরা নিজেরা চক্ষু বন্ধ না করে আদৌ তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য।" (আল্ বাকারা-২ঃ২৬৮)

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ

"ওগুলোর মাংস ও ওগুলোর রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁর নিকটে তোমাদের তরফ থেকে তাক্‌ওয়া পৌঁছে।" (আল্ হাজ্জ্-২২ঃ৩৮)।

দানঃ প্রকাশ্যে এবং গোপনে

ইসলাম উভয় পন্থাই উন্মুক্ত রেখেছেঃ দান-খয়রাত প্রকাশ্যেও করা যাবে, গোপনেও। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা হচ্ছেঃ

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ
يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۝ إِن تُبْدُوا۟
ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ
وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

"এবং যা কিছু তোমরা খরচ কর অথবা যা কিছু তোমরা নযর-মানত কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন, এবং যালেমদের জন্য কোনও সাহায্যকারী হবে না। এবং যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকাহ্ কর, তাহলে তা-ও খুব ভাল এবং যদি তোমরা তা গোপনে দান কর এবং তা গরীবদেরকে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্য আরও বেশী ভাল, এবং তিনি (এজন্য) তোমাদের যাবতীয় অনিষ্ট তোমাদের নিকট থেকে দূরীভূত করে দিবেন। এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন।" (আল্ বাকারা - ২ঃ২৭১,২৭২)

সামাজিক দায়িত্বাবলী

ইসলামে এই বিষয়টাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত যে, কর্তৃপক্ষ যারা তাদেরকে অবশ্যই জনগণের খেদমতের ব্যাপারে সংবেদনশীল থাকতে হবে, যাতে করে কোন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা প্রেশারগ্রুপ গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেয়।

পবিত্র কোরআনের মতে, শাসক তার অধীনস্থ বা তার এখতিয়ারভুক্ত লোকদের অবস্থার জন্য দায়ী হবে, এবং তাকে সেজন্য খোদাতা'লার কাছে জবাবদিহি হতে হবে। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সাঃ) একটি হাদীসে আমরা দেখতে পাইঃ

كلكم راعٍ و كلكم مسـول عن رعيته

'তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন এমন মেষপালক যে, মেষপালটি যার মালিকানাধীন নয়। (তবু সে মেষপালটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী)। তাকে জবাবদিহি হতে হবে।'

এই হাদীসে মানবীয় সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব পালনের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন, মনিব ভৃত্যের জন্য দায়ী, মা (যিনি গৃহকর্ত্রী), পিতা (যিনি পরিবার-প্রধান) উভয়েই গোটা পরিবারের জন্য দায়ী; নিয়োগকর্তা তার কর্মচারীদের জন্য দায়ী, ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বার বার করে বলেছেনঃ

'মনে রেখো! এজন্য তোমাকেই দায়ী করা হবে,

এবং তোমাকে জবাবদিহি হতে হবে।'

একটি দৃষ্টান্তঃ প্রাথমিক ইসলাম থেকে

একদা ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এক রাতে মদীনার শহরতলীর একটা গলিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা তাঁর একটা রীতি ছিল যে, তিনি ছদ্মবেশে অলি গলিতে ঘুরতেন এবং স্বচক্ষে দেখতেন যে, তাঁর শাসনাধীনে জনসাধারণ কীভাবে দিন কাটাচ্ছে। ঐ গলিপথে চলতে চলতে তিনি শুনতে পেলেন যে, একটা বাড়ীর মধ্যে ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করছে এবং মনে হচ্ছে যেন তারা দারুণ কোন কষ্টে পড়েছে। তিনি খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন যে, গোটা তিনেক ছেলেমেয়ে একটা চুলোর পাশে বসে আছে, চুলোটাতে আগুন জ্বলছে এবং তার উপরে একটা কেটলী জাতীয় পাত্রে কি যেন চাপানো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এবং ঐ ছেলে মেয়েদের মা-ও বসে আছেন তাদের সাথে ঐ জ্বলন্ত চুলোটার পাশেই। তিনি জানতে চাইলেন ব্যাপার কি, কি হয়েছে? মহিলাটি বললেন, *'ছেলে মেয়েগুলো ক্ষুধার্ত। তাদেরকে খেতে দেওয়ার মত আমার কাছে কিছু নেই। তাই, আমি এই পাত্রটির মধ্যে কিছু পাথরের নুড়ী ও পানি দিয়ে জ্বাল দিচ্ছি এবং ওদেরকে বুঝ দিচ্ছি যে, একটু সবুর কর, এই খাবার হয়ে গেল বলে। ব্যাপারটা এটাই যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।'*

গভীর মর্মবেদনায় এবং উৎকণ্ঠায় হযরত উমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁর সরকারী দপ্তরে ফিরে এলেন। তিনি খাদ্য গুদাম থেকে একটা বস্তা ভর্তি করে আটা, মাখন,

মাংস, খেজুর ইত্যাদি নিলেন। তিনি একজন দাসকে বললেন বস্তাটা তাঁর (রাঃ) পিঠের উপর তুলে দিতে। দাস লোকটি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উমরকে (রাঃ) বললেন, 'আপনি কেন বস্তাটা নিজে পিঠে করে নিয়ে যাবেন, আমিই তো আছি, আমিই তো পারি এটা বয়ে নিতে'। উত্তরে আমীরুল মুমেনীন উমর (রাঃ) বললেন, *'সন্দেহ নেই, তুমি আজ আমার জন্যে এই বোঝা বইতে পারবে, কিন্তু কেয়ামতের দিন কে বইবে আমার বোঝা?'* তিনি (রাঃ) যা বলতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে, তিনি তাঁর প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব কীভাবে পালন করেছিলেন, তার জবাব তো তাঁর পক্ষে শেষ বিচারের দিনে কোন দাস দিতে পারবে না। তাঁর দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হবে। এটা ছিল নিজের প্রতি নিজেই চাপানো এক প্রকার শাস্তি। কেননা, উমর (রাঃ) মনে করেছিলেন যে, সেই অসহায় দরিদ্র মহিলা ও তার সন্তানদের সেই দুঃখের জন্য তিনিই দায়ী, যা কিনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, গোটা শহর ও তার যাবতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য তিনিই মূলতঃ দায়ী, এ দায়িত্ব তাঁর প্রতি এক আমানত, যার সম্পাদন করতে হবে তাঁকেই।

হযরত উমর (রাঃ) যা করেছিলেন তা, বস্তুতঃ, কোন সরকার প্রধানের পক্ষে করা অসম্ভব। কিন্তু, মর্মে ও কর্মে এক্ষেত্রে উমর (রাঃ) এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন। এবং এটাই সেই দৃষ্টান্ত যার অনুসরণ করা উচিত আধুনিক সব সমাজের। সরকার যদি জনগণের কল্যাণের জন্য এবং তাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য সদা সতর্ক থাকে, তাহলে জনগণ তাদের দুঃখ- দৈন্য ও বঞ্চনার অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বেই তা অপনোদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে, এবং তা করবে কোন ভয় বা চাপের মুখে নয়, নিজেদের বিবেকের নির্দেশে ও অনুশাসনে।

ব্যয়ের বর্ধিত সীমানা

পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচের সীমানাগুলি বহু বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। কোরআন করীমে পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত একটি বাক্যাংশ হচ্ছেঃ

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

"এবং আমরা তাদেরকে (প্রকৃত মুমিনদেরকে) যা কিছু রিযক দান করেছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করে।" (আল্ বাকারা ২ঃ৪)

এখানে এই 'রিযক' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্-প্রদত্ত সব দানকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন মানবীয় সকল গুণাবলী, বিশেষ করে সকল বস্তুগত সহায়-সম্পদ, সময়, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং মানবীয় সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা প্রভৃতি। এই বাক্যাংশটিতে সম্মান, শান্তি, আরাম-আয়েশ ইত্যাদির কথাও বোঝানো হয়েছে।

সংক্ষেপে, বলতে কি, এমন কোন কিছুই নেই, যা **'ওয়া মিম্মা রাযাক্‌নাহুম'** এর গণ্ডীভুক্ত নয়।

এছাড়া, বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এখানে 'মিন' (আক্ষ. তা থেকে কিছুটা) শব্দটি দ্বারা প্রদত্ত উপদেশকে প্রত্যেকের জন্যই অনুসরণযোগ্য করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার সবটাই কিংবা তা থেকে একটা সুনির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতে হবে। করণীয় যা তা হচ্ছে, আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু কিছু আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা। এই 'কিছু কিছু' এর পরিধিটা এত বেশী তারতম্যযোগ্য যে, কেউ, এমন কি যার দেওয়ার মত তেমন কোন ক্ষমতাই নেই, সেও ইচ্ছা করলে, তার সাধ্যমত এর মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এটাই হচ্ছে সমাজ-সেবার সেই আবহাওয়া যা ইসলাম সৃষ্টি করতে চায়। এটা নির্ভর করে অংশতঃ মানুষের সামাজিক আচরণের উপর এবং অংশতঃ তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গোটা সমাজটাই মালিকানা-মুখী এবং কতটুকু নিতে পারলো কেবল সে ব্যাপারেই উদ্‌গ্রীব, সেখানে ন্যায্য ও অন্যায্যের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা অত্যন্ত কঠিন এবং অসম্ভব। এমন সমাজের পক্ষে নিজস্ব সীমারেখার ভিতরে সন্তুষ্ট না থেকে অপরের অধিকারের সীমানা লংঘন করা খুবই সম্ভব।

অপর পক্ষে, যে সমাজকে বরাবর স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, এবং এই প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় যে, সে যেন অন্যদেরকে তাদের প্রাপ্যের অধিক প্রদান করে, তার পক্ষে অপরের অধিকার লংঘন করা সম্ভব হবে না। এমন একটা আবহাওয়ায় কোনও শোষণ চালু থাকতে পারে বলে কল্পনা করাও কঠিন।

অপরের সেবা

ইসলামী সেবার যে ধারণা বা কন্‌সেপ্ট তার নীতি একটি মাত্র আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং ব্যাপকভাবেঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়ে থাক এবং অসঙ্গত কাজ থেকে বারণ করে থাক, এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ।" (আলে ইমরান- ৩ঃ১১১)।

অর্থাৎ, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ থাকবে যতক্ষণ তোমরা সেবক মনোভাবাপন্ন থাকবে। যদি তোমরা অপরের সেবা করতে ব্যর্থ হও তাহলে, তোমাদের পক্ষে শুধু ইসলামী অথবা মুসলিম জাতিভুক্ত হওয়ার কারণে, শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব করার মত কোনও অধিকার থাকবে না।

মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ

যখন কেউ কোন প্রকার আসক্তির কথা বলে, তখন সাধারণতঃ, ড্রাগের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু ব্যাপকার্থে আসক্তির আরও একটা গূঢ়ার্থ আছে। অথচ সেক্ষেত্রে শব্দটার কোন ব্যবহার হয় না বললেই চলে। আমি বলতে চাই, সমাজের কিছু কিছু আনন্দ উপভোগের কথা। যেমন, মদ্যপান ও জুয়াখেলা। অথচ এগুলোর দ্বারা সমাজের না কোন কল্যাণ সাধিত হয়, না শান্তি আসে, না কোন উপকার হয়।

জুয়াখেলা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি উন্নত দেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এমনকি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও, যেখানে জুয়াখেলা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি, সেখানেও প্রায় এটা সর্বত্রই ব্যক্তি পর্যায়ে খণ্ডকালীন পেশায় রূপ লাভ করেছে। মদপান হচ্ছে দুই নম্বর আসক্তি, যার শিকারে পরিণত হয়েছে পৃথিবীর সমাজগুলো সব।

পবিত্র কোরআন জুয়াখেলা ও মদ্যপান দু'টোকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ
ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۝

"হে যারা ঈমান এনেছ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ, একান্ত নাপাক শয়তানী কার্য কলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এগুলোকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং

নামায থেকে ফিরায়ে রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত থাকবে?" (আল্ মায়েদা-৫ঃ৯১,৯২)

হযরত রসূলে পাক (সাঃ) ঘোষণা দিয়েছেন যে, মদ্যপান–

اُمّ الخبائث

'সকল অকল্যাণের জননী।'

এই উভয় আসক্তিই প্রকৃতিগতভাবে এত বেশী বিস্তৃত ও সার্বজনীন যে, এ দু'টোর মধ্যে কোন বিভক্তি রেখা টানা মুশকিল। রাজনৈতিকভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য হয়তো কখনোই এক হতে পারবে না কিন্তু মদ্যপান ও জুয়াখেলার বর্ধিষ্ণু প্রবণতার ক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং উত্তর দক্ষিণ একত্রে মিলিত হয়ে গেছে।

মদ্যপান ও জুয়াখেলা দু'টোই আর্থ-সামাজিক অকল্যাণ। গ্রেট বৃটেনে মদ খাওয়ায় একদিনে যা খরচ হয়, সেই টাকা হলে আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের কয়েক সপ্তাহের খাদ্য পানীয়ের সংস্থান করা যাবে। তথাপি, আজকার দারুণ দারিদ্রপীড়িত দেশগুলোতেও এবং অন্যান্য দেশগুলোতেও মদ্যপানকে বিলাসিতা মনে করা হয় না, এমনকি, জনগণ তার সংকুলান করতে না পারলেও। এমন লক্ষ লক্ষ আফ্রিকাবাসী আছে, যারা জীবন যাপনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মিটাতে না পারলেও, ছেলে মেয়েদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করতে না পারলেও, মদ খাওয়া ছাড়তে পারে না। দক্ষিণ ভারতের দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে যেখানে ফ্যাক্টরীতে তৈরী মদ সবাই খেতে পায় না, সেখানেও ঘরে তৈরী তাড়ি বা অশোধিত মদই খায় সবাই। তবু, তাদের দারিদ্র্যই, কিছুটা হলেও, এই 'সকল অকল্যাণের জননীকে' প্রতিহত করে রাখছে।

মাথা প্রতি আয়ের গড় বাড়লে মদ খাওয়াও বাড়ে। মদ খেয়ে মাতাল না হওয়া পর্যন্ত কেউ কারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। কেউ হয়তো বিস্মিত হয়ে ভাবতে পারেন যে, আজকের পৃথিবীতে মদ-খাওয়া এবং জুয়াখেলাকে সমস্যারূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে কেন, এসব ব্যাপারতো মানবেতিহাসের আদিকাল থেকেই চলে আসছে। আসলেও, মদ ও জুয়া দুনিয়ার সব এলাকাতে সব যামানাতেই ছিল। তবু, এগুলো সনাতনী হলেও, এগুলো যে সর্বযুগেই সর্বত্র সমস্যারূপেই বিদ্যমান ছিল, তাতেও সন্দেহ নেই।

অর্থনীতির দিক থেকে মদ্যপানের চেয়ে বেশী আপত্তিজনক হচ্ছে জুয়াখেলা। জুয়াখেলায় অর্থনীতির চাকা না ঘুরিয়েই টাকা হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। এতে অর্থ-বাজারে পণ্য-দ্রব্য বিনিময় না করেই টাকার বিনিময়ে টাকাই লেন-দেন হয়। জুয়াখেলায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বা সম্পদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ না করেই টাকা একহাত থেকে অন্য হাতে চলে যায়। অর্থ বাজারগুলোতে কিছুটা অর্থনৈতিক

উদ্দেশ্য সাধিত হলেও, জুয়াখেলাতে প্রায় কেউই উপকৃত হয় না। মুক্ত বাণিজ্য ও শিল্পব্যবস্থায় টাকা বস্তু বা পণ্যের আকারে অর্থনীতিতে কোন সেবা বা সার্ভিস না দিয়ে হস্তান্তরিত হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘন ঘন মূল্য বিনিময় (Exchange of Value) সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই মুনাফা বয়ে আনে। এবং এটা তো চিন্তাই করা যায় না যে, ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই, প্রায়শঃ লোকসানের সম্মুখীন হবে। কিন্তু, জুয়াখেলার ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম যে, অংশ গ্রহণকারীদের প্রায় সবাই, প্রায় সময়েই, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই দেখা যায়, স্বল্প সংখ্যক ক্যাসিনো বা পানশালাই বন্ধ হয়। অল্প কিছু সংখ্যক লোকের জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে ভুগতে হয়। উত্তেজনা আর পাওয়া না-পাওয়ার শিহরণের মধ্যে যে টাকাটা তারা হারায় তার বিনিময়ে তারা যা পায় তা হচ্ছে, বাজিতে তাদের সব হারানোর চূড়ান্ত উপলব্ধি-এর পরেও তারা বাজি ধরতে থাকে এই ক্ষীণ আশায় যে, যদি একবার লেগে যায়, তাহলে ক্ষতিটা পূরণ করা যাবে। এবং এটা তারা করতেই থাকে যতক্ষণ না তাদের মানসিক চাপ ও টানাপোড়েন তাদের আনন্দভোগের ইচ্ছার সমস্ত সীমা সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়ে যায়। তখন তার সেই উৎকণ্ঠা ও হৃদয়ের জ্বালা আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা পরিবারের সকলের উপরেই প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সমাজের দরিদ্র অংশের মধ্যে দেখা যায়, পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তাকেও তারা জুয়াখেলার বেদীমূলে উৎসর্গ করছে।

পবিত্র কোরআন মদ্যপান ও জুয়াখেলাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও একটা বিষয়ে স্বীকৃতি দেয় যে, এগুলোর মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ উপকারিতাও আছে, তবে তা এতই সামান্য যে, এগুলোর ক্ষতির তুলনায় তা একেবারেই তুচ্ছঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ
وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ
أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলে দাও, 'এ দু'টোর মধ্যেই মহাপাপ (এবং ক্ষতি) রয়েছে, এবং মানুষের জন্য এগুলোর মধ্যে সামান্য কিছু উপকারিতাও আছে, কিন্তু এগুলোর পাপ (এবং ক্ষতি) এগুলোর উপকার অপেক্ষা গুরুতর'; এবং তারা তোমাকে এও জিজ্ঞাসা করে যে, কি খরচ করবে তারা, তুমি বলে

দাও, 'যা উদ্বৃত্ত; এইভাবে আল্লাহ্ তাঁর আদেশাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা কর।" (আল্ বাকারা-২ঃ২২০)

কথা উঠতে পারে যে, কেউ যদি তার অর্জিত অর্থ দিয়ে কিছু আনন্দ ভোগ করতে চায়, তাতে কার কি? যে যার মত আনন্দ ভোগ করতে বাধা কিসে? কে কোথায় তার টাকা-পয়সা খরচ করবে না করবে সে ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতায় নাক গলাবার অধিকার তো সমাজের নেই।

কিন্তু, মনে রাখা দরকার যে, প্রায় সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষাই দান করা হয়েছে উপদেশ এবং সতর্ক-বাণী আকারে। এখানে এই পৃথিবীতে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার মত কোন ভূমিকাই নেই কোন ধর্মের কোন শিক্ষায়, যদি না কারো বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অপরাধ সংঘটিত হয় এবং সেই অপরাধকে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতেও গণ্য করা হয় অপরাধ বলেই। এই শ্রেণীর অপরাধের মধ্যে পড়ে, খুন, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, দুর্নীতি, অন্যের হক্ বা অধিকার হরণ। এছাড়া, এমন অনেক সামাজিক অপরাধ আছে যেগুলি, সব ধর্মের মতেই, গোটা সমাজের জন্যই বিষের মত। তবু, সে সমস্ত অপরাধের জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে কোন শাস্তি দেওয়া হয় না। এজন্য গোটা সমাজটাকেই ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাই, প্রয়োজন ব্যাপকতর সামাজিক আইনের যা এসব ক্ষেত্রেও ডিক্রী দিতে পারবে। মদ-খাওয়া এবং জুয়াখেলায় আশ্কারা দিলে তা তো গোটা সমাজের জন্য অতি-আশ্কারায় পরিণত হতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু, এটাই বিস্ময়ের সবটুকু নয়।

এছাড়াও, এই সব সমাজ তো ক্রমাগতভাবে অধিক ব্যয়বহুল হতে থাকে। জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ নষ্ট হতেই থাকে। আবহাওয়া হতাশাব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। মদ ও জুয়ার সাথে সাথে অপরাধও সংঘটিত হতে থাকে। দুঃখ-দৈন্য ও দুর্দশা বাড়তে থাকে। ফলে, পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে থাকে। এবং এসবই ঘটতে থাকে মদ ও জুয়ার উপজাত বা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে। মদ্যপান ও জুয়াখেলার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে বহু পরিবার নষ্ট হয়ে যায়, বহু তালাকের ঘটনাও ঘটে।

'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' -এর মতে নেশাসক্তির প্রভাবে মারাত্মক কুফল দেখা দেয় অর্থনীতিতে এবং সমাজে। গৃহ-বিবাদ ছাড়াও, শিশু-নির্যাতন, অজাচার, ধর্ষণ প্রভৃতিও ঘটছে সুরা এবং 'ফেটাল এ্যাল্কোহল সিন্ড্রোম' -এর প্রভাবে বাধানিষেধ অপসারিত হওয়ার দরুন।

মৃত্যুহারের পরিসংখ্যান ঃ

- নেশাসক্তদের আয়ুর গড় ১০ (দশ) বৎসর করে কমে গেছে
- সাধারণ মৃত্যুর হার পুরুষদের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিন গুণ;
- সুরাসক্তদের আত্মহত্যার হার বেড়েছে ছয়গুণ;
- সুরা হচ্ছে ২৫ থেকে ৪৪ বছরের পুরুষদের মৃত্যুর প্রধান চারটি কারণের একটিঃ দুর্ঘটনা, হত্যা, আত্মহত্যা এবং সুরাপানজনিত সিরোসিস।

বার্ষিক অর্থনৈতিক ক্ষতি

- উৎপাদন হ্রাস	ঃ	১৪.৯ বিলিয়ন ডলার
- স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি	ঃ	৮.৩ বিলিয়ন ডলার
- দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি	ঃ	৪.৭ বিলিয়ন ডলার
- অগ্নিজনিত ক্ষতি	ঃ	০.৩ বিলিয়ন ডলার
- হিংস্র অপরাধজনিত ক্ষতি	ঃ	১.৫ বিলিয়ন ডলার
- উল্লিখিত সব কারণের জন্য সমাজকে মাশুল দিতে হয়	ঃ	১.৯ বিলিয়ন ডলার
মোট ক্ষতি (সুরার অপব্যবহারজনিত)	ঃ	৩১.৬ বিলিয়ন ডলার

মদ্যপান, জুয়াখেলা, নাচ, গান ইত্যাদিকে আজকের দুনিয়াতে আনন্দভোগের নির্দোষ উপায় বা কার্যকলাপ হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছে। এগুলোকে বিভিন্ন সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেও উপস্থাপিত করা হয়। এগুলোর প্রকাশ-ভঙ্গীর ক্ষেত্রে এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের ভিন্নতা থাকলেও মৌলিক দিক থেকে এগুলো অভিন্ন। বাতিল ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্প ইত্যাদিকে এখন আর সংস্কৃতির নির্দোষ অংশ বলে মনে করা হয় না; তবে এগুলো এত বেশী ভারী ও কঠিন কাজ যে, এগুলো অনেক সময় সমাজের উপরে দারুণ বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলে। সমাজ তখন আর এর ধারা জারি রাখতে পারে না। মদ্যপান, জুয়াখেলা, নাচ, গান ইত্যাদি, তখন প্রতিনিয়ত বেশী বেশী করে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। তখন এগুলো এত দ্রুততার সঙ্গে যুবকদেরকে মোহিত ও আকৃষ্ট করতে থাকে যে, দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু হতে আর তর সয় না।

এই শ্রেণীর সমাজগুলোর দিকে তাকালে, যে কেউ মনে করবেন যে, বৃথা আনন্দভোগ এবং ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই বুঝি, আসলে মানব সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা ভিন্ন রকমঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে এবং বসে, এবং পাশ হয়ে শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের বিষয়ে চিন্তা করে (এবং বলে,) ' হে আমাদের প্রভু! তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র, সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।" (আলে ইমরান- ৩ঃ১৯১, ১৯২)

এই-ই তো হচ্ছে কোরআন করীমের ঘোষণা, যা সে দিয়েছে আল্লাহ্‌র জ্ঞানী বান্দাদের পক্ষে, যারা সৃষ্টির এবং জীবনের রহস্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে উঠেঃ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, তা কোনভাবেই বৃথা নয়।

কোরআন করীমের এই আয়াতগুলি আর্কিমেডিসের সেই স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস-ধ্বনির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যখন তিনি পাওয়ার আনন্দে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন- 'ইউরেকা'।

সুতরাং, দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা আবহাওয়া বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কোরআনের মতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, সে যেন খোদা মিলনের মহান লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, এবং সে জন্যই তাকে ধাবিত করা হয়েছে তার স্রষ্টার মিলনের পথে। ইবাদতের এই ব্যাপকতার তাৎপর্যকে সামনে রেখেই আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

"এবং আমি জীন্ন ও ইনসানকে সৃষ্টি করিনি ইহা ব্যতীত যে, তারা যেন কেবল আমারই ইবাদত করে।" (আয্ যারিয়াত- ৫১ঃ৫৭)

আনন্দভোগের প্রতিটি ক্রিয়া-পদ্ধতি পরীক্ষা করার পর কেউ যদি এগুলোকে সাকল্যই নিষিদ্ধ করতে বলে, তবে তাকে বড় একটা দোষ দেওয়া যাবে না। বিশেষতঃ, পৃথিবীর মুক্ত সমাজগুলোতে, লোকজনের পক্ষে এটাই মনে করা স্বাভাবিক যে, ইসলাম এত বেশী শুদ্ধিবাদী (Puritan) যে, একবারেই শুক্‌নো। কিন্তু আসলে, দূর থেকে যা-ই মনে হোক না কেন, ইসলাম না শুষ্ক, না একঘেঁয়ে, না বিরক্তিকর। প্রথম কথা হচ্ছে, যারা একবার শুভত্বের বা পুণ্যের স্বাদ পেয়ে গেছে, তারা এটাও জেনেছে যে, কোন্ কাজের মাধ্যমে মহত্তম আনন্দ লাভ করা যায়, তা সেই কাজ বাইরের লোকের কাছে যতই নীরস মনে হোক না কেন। দ্বিতীয়তঃ, এদের মধ্যে অধিকতর ভাগ্যবান তারাই যারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, এবং তারা এমন এক উচ্চ মার্গে উন্নীত হয় যেখান থেকে পার্থিব সুখ ও আনন্দকে নিরতিশয় তুচ্ছ, ইতর, অর্থহীন ও ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। তৃতীয়তঃ, ব্যাপকতর অর্থে যে সমাজ সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত থাকে না, তা দিনের শেষে খালি হাতে ফিরে না। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, তা ঐ সকল মূল্যবোধের বিনিময়ে মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। উত্তেজনা, উল্লাস, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা, এবং মত্ততার সঙ্গে বিনিময় হয়েছে শান্তি, নির্লিপ্ততা, ভারসাম্যতা, বর্ধিষ্ণু নিরাপত্তা বোধ এবং পরিতৃপ্তির - যা প্রতিক্ষেত্রে আপন বৈশিষ্ট্যে পুরস্কার হিসেবে সর্বোত্তম পুরস্কার।

যখন দু'টো সামাজিক আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে তুলনা করা হবে, তখন এটা বুঝে ওঠা কোন কঠিন ব্যাপার হবে না যে, খোদাতা'লার প্রতি ভালবাসা ও তাঁর প্রতি আত্মনিবেদনের বৃক্ষ বস্তুবাদী জলবায়ুর তামাশা-প্রিয় সমাজে শিকড় গাড়তে পারে না। অবশ্য, ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। তবে, ব্যতিক্রম তো কোন নিয়ম হতে পারে না। বস্তুতঃ, এই দু'টো জলবায়ুর একটা থেকে অপরটা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা বলাই বাহুল্য।

অর্থনৈতিক শান্তি

(১) পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ও ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন
(২) পুঁজিবাদ
(৩) বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ
(৪) ইসলামী ধারণা (কন্‌সেপ্ট)
(৫) পুঁজিবাদী সমাজের চারটি বৈশিষ্ট্য
(৬) পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পরিণতি ধ্বংস
(৭) পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
(৮) ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
(৯) যাকাত
(১০) সুদের নিষিদ্ধকরণ
(১১) বৃটেনে সুদের উচ্চ হার
(১২) সুদের অন্যান্য ক্ষতিকর দিক
(১৩) সুদঃ শান্তির প্রতি এক হুমকী
(১৪) সম্পদ মজুদ করা নিষেধ
(১৫) সাদাসিধে জীবন যাপন
(১৬) বিয়েশাদীতে ব্যয়
(১৭) গরীবের দাওয়াত গ্রহণ
(১৮) পরিমিত খাদ্যাভ্যাস
(১৯) টাকা-পয়সা ধার করা
(২০) অর্থনৈতিক শ্রেণী পার্থক্য
(২১) ইসলামের উত্তরাধিকার আইন
(২২) ঘুষ নিষিদ্ধ
(২৩) বাণিজ্যিক নীতিমালা
(২৪) মৌলিক চাহিদা
(২৫) অর্থনৈতিক ঐক্যের মাধ্যম হিসেবে ইবাদত বা উপাসনা
(২৬) আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব।

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝

"আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করবেন এবং দানকে বৃদ্ধি করবেন। এবং আল্লাহ্ কোন কাফের, পাপীকে আদৌ ভালবাসেন না।" (আল্ বাকারা- ২ঃ ২৭৭)

كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ
ٱلْمِسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝
وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

"না, বরং তোমরা এতীমকে সম্মান করো না; এবং মিসকীনকে আহার দানে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না; এবং তোমরা গরীবের ওয়ারিশী সম্পদ অবাধে ভক্ষণ কর; এবং তোমরা সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস।" (আল্ ফজর-৮৯ঃ ১৮-২১)

পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ও ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা না তো পুঁজিবাদের অন্তর্ভুক্ত, না বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের। ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন যান্ত্রিক না হয়েও বৈজ্ঞানিক। এই দর্শন কঠোর বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সুশৃংখল। এতে ব্যক্তি মালিকানা এবং ব্যক্তি উদ্যোগের অনুমতি রয়েছে বটে, কিন্তু এতে লিপ্সা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। স্বল্প সংখ্যক মানুষের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ারও সুযোগ নেই যাতে সমাজের বিরাট অংশটাই নিঃস্ব হয়ে যায়, এবং নির্মম ও নির্বাধ একটা শোষণ পদ্ধতিতে পড়ে ভূমিদাস ও ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ও ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের মধ্যে তিনটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদে পুঁজির উপরে সুদ প্রদান করা হয়। নীতিগতভাবে এটা এমনিতেই স্বীকৃত যে, পুঁজির বৃদ্ধিলাভের অধিকার আছে। পুঁজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুদ কেন্দ্রীয় চালিকা শক্তি (motive force) হিসেবে কাজ করে। অতঃপর সুদকে শক্তি (energy) হিসেবে প্রবাহিত করে দেওয়া হয় উৎপাদনের সংযোজন প্রক্রিয়া অর্থাৎ এসেমব্লী লাইনকে সঠিক ও সচল রাখার সংক্ষেপে, সুদ হচ্ছে পুঁজির সরবরাহ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে একটা উদ্দীপক (incentive) শক্তি।

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজির আবর্তন ও পুনরাবর্তনে সুদ উদ্দীপক হিসেবে কোন ভূমিকা পালন করে না; কিন্তু এক্ষেত্রে পুঁজির একচেটিয়া মালিকানা রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত থাকে। সুতরাং অনুরূপ উদ্দীপ্তকরণের আবশ্যকতা এক্ষেত্রে নেই।

অবাধ ব্যক্তি উদ্যোগের ক্ষেত্রে, সুদ দেওয়া বা নেওয়াটা বড় কথা নয়, এক্ষেত্রে পুঁজিকে যথাসম্ভব দ্রুত হারে বাড়ানোর জন্য ব্যক্তির ব্যক্তি- মালিকানার প্রেরণাই যথেষ্ট। কাউকে যদি কর্জ নেওয়া টাকার উপরে সুদ দিতে হয়, তাহলে, সেই সুদের হার 'বেঞ্চমার্ক' হিসেবে কাজ করে। এটা এমন একটা জানালা যার মধ্য দিয়ে পুঁজির তুলনামূলক বৃদ্ধি অথবা কম্তির মনিটর করা যায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, অবশ্য, এ ধরনের কোন প্রবণতা নেই। কেননা, এই ব্যবস্থায় পুঁজি নিয়োগ করে যারা

তারা এর মালিক নয়। এতে তুলনা করার এমন কোন পদ্ধতিও নেই যদ্বারা কারও পক্ষে এটা বিচার করা সম্ভব যে, প্রবৃদ্ধির হার অর্থনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত কিনা।

সমাজবাদী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায়, স্বয়ং রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রের সমুদয় পুঁজি জবরদস্তি দখলে নেওয়ার কারণে সুদ প্রথা সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন হয়ে পড়ে।এখানে গোঁজাটা হচ্ছে, যখন কেউ প্রদেয় সুদের চাইতে অধিক উপার্জন করার জন্য কোনও চাপের মধ্যে থাকে না, তখন তার যেমন কোন প্রেরণা থাকে না, তেমনি দায়িত্ববোধও থাকে না।

ধরুন, যদি কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সরবরাহে থাকা সুমদয় পুঁজির মূল্য নিরূপণ করা যেত এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, এই সমুদয় পুঁজি যদি ব্যাংকে জমা থাকতো তাহলে কি পরিমান সুদ পাওয়া যেত; তাহলে তা থেকে, ছবিটার একটা দিক আমাদের সামনে আসতে পারতো এবং ছবিটার অপর দিকটা আমরা পেতাম, সেক্ষেত্রে, লাভ ও লোকসানের ভিত্তিতে আর্থিক অবস্থাটার পরিমাপ করে। এতে, অবশ্য, নানা জটিলতাও সৃষ্টি হতে পারে; যেমন, মজুরী নির্ধারণ করা ইত্যাদি। কিন্তু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা যদি এ ব্যাপারে খানিকটা চিন্তা-ভাবনা করেন তাহলে, এই জাতীয় বাধা বা জটিলতাও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। এবং এতদুভয়ের তুলনার ফলে বহু উৎসাহব্যঞ্জক সম্ভাবনা সূচিত হবে।

এটা খুবই সম্ভব যে, জীবনধারণের মান পড়ে যাওয়ার পিছনে যে প্রকৃত অপরাধী তাকে এই উপায়েই চিহ্নিত করা যাবে। এমনকি, এই ধরনের বিরাট প্রচেষ্টা ছাড়াও, অনুরূপ মান পড়ে যাওয়ার কারণগুলো খুঁজে বের করাটা কারো পক্ষে খুব একটা কঠিন ব্যাপার হবে না। আমি বিশ্বাস করি, যখন রাষ্ট্র স্বয়ং পুঁজিবাদী হয়ে ওঠে তখন, যে পদ্ধতিতে সে (রাষ্ট্র) রাষ্ট্রীয় পুঁজি ব্যবহার করে তার ব্যর্থতা, তার নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদ এবং তার ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার জন্য যে মনিটরিং পদ্ধতির প্রয়োজন তা থেকে সে বঞ্চিত থাকে। কেননা, তার কোন আর্থিক দায়-দায়িত্ব পূরণের বাধ্যবাধকতা থাকে না, এবং তা কোনপ্রকার জবাবদিহি ছাড়াই যত খুশী পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে। এই যে অবস্থাটা, এর অভ্যন্তরেই নিহিত থাকে এর সমূহ বিপদ। ব্যক্তিগত প্রেরণার অভাবে এবং বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে আসা লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে সতর্কী-করণ পদ্ধতির অভাবে উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস হয়। যন্ত্রপাতি ও মালামাল সবকিছুর নষ্ট হওয়ার পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় পুঁজির প্রবাহের উপরেও কোন বাধা নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সমাজবাদী সরকারগুলোর সামনে এমন কোন আয়না নেই যার মধ্য দিয়ে

তাদের আর্থিক প্রবৃদ্ধির সঠিক হার লক্ষ্য করা সম্ভব, এবং তার সঙ্গে বহির্বিশ্বের মুক্ত বাজার নীতির তুলনা করা সম্ভব। একটা উপরি সমস্যা হচ্ছে, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষা খাতে অনেক বেশী ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, গোয়েন্দাগিরি এবং দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী গোষ্ঠীগুলোর জন্যেও এদেরকে বেশী খরচ করতে হয়। এর দরুন, অন্য সব কিছুতে সমতা যদি থাকেও, তবু প্রতিরক্ষা খাতে এবং আইন শৃংখলার খাতে খরচের মাত্রা অনেক বেশী বেড়ে যায়। এই সব কারণে, এবং অনুরূপ অন্যান্য কারণেও, অর্থনীতির উপরে একটা মারাত্মক চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে, অর্থনীতির চূড়ান্ত পতন কিছুদিনের জন্য ঠেকানো গেলেও, তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না।

ইসলামী ধারণা (কন্‌সেপ্ট)

কম্যুনিজম যেক্ষেত্রে, সুদ বিলোপ করা সত্ত্বেও সম্পদের উৎপাদনে সরাসরি বিনিয়োগের জন্য প্রেরণার (incentive) কোন সুযোগ দেয় না, ইসলাম সেক্ষেত্রে অনুরূপ প্রেরণার সুযোগ দান করে। ইসলাম সুদের ব্যবসায় এবং সুদ নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও, অনুরূপ অবস্থায় কম্যুনিস্ট দুনিয়া এ সম্পর্কিত যে সকল সুনির্দিষ্ট সমস্যাবলী প্রত্যক্ষ করে থাকে, তা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। সুদের অবর্তমানে, অনুৎপাদনশীল খাত হতে পুঁজি সরায়ে নিয়েও, ইসলাম অব্যবহৃত (idle) মূলধন সঞ্চয়ে বাধা দান করে। এবং এই বাধাটা হচ্ছে এক প্রকার 'ট্যাক্স' যাকে বলা হয় 'যাকাত'। এই যাকাত আয় বা মুনাফার উপরে ধার্য করা হয় না, ধার্য করা হয় খোদ পুঁজির উপরেই।

পার্থক্যটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি সঞ্চিত হয় মাত্র কতিপয় লোকের হাতে এবং তারা লালসার বশবর্তী হয়ে পুঁজি বাড়াতে থাকে। এটা তারা করে সুদ জমায়ে এবং সেই সুদ আর্থিক খাতে পুনঃ প্রয়োগ করে, উদ্দেশ্য চলতি সুদের হারের চাইতে অধিক হারে মুনাফা অর্জন করা। এই পদ্ধতি ব্যর্থ হলে, আর্থিক অবস্থার পতন অনিবার্য হয়ে উঠে। ইসলামী পদ্ধতিতে, পড়ে-থাকা (অব্যবহৃত) মুলধন যাকাত দিতে দিতে ক্রমান্বয়ে শেষ হয়ে যাবে, এই ভয়ে লোকেরা বাড়তি সঞ্চয়কে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করবে এবং তাতে যাকাত দেওয়ার জন্য যে চাপ সৃষ্টি হয় তাও পাল্টিয়ে যাবে।

ইসলামের মতে, আজকের দুনিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান না বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে পাওয়া যাবে, না পুঁজিবাদে। এই বিষয়টার উপরে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। কিন্তু, তবু, পুঁজিবাদ কর্তৃক যে অর্থনৈতিক অসমতা বা

ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

পুঁজিবাদী সমাজের চারটি বৈশিষ্ট্য

এইরূপ (অর্থনৈতিক) ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি যে সমাজে হয়েছে তাকে সনাক্ত করার ফলক-চিহ্ন কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছেঃ

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمِسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

"না, বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না এবং মিস্‌কীনকে আহার দানে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না এবং তোমরা (অন্যদের) ওয়ারিশী-সম্পদ অবাধে ভক্ষণ করে থাক এবং তোমরা ধনসম্পদ অত্যধিক ভালবাস।" (আল-ফজর ৮৯ঃ১৮-২১)

সংক্ষেপে, বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

(১) এতীমের প্রতি অমর্যাদাকর আচরণ করা;
(২) দরিদ্রের খাদ্য-সংস্থান বৃদ্ধি না করা;
(৩) অন্যের উত্তরাধিকার হরণ করা;
(৪) সীমাহীনভাবে সম্পদ সঞ্চয় করা।

পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পরিণতি ধ্বংস

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দর্শনকে সমর্থন না করেও, ইসলাম পুঁজিবাদের কিছু কিছু বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে, কারণঃ

أَلْهَىٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ ۝

"আধিক্য লাভের পরস্পর প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (আল্লাহ্ থেকে) উদাসীন করে দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কবরে পৌঁছ, অচিরেই তোমরা (সত্যকে) জানতে পারবে।" (আত্ তাকাসুর ১০২ঃ ২-৪)

পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

সুদ-ভিত্তিক পুঁজিবাদ কর্তৃক দরিদ্র জনগণের যে শোষণ-যার দরুন সমাজবাদী বিদ্রোহের জন্ম হয়– তা এখন, দৃশ্যতঃ, ইতিহাসে পর্যবসিত হয়ে গেছে। কিন্তু, একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এটা মাত্র চেহারার কিছুটা পরিবর্তন মাত্র। গোটা পৃথিবীটাই, ইতোমধ্যে ধনী ও দরিদ্র এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এজন্য, প্রধানতঃ, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর শোষণকেই ধন্যবাদ দিতে হয় বৈকি। এই সঙ্গে যোগ দিয়েছে আবার অনুতপ্ত প্রাচ্য ব্লকের পুঁজিবাদে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাবর্তন। এটা কেউ আন্দাজ করতে পারছে না যে, তৃতীয় বিশ্বের এই সব দুর্বল ও রক্তশূন্য জাতিগুলোর আরও কতটা রক্ত শোষণ করা হবে। কিন্তু, এটা ঠিকই আন্দাজ করা যায় যে, পুঁজিবাদের রক্ত-চোষারা রক্ত আরো চুষবেই। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দু'টো প্রধান পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক দর্শন অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ এখন শেষ হয়ে গেছে। মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি মানবীয় কর্মকাণ্ডের মঞ্চ থেকে নতশিরে প্রস্থান করেছে। অপরদিকে, পাশ্চাত্যের তথা কথিত 'মুক্ত' অর্থনীতি দৃশ্যতঃ বিজয় লাভের পর এখন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। প্রাচ্য ব্লকের দেশগুলো, চীন ছাড়া, বাকী সবাই তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তাদের স্ব স্ব দেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য এখনও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেকার অর্থনৈতিক ব্যবধান অতটা বড় নয় যতটা বড় উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যেকার ব্যবধান। উত্তরের প্রথম বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে অন্য আর একটা পটভূমিতে বিভক্ত। যদিও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিক থেকে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্যবধান নিঃসন্দেহে দুঃখবহ, তবু তা কোন দিক থেকেই ইয়োরোপ ও আফ্রিকার মধ্যেকার ব্যবধানের কাছাকাছিও নয়। আফ্রিকার ভৌগলিক অবস্থান ইয়োরোপের কাছাকাছি হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে তার অবস্থান ইয়োরোপ থেকে বহু বহু দূরে।

পরাশক্তিগুলোর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এবং শীতল যুদ্ধের বরফ গলার কারণেও, কোন প্রকারে উপকৃত হওয়ার কোন মওকা লাভের আশায় বিশ্বের দুর্বল জাতিগুলো এক সময় যে নিরাপত্তা ভোগ করতো এখন তা দ্রুত তিরোহিত হয়ে যাবে।

এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাজার দখলের এবং তার উপরে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা, রাশিয়া এবং বাদবাকী ইয়োরোপের দেশগুলোর মধ্যে আরও বড় ধরনের একটা প্রাণপণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে।

জাপানই শুধু আমেরিকার একমাত্র ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। এক নতুন ইয়োরোপ, যা ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই দ্রুত উত্থিত হচ্ছে, তা এবং সেই সঙ্গে, একটা বৃহত্তর সাধারণ বাজারে পূর্ব ইউরোপের সম্ভাব্য অংশ গ্রহণ, আমেরিকার বিরুদ্ধে বর্তমানে প্রতিদ্বন্দী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর চাইতেও অধিকতর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দী হিসেবে আবির্ভূত হবে।

পূর্ব ইয়োরোপ ও রাশিয়ার কোটি কোটি সৃজনমুখী জনসাধারণ, যারা জীবন ধারণের মানোন্নয়নের তীব্র প্রয়োজনীয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তারা সামনের দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছে। এই যে লম্বা ফরমাইশ, যা সময়ের ব্যবধানে আরও বেশী লম্বা হতে থাকবে, তা পূরণের জন্য শুধু আবদ্ধ বাজারের পুনর্বাসনই যথেষ্ট হবে না। পূর্ব ইউরোপের এবং রাশিয়ার জীবন যাপনের উন্নয়নশীল মানের সাহায্য করার জন্য বহির্বাজারেরও তীব্র প্রয়োজনীয়তা আছে; এবং তা পূরণ করতে পারে ই. সি, আমেরিকা ও জাপান। এর মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য কোনও আশার ইংগিত নেই। এ এক করুণ দৃশ্য তৃতীয় বিশ্বের এবং তা আরও বেশী করুণ আফ্রিকার হতভাগ্য মানুষগুলোর জন্য।

পৃথিবীর অর্থনেতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত দেশগুলোর রাজনীতিবিদরা দূর প্রাচ্যে, জাপানে, দক্ষিণ কোরিয়ায়, ফরমোজায়, হংকং এবং সিঙ্গাপুরে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে দেখে দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন। মনে হচ্ছে যে, দূর প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যেকার দূরত্ব কমিয়ে আনা হচ্ছে একটা সেতু-বন্ধনের মাধ্যমে এবং সেই সেতুটা নির্মিত হচ্ছে বহু এশীয় দেশের যেমন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ক্যাম্বডিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের মাথার উপর দিয়ে।

এটাও সম্ভব যে, জাপানের বিশাল অর্থনীতির ক্রম-বর্ধমান চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য এবং তার দ্রুত সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে বাধা সৃষ্টির জন্য দূর প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলো আর আমেরিকার প্রযুক্তি ও পুঁজির বেনিফিশিয়ারী বা সুবিধাভোগী থাকবে না। অপর পক্ষে, এটাও সম্ভব যে, জাপান এবং অর্থনৈতিকভাবে বৃহত্তর ও ঐক্যবদ্ধ এক ইয়োরোপের সম্মিলিত নতুন চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য আমেরিকা তার দূর প্রাচ্যের মিত্রদের প্রতি আরও বেশী ঝুঁকে পড়বে। এই অবস্থা ভবিষ্যতে মানবজাতির জন্য অকল্যাণ ডেকে আনবে এবং শান্তির সকল আশা ভরসাকে

নস্যাৎ করে দিবে। এবং তা পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের আদর্শগত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে না হয়ে ভিন্ন এক ক্ষেত্রে ঘটে যেতে পারে।

এটা বলার সময় এখনও আসেনি যে, পূর্ব ইয়োরোপ ও রাশিয়ার পরিবর্তনসমূহ কীভাবে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করবে এবং পুঁজিবাদে তাদের প্রত্যাবর্তনটা সম্পূর্ণ হবে, না আংশিক হবে; ধীরে হবে, না দ্রুত হবে। যা-ই ঘটুক না কেন, একটা বিষয় পরিষ্কার যে, এই পরিবর্তনগুলো তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে। এই যে অবস্থা, তা স্থায়ীভাবে টিকতে পারে না। পৃথিবী ইতোমধ্যেই, একটা বিশ্বজোড়া ধ্বংসকাণ্ডের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

সুদ-ব্যবসায় এবং সুদের ফাঁকা বুনিয়াদের উপরে নির্মীত উল্লসিত পুঁজিবাদী দেশগুলোর জন্য ইসলামের কিছু উপদেশ দেওয়ার আছে। কেননা, এই দেশগুলো পরিণামে মুখ থুবড়ে পড়বেই এবং এগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। সমাজতন্ত্রের উপরে পুঁজিবাদের তথাকথিত সাম্প্রতিক বিজয় মাত্র ক্ষণস্থায়ী একটা শান্তি দিতে পারে। স্বয়ং পুঁজিবাদী দর্শনগুলোই এমন সব শক্তিশালী দৈত্যের জন্ম দিবে যেগুলো সমাজবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকার কারণে অতি দ্রুত বেড়ে উঠবে এবং তা বিশাল আকার ধারণ করবে। আখেরে পুঁজিবাদের আগ্নেয়গিরি এমন প্রচণ্ডরূপে বিস্ফোরিত হবে যে, সারাটা দুনিয়াই তখন প্রকম্পিত হবে এবং দুমড়ে মুষড়ে যাবে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলাম তার সমাজ ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে যেমন বলে তেমনি তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়েও বলে যে, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং তিনি মানুষকে বহু কিছু দিয়েছেন ট্রাস্ট বা আমানত রূপে। আমানতদার বা অছি হিসেবে মানুষকে তার এই ট্রাস্ট বা আমানতের ব্যবহার সম্পর্কে জবাবদিহি হতে হবে। সম্পদ থাকা কিংবা না থাকাটা হচ্ছে পরীক্ষার একটা উপায়, যাতে করে প্রাচুর্যে এবং দারিদ্র্যে উভয় অবস্থায়, যারা উক্ত জবাবদিহি সম্পর্কে সতর্ক তাদেরকে পৃথক করা যায়, যারা গাফেল ও অন্যান্য দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি উদাসীন তাদের থেকে। পবিত্র কোরআন আমাদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

"এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান"। (আলে ইমরান ৩ঃ ১৯০)

অতঃপর এই মহাগ্রন্থ এই শিক্ষা দান করে যে, প্রত্যেকটি বস্তু যখন সকলের জন্যই আল্লাহ্ কতৃক সৃষ্ট তখন এর কিছু অংশ মানুষের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া উচিৎ।

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝

"শাসন-ক্ষমতায় কি তাদের কোন অংশ আছে? তাহলে কি তারা জনগণকে খেজুরের আঁটির পিঠের ছিদ্র পরিমাণও কিছু দিবে না?"(আন্ নিসা ৪ঃ৫৪)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي
رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
يَجْحَدُونَ ۝

"এবং আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অন্য কতকের উপর রিয্কের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি দান করেছেন। .কিন্তু যাদেরকে সমৃদ্ধি দান করা হয়েছে তারা নিজেদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত লোকদেরকে তাদের রিয্ক ফেরৎ দিতে আদৌ প্রস্তুত নয় যাতে তারা সকলেই ওতে (অংশে) সমান সমান হয়ে যায়। এতদ্সত্ত্বেও তারা কি আল্লাহ্র নেয়ামতকে অস্বীকার করছে।" (আল্ নহল ১৬ঃ ৭২)

মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে, এই আমানত সততার সঙ্গে এবং সমতার ভিত্তিতে কার্যকর করাঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ
النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ সেগুলোর প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন নিশ্চয় তা অতীব উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (আন্ নিসা ৪ঃ৫৯)

বস্তুগত সম্পদ যে পরীক্ষার একটা মাধ্যম মাত্র, তা পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে এভাবেঃ

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

"তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) কেবল পরীক্ষার বিষয়, এবং আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।" (আত্ তাগাবুন - ৬৪ঃ১৬)

ইসলামে মালিকানা ধারণার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, কোন কোন সম্পদকে ব্যক্তি মালিকানার আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং তা ন্যস্ত করা হয়েছে সামগ্রিক ভাবে গোটা মানবজাতির হাতে। তাই, খনিজ সম্পদ এবং সাগর বা মহাসাগর থেকে আহৃত সম্পদ কোন ব্যক্তি বা দলের মালিকানার আওতাধীন নয়।

যাকাত

যাকাত ইসলামের পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভের মধ্যে একটি। অন্যগুলি হচ্ছে এই স্বীকৃতির ঘোষণা দান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল, নামায কায়েম করা,রমযান মাসে রোযা রাখা, এবং মক্কা শরীফে আল্লাহ্র ঘরে হজ্জ করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, পবিত্র কোরআনে আদেশ দেওয়া হয়েছেঃ

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

"নামায কায়েম কর এবং যাকাত দান কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা যায়।" (আন্ নূর ২৪ঃ৫৭)

আরবী শব্দ 'যাকাত'-এর আক্ষরিক অর্থ–কোন কিছুকে পবিত্র করা। এবং 'বাধ্যতামূলকভাবে দেয় কর'-এর প্রেক্ষিতে এর অর্থ দাঁড়ায়– যাকাত দেওয়ার পর অবশিষ্ট যে সম্পদ থাকে তা মুমিনের জন্য পবিত্র ও আইনসিদ্ধ বা হালাল হয়ে যায়।

যাকাত সাধারণতঃ ধার্যকরা হয় ২.৫% হারে। এবং তা ধার্য করা হয় একটা সুনির্দিষ্ট সীমার অধিক হস্তান্তরযোগ্য সম্পদের উপরে যা বৎসরান্তে মালিকের হাতে থেকে যায়। যদিও এই 'কর' এর শতকরা দেয় পরিমাণ বা 'হার' এর উপরে বহু কথাই বলা হয়েছে, তবু পবিত্র কোরআনে আমরা এর কোন নির্দিষ্ট শতকরা হারের উল্লেখ দেখতে পাই না। এ ব্যাপারে, আমি মধ্যযুগের আলেম বা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতে পারছি না। আমি বিশ্বাস করি যে, শতকরা হার নির্ধারণের বিষয়টা

শিথিল রাখা হয়েছে, এবং তা নির্ধারণ করা উচিত বিশেষ দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে। যাকাত যেহেতু, কিছু নির্দিষ্ট সীমারেখার উর্ধ্বের পুঁজির উপরে ধার্যকৃত এক প্রকার নির্দিষ্ট কর, সেহেতু যাকাত শুধু কতিপয় বিশেষ শ্রেণীর ব্যয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। এ সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ
عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

"দানসমূহ (যাকাত) কেবল গরীব, মিসকীন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এবং তাদের জন্য যাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করতে হয় এবং দাস-মুক্তির জন্য এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী এবং পথিকদের জন্য (এ হচ্ছে) আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।" (আত্ তওবা, ৯ঃ৬০)

এই অধ্যাদেশ কার্যকরী করার প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে ট্রেজারীর উপরে। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে, ইসলামের প্রথম দু'জন খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এই জন্য যে, তাঁরা যাকাত-সদকার দ্রুত বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। যার দরুন, তা (ইসলামী রাষ্ট্র) প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। এই পদ্ধতি আব্বাসীয় আমলে কয়েক শতাব্দী ধরে সফলভাবে কার্যকর ছিল।

আমরা বলে এসেছি যে, সুদের প্রেরণা শক্তি (Motive force) অপসারিত হয়ে যায় যাকাতের চালিকা শক্তি (Driving force) দ্বারা। প্রচলিত এই পদ্ধতিটাকে যখন আমরা বিচার করে দেখি, তখন ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক পদ্ধতির মধ্যেকার অনেক পার্থক্য আমাদের নযরে আসে। এথেকে, একটা সম্পূর্ণ আলাদা অর্থনীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে।

অব্যবহৃত মূলধন বা পড়ে থাকা টাকা, তার পরিমাণ কম/বেশী যাই হোক না কেন, তার উপরে যে হারে ট্যাক্স ধার্য করা হয়, তার চাইতে বেশী হারে যদি মূলধনের প্রবৃদ্ধি করা না যায়, তাহলে তা বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে না। এটাই সংক্ষেপে

সেই অর্থনীতি যাকে যাকাত ক্রমবর্দ্ধমানভাবে চলমান রাখে একটা প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রে।

এমন একটা অবস্থার কথা চিন্তা করুন, যেখানে কোন ব্যক্তি তার স্বল্প মূলধন নিয়ে সরাসরি কোন ব্যবসায় নামতে পারছে না, এবং সেখানে এমন কোন ব্যাংকও নেই যে, তা থেকে সে তার গচ্ছিত টাকার উপরে সুদসহ ঋণ নিতে পারে। তথাপি, যদি সেই গচ্ছিত টাকা যাকাত ধার্য হওয়ার মত যথেষ্ট হয়, তাহলে ট্যাক্স আদায়কারীরা ফি বছরে তার দুয়ারে কড়া নাড়বে সেই পুঁজির একটা শতকরা হিস্যার জন্য। (যাকাতের জন্য কোন নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমারেখা নেই)। অনুরূপ সব ব্যক্তির জন্যই তখন দু'টো বিকল্প থাকবে, হয় তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে টাকা খাটাতে হবে লাভজনক ভাবে; নয়তো তাদেরকে তাদের সবার সম্পদ একত্রিত করে ছোট বা বড় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এতে করে যৌথ মূলধনী কারবার, অংশীদারী কারবার, ছোট ছোট কোম্পানী অথবা পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং-এর মাধ্যমে বড় বড় কোম্পানীও সৃষ্টি হবে, এবং তা হবে সম্পূর্ণরূপে লাভ ও ক্ষতির ভিত্তিতেই। এই জাতীয় কোম্পানীগুলো কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে কোন ধার গ্রহণ করবে না, বিধায় সুদসহ ঋণ শোধ করারও কোন ব্যাপার তাদের থাকবে না। যখন আপনি এই শ্রেণীর কোম্পানীগুলোর ভাগ্যের সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগুলোর কোম্পানীগুলোর ভাগ্যের তুলনা করবেন, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে, এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে থেকে এদের সমস্যা এবং সংকটের মোকাবেলা করছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যবসায় এবং শিল্পের অবনতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান চাহিদার কারণে উৎপাদন কমিয়ে ফেললে তা তাদেরকে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে। তাদের ঋণের জন্য যে সুদ তাদেরকে দিতে হবে তা ততদিন পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বাড়তেই থাকবে, যতদিন না ঐ কোম্পানীগুলোর পক্ষে চালু থাকা অসম্ভব হবে।

অপর পক্ষে, যদি কোন অর্থনীতিকে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয় তাহলে, কারবার ও ব্যবসায়িক সুবিধাদির মন্থরতা ব্যবসায় ও শিল্পকে মাত্র একটা জড়তার অবস্থায় ঠেলে দিতে পারবে। এবং এটা ঘটবে ঠিক সেইভাবে যেভাবে প্রকৃতি কঠিন দুর্যোগ ও প্রতিকূল অবস্থার সময়ে যোগ্যতমের উর্দ্বতনকে নিশ্চিত করে। শক্তির জোগান কমে গেলে উৎপাদন কমাতেই হবে, নইলে শক্তির ক্রান্তি সীমা (Critical level) অর্থাৎ শক্তির যে সীমাটা টিকে থাকার জন্য জরুরী, তা আরও নীচে নেমে যাবে। ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে যেহেতু ঋণ পরিশোধের কোন চাপ নেই, সেহেতু তা অবনতি বা ঘাটতির সময়ে আরও বেশী চাপ ও চ্যালেঞ্জ বরদাস্ত করতে সক্ষম।

সুদের নিষিদ্ধকরণ

ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতি চলে সম্পূর্ণরূপে সুদের উপকরণ ছাড়াই। তবু, এমন কোন ঐতিহাসিক বা সমসাময়িক নযীর নেই যা থেকে বুঝা যাবে যে, সুদ না থাকার ফলে মুদ্রাস্ফীতির দানব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিকে নিয়ে গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সমসাময়িক কালে, আমাদের জন্য একটা খুব মজার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এবং তা হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতির উপরে সুদের হারের যে প্রভাব এবং সুদের অনুপস্থিতির যে প্রভাব, তার মধ্যে তুলনা করে দেখার সুযোগ।

মাও সে তুং-এর আমলে চীনের সরকার অর্থনীতির উপরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিল। তন্মধ্যে কতকগুলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। কতকগুলে খুব চমৎকার ফল দিয়েছিল। কিন্তু, মাও সে তুং -এর পূরা আমলটাতে , অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক কোন ক্ষেত্রেই সুদের কোন ভূমিকাই ছিল না। তথাপি, এই গোটা সময়টাতে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির তেমন বড় কোন ঘটনা ঘটেনি। বস্তুতঃ যখন সামগ্রিক উৎপাদনের স্তর বা লেভেল, অবশেষে উপরে উঠে যায়, দ্রব্যমূল্য তখন নিম্নমুখী হয়।

এই তুলনায়, পৃথিবীর সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা বেশী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ইসরাঈলে মুদ্রাস্ফীতির হারও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রেকর্ডকৃত দ্রুততম হারের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য, এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো এবং যুদ্ধ পরবর্তী অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিপতিত ইয়োরোপ, বিশেষ করে, জার্মানী। তবে, ঐ সময়টা স্বাভাবিক ছিল না। অন্য সব কিছু সমান সমান থাকলে, যে কোন অর্থনীতিতে সুদের ভূমিকাকে মুদ্রাস্ফীতিকারী (inflationary) বলা ছাড়া অন্য কিছু বলার উপায় নেই।

বৃটেনে সুদের উচ্চ হার

বৃটেনে, সম্প্রতি, সুদের চড়া হারের ভাল ও মন্দ নিয়ে যে তীব্র বিতর্ক চলছে, তা এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একটা ভাল দৃষ্টান্ত হতে পারে। বেশ কিছুদিন ধরে রক্ষণশীল সরকার সুদের হার সাংঘাতিক রকম উঁচুতে রেখেছে, এবং এর কারণ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে যে, এতে করে ব্যক্তি-ভোগ নিয়ন্ত্রণে থাকবে , ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঠেকানো যাবে। এই পলিসির দরুন যে চাপের সৃষ্টি হয়েছে তার নীচে চাপা পড়ে ইতোমধ্যেই অর্থনীতির চিঁচিঁ করা শুরু হয়েছে, কাত্‌রানী শুরু হয়েছে।

এই গবেষণা থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছুই পাওয়া যেতে পারে। অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে এই গবেষণা এমন কিছু অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে পেশ

করে, যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়েছে এমন একটা থিওরী বা তত্ত্বের ভিত্তিতে যা কিনা স্বয়ং বিতর্কিত।

সুদের হার যতই বাড়বে, মুদ্রাস্ফীতি ততই কমবে, এই ধারণাটাই মনে হয় একমাত্র কারণ, যার দরুন এদ্দিন যাবৎ সুদের হারকে একটা অস্বাভাবিক উঁচু স্তরে রাখা হয়েছে।

গ্রেট বৃটেনে যা ঘটছে, সে সম্পর্কে আমাদের এই সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতার জন্য সুদের হার কখনই প্রকৃত দোষী ছিল না। অর্থনীতির বহু বহু ক্ষেত্রে, অবশ্যই, সঠিক কোন ব্যবস্থাপনা ছিল না। যার ফলে, বর্তমান সময়ে, মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুদের হার বৃদ্ধির দ্বারা শুধু এতটুকু হয়েছে যে, মূল কারণ থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো গেছে। এবং সুদের হারকেই ধরা হয়েছে 'নন্দঘোষ' রূপে। এই কৌশলটা সূচনাতে মুদ্রাস্ফীতি রোধে কিছুটা সফলতা এনে দিতে পারে বটে, কিন্তু এটা তো ইতোমধ্যেই এমন বহু শক্তিশালী উপাদানে গতি সঞ্চার করেছে, যা আনুষঙ্গিক নানান প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। দেশটাকে তখন এমন একটা পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হবে যে, তখন তা আর সামলানোই যাবে না। এবং সেই সঙ্গে বেকারত্বও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, রক্ষণশীল সরকারের চিন্তা-চৌবাচ্চার (Think-tank) জন্য অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনার আধার-কেন্দ্রের জন্য, কোন উপদেশ বড় বড় অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ আর্থিক পরিকল্পনাবিদ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকার, এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। সুদের উচ্চ হার কমানোর ক্ষেত্রে যে স্বেচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রিতা, তার পিছনে যথেষ্ট কারণ থাকা উচিত ছিল। একটা ফাঁকা অজুহাত অবশ্য দেখানো হয়, এবং তা হচ্ছে, জাতীয় অর্থনীতির টিকে থাকার স্বার্থেই মুদ্রাস্ফীতির গতিকে কমিয়ে ফেলতে হবে, এবং সেজন্যই নাকি প্রয়োজন সুদের উচ্চ হারের। এটা কি সম্ভব হতো, যদি সুদের নিম্ন হারের সময়টা বর্তমান সরকারের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক না হতো? সম্ভবতঃ এটা বিলম্বিত করা হবে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না আসা পর্যন্ত। সুদের হার কমিয়ে ফেললে সমাজের সর্বস্তরের লোকেরা যে তাৎক্ষণিক একটা স্বস্তি বোধ করতো সেটাও চলে যেতো টরীদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের পক্ষেই। এটা যদি অনেক আগেই করা যেত, তাহলে যে প্রতিক্রিয়া বা উপসর্গের কথা আমি উল্লেখ করে এসেছি, তা দেখা দিতে শুরু করতো এবং সুদের নিম্ন হারের কারণে যে সাময়িক ফায়দা লাভ হতো তাও শোধবোধ হয়ে যেতো।

এই অবাঞ্ছিত অবস্থা যে সব কারণে লাগাম-ছাড়া হয়ে যাবে তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ

(ক) সুদের উচ্চ হার ইতোমধ্যে শুধু যে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকেই চুষে খেয়েছে তা নয়, বরং তা শিল্প কারখানার জীবন শিরাকেও সংকুচিত করে ফেলেছে।

(খ) এর ফলে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য যে ছুটাছুটি করতে হয়, তা নিশ্চিতরূপেই বৃটীশ জনগণের একটা বৃহৎ অংশকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছে। যারা তাদের মাথার উপরে একটু খানি ছাদ নির্মাণ করার জন্য টাকা ঋণ নিয়েছে তারা খুব সতর্কতার সঙ্গেই তাদের বন্ধকী সম্পত্তির হিসাব কষেই তা নিয়েছে। তারা তাদের বন্ধকী ঋণ শোধের যোগ্যতাও কমিয়ে ফেলেছে এবং তাদের দৈনন্দিন বাজেটকেও সংকুচিত করে ফেলেছে। তারা ইতোমধ্যেই তাদের অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যান্য বাজে খরচাদি কমিয়ে ফেলেছে। এতে আর যা-ই হোক তাদেরকে কিছুটা টানাটানিতে পড়তে হচ্ছে। বৃটীশ জনসাধারণের এই অংশটা তো কোনক্রমেই মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী নয়। কিন্তু পরিহাস যে, জনগণের এই অংশটাই সব চাইতে বেশী শাস্তি পাচ্ছে সরকারের এই তথাকথিত মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী পদক্ষেপের দরুন, যা কিনা গ্রহণ করা হয়েছে সাধারণ মানুষের উপকারার্থে দ্রব্যমূল্য কমানোর উদ্দেশ্যেই। ইত্যবসরে তাদের ঘরবাড়ীর দাম খাড়া উর্ধ্বগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং তারা এমন একটা উভয় সংকটে পড়েছে যে, তারা একদিকে না পারছে তাদের উচ্চ হারের দেনা পরিশোধ করতে, অপরদিকে না পাচ্ছে এমন কোন ক্রেতা যার কাছে তারা তাদের সম্পত্তি বিক্রী করে দিতে পারে।

(গ) মুদ্রাস্ফীতি একটা জটিল বিষয়। বিষয়টার উপরে অহেতুক অধিক সময় দেওয়া এই বক্তৃতার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু কতকগুলো কারণে– যা একটু পরে আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই– তার জন্য আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে কিছুটা সময় চেয়ে নিচ্ছি।

আর সব কিছুর মধ্যে, মুদ্রাস্ফীতির বলকে ছেড়ে দেওয়া যায় তখন, যখন ক্রেতাদের হাতের অতিরিক্ত টাকা কৃত্রিমভাবে জিনিষপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি করে অথচ সরবরাহ থাকে কম। অতিবেশী টাকা কিন্তু মালপত্র অতি কম। কিনবার টাকা থাকলেও মাল পাওয়া যায় না। কিন্তু, সম্ভবতঃ বৃটিশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই অবস্থাটার সৃষ্টি হয়নি। সরবরাহকৃত অর্থের বৃহত্তর অংশটা, এক্ষেত্রে, বৃটিশ শিল্প-কারখানায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং এতে করে দেশী বাজারে ভোগ (Consumption) বেড়ে গিয়েছিল। এই সঙ্গে যোগ হয়েছিল, কর-রেয়াত ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্টার্লিং-এর মডারেট বা কম বিনিময় হারের প্রভাব। স্টার্লিং-এর এই মডারেট বিনিময় হার বৃটেনের উৎপাদিত পণ্যের প্রতি বহির্দেশের ক্রেতাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছিল। এর ফলে বৃটিশ শিল্প কারখানার সুবিধা হচ্ছিল, যা কিনা দেশীয় বাজারের বর্ধিষ্ণু সম্প্রসারণের দরুন ইতোমধ্যেই সাধারণভাবে সুবিধা পাচ্ছিল।

সেই অর্থনীতি যাকে যাকাত ক্রমবর্দ্ধমানভাবে চলমান রাখে একটা প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রে।

এমন একটা অবস্থার কথা চিন্তা করুন, যেখানে কোন ব্যক্তি তার স্বল্প মূলধন নিয়ে সরাসরি কোন ব্যবসায় নামতে পারছে না, এবং সেখানে এমন কোন ব্যাংকও নেই যে, তা থেকে সে তার গচ্ছিত টাকার উপরে সুদসহ ঋণ নিতে পারে। তথাপি, যদি সেই গচ্ছিত টাকা যাকাত ধার্য হওয়ার মত যথেষ্ট হয়, তাহলে ট্যাক্স আদায়কারীরা ফি বছরে তার দুয়ারে কড়া নাড়বে সেই পুঁজির একটা শতকরা হিস্যার জন্য। (যাকাতের জন্য কোন নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমারেখা নেই)। অনুরূপ সব ব্যক্তির জন্যই তখন দু'টো বিকল্প থাকবে, হয় তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে টাকা খাটাতে হবে লাভজনক ভাবে; নয়তো তাদেরকে তাদের সবার সম্পদ একত্রিত করে ছোট বা বড় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এতে করে যৌথ মূলধনী কারবার, অংশীদারী কারবার, ছোট ছোট কোম্পানী অথবা পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং-এর মাধ্যমে বড় বড় কোম্পানীও সৃষ্টি হবে, এবং তা হবে সম্পূর্ণরূপে লাভ ও ক্ষতির ভিত্তিতেই। এই জাতীয় কোম্পানীগুলো কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে কোন ধার গ্রহণ করবে না, বিধায় সুদসহ ঋণ শোধ করারও কোন ব্যাপার তাদের থাকবে না। যখন আপনি এই শ্রেণীর কোম্পানীগুলোর ভাগ্যের সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগুলোর কোম্পানীগুলোর ভাগ্যের তুলনা করবেন, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে, এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে থেকে এদের সমস্যা এবং সংকটের মোকাবেলা করছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যবসায় এবং শিল্পের অবনতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান চাহিদার কারণে উৎপাদন কমিয়ে ফেললে তা তাদেরকে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে। তাদের ঋণের জন্য যে সুদ তাদেরকে দিতে হবে তা ততদিন পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বাড়তেই থাকবে, যতদিন না ঐ কোম্পানীগুলোর পক্ষে চালু থাকা অসম্ভব হবে।

অপর পক্ষে, যদি কোন অর্থনীতিকে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয় তাহলে, কারবার ও ব্যবসায়িক সুবিধাদির মন্থরতা ব্যবসায় ও শিল্পকে মাত্র একটা জড়তার অবস্থায় ঠেলে দিতে পারবে। এবং এটা ঘটবে ঠিক সেইভাবে যেভাবে প্রকৃতি কঠিন দুর্যোগ ও প্রতিকূল অবস্থার সময়ে যোগ্যতমের উর্দ্বতনকে নিশ্চিত করে। শক্তির জোগান কমে গেলে উৎপাদন কমাতেই হবে, নইলে শক্তির ক্রান্তি সীমা (Critical level) অর্থাৎ শক্তির যে সীমাটা টিকে থাকার জন্য জরুরী, তা আরও নীচে নেমে যাবে। ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে যেহেতু ঋণ পরিশোধের কোন চাপ নেই, সেহেতু তা অবনতি বা ঘাটতির সময়ে আরও বেশী চাপ ও চ্যালেঞ্জ বরদাস্ত করতে সক্ষম।

সুদের নিষিদ্ধকরণ

ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতি চলে সম্পূর্ণরূপে সুদের উপকরণ ছাড়াই। তবু, এমন কোন ঐতিহাসিক বা সমসাময়িক নযীর নেই যা থেকে বুঝা যাবে যে, সুদ না থাকার ফলে মুদ্রাস্ফীতির দানব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে নিয়ে গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সমসাময়িক কালে, আমাদের জন্য একটা খুব মজার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এবং তা হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতির উপরে সুদের হারের যে প্রভাব এবং সুদের অনুপস্থিতির যে প্রভাব, তার মধ্যে তুলনা করে দেখার সুযোগ।

মাও সে তুং-এর আমলে চীনের সরকার অর্থনীতির উপরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিল। তন্মধ্যে কতকগুলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। কতকগুলে খুব চমৎকার ফল দিয়েছিল। কিন্তু, মাও সে তুং -এর পূরা আমলটাতে , অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক কোন ক্ষেত্রেই সুদের কোন ভূমিকাই ছিল না। তথাপি, এই গোটা সময়টাতে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির তেমন বড় কোন ঘটনা ঘটেনি। বস্তুতঃ যখন সামগ্রিক উৎপাদনের স্তর বা লেভেল, অবশেষে উপরে উঠে যায়, দ্রব্যমূল্য তখন নিম্নমুখী হয়।

এই তুলনায়, পৃথিবীর সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা বেশী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ইসরাঈলে মুদ্রাস্ফীতির হারও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রেকর্ডকৃত দ্রুততম হারের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য, এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো এবং যুদ্ধ পরবর্তী অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিপতিত ইয়োরোপ, বিশেষ করে, জার্মানী। তবে, ঐ সময়টা স্বাভাবিক ছিল না। অন্য সব কিছু সমান সমান থাকলে, যে কোন অর্থনীতিতে সুদের ভূমিকাকে মুদ্রাস্ফীতিকারী (inflationary) বলা ছাড়া অন্য কিছু বলার উপায় নেই।

বৃটেনে সুদের উচ্চ হার

বৃটেনে, সম্প্রতি, সুদের চড়া হারের ভাল ও মন্দ নিয়ে যে তীব্র বিতর্ক চলছে, তা এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একটা ভাল দৃষ্টান্ত হতে পারে। বেশ কিছুদিন ধরে রক্ষণশীল সরকার সুদের হার সাংঘাতিক রকম উঁচুতে রেখেছে, এবং এর কারণ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে যে, এতে করে ব্যক্তি-ভোগ নিয়ন্ত্রণে থাকবে , ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঠেকানো যাবে। এই পলিসির দরুন যে চাপের সৃষ্টি হয়েছে তার নীচে চাপা পড়ে ইতোমধ্যেই অর্থনীতির চিঁচিঁ করা শুরু হয়েছে, কাত্‌রানী শুরু হয়েছে।

এই গবেষণা থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছুই পাওয়া যেতে পারে। অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে এই গবেষণা এমন কিছু অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে পেশ

করে, যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়েছে এমন একটা থিওরী বা তত্ত্বের ভিত্তিতে যা কিনা স্বয়ং বিতর্কিত।

সুদের হার যতই বাড়বে, মুদ্রাস্ফীতি ততই কমবে, এই ধারণাটাই মনে হয় একমাত্র কারণ, যার দরুন এদ্দিন যাবৎ সুদের হারকে একটা অস্বাভাবিক উঁচু স্তরে রাখা হয়েছে।

গ্রেট বৃটেনে যা ঘটছে, সে সম্পর্কে আমাদের এই সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতার জন্য সুদের হার কখনই প্রকৃত দোষী ছিল না। অর্থনীতির বহু বহু ক্ষেত্রে, অবশ্যই, সঠিক কোন ব্যবস্থাপনা ছিল না। যার ফলে, বর্তমান সময়ে, মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুদের হার বৃদ্ধির দ্বারা শুধু এতটুকু হয়েছে যে, মূল কারণ থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো গেছে। এবং সুদের হারকেই ধরা হয়েছে 'নন্দঘোষ' রূপে। এই কৌশলটা সূচনাতে মুদ্রাস্ফীতি রোধে কিছুটা সফলতা এনে দিতে পারে বটে, কিন্তু এটা তো ইতোমধ্যেই এমন বহু শক্তিশালী উপাদানে গতি সঞ্চার করেছে, যা আনুষঙ্গিক নানান প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। দেশটাকে তখন এমন একটা পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হবে যে, তখন তা আর সামলানোই যাবে না। এবং সেই সঙ্গে বেকারত্বও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, রক্ষণশীল সরকারের চিন্তা-চৌবাচ্চার (Think-tank) জন্য অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনার আধার-কেন্দ্রের জন্য, কোন উপদেশ বড় বড় অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ আর্থিক পরিকল্পনাবিদ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকার, এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। সুদের উচ্চ হার কমানোর ক্ষেত্রে যে স্বেচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রিতা, তার পিছনে যথেষ্ট কারণ থাকা উচিত ছিল। একটা ফাঁকা অজুহাত অবশ্য দেখানো হয়, এবং তা হচ্ছে, জাতীয় অর্থনীতির টিকে থাকার স্বার্থেই মুদ্রাস্ফীতির গতিকে কমিয়ে ফেলতে হবে, এবং সেজন্যই নাকি প্রয়োজন সুদের উচ্চ হারের। এটা কি সম্ভব হতো, যদি সুদের নিম্ন হারের সময়টা বর্তমান সরকারের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক না হতো? সম্ভবতঃ এটা বিলম্বিত করা হবে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না আসা পর্যন্ত। সুদের হার কমিয়ে ফেললে সমাজের সর্বস্তরের লোকেরা যে তাৎক্ষণিক একটা স্বস্তি বোধ করতো সেটাও চলে যেতো টরীদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের পক্ষেই। এটা যদি অনেক আগেই করা যেত, তাহলে যে প্রতিক্রিয়া বা উপসর্গের কথা আমি উল্লেখ করে এসেছি, তা দেখা দিতে শুরু করতো এবং সুদের নিম্ন হারের কারণে যে সাময়িক ফায়দা লাভ হতো তাও শোধবোধ হয়ে যেতো।

এই অবাঞ্ছিত অবস্থা যে সব কারণে লাগাম-ছাড়া হয়ে যাবে তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ

(ক) সুদের উচ্চ হার ইতোমধ্যে শুধু যে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকেই চুষে খেয়েছে তা নয়, বরং তা শিল্প কারখানার জীবন শিরাকেও সংকুচিত করে ফেলেছে।

(খ) এর ফলে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য যে ছুটাছুটি করতে হয়, তা নিশ্চিতরূপেই বৃটীশ জনগণের একটা বৃহৎ অংশকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছে। যারা তাদের মাথার উপরে একটু খানি ছাদ নির্মাণ করার জন্য টাকা ঋণ নিয়েছে তারা খুব সতর্কতার সঙ্গেই তাদের বন্ধকী সম্পত্তির হিসাব কষেই তা নিয়েছে। তারা তাদের বন্ধকী ঋণ শোধের যোগ্যতাও কমিয়ে ফেলেছে এবং তাদের দৈনন্দিন বাজেটকেও সংকুচিত করে ফেলেছে। তারা ইতোমধ্যেই তাদের অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যান্য বাজে খরচাদি কমিয়ে ফেলেছে। এতে আর যা-ই হোক তাদেরকে কিছুটা টানাটানিতে পড়তে হচ্ছে। বৃটীশ জনসাধারণের এই অংশটা তো কোনক্রমেই মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী নয়। কিন্তু পরিহাস যে, জনগণের এই অংশটাই সব চাইতে বেশী শাস্তি পাচ্ছে সরকারের এই তথাকথিত মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী পদক্ষেপের দরুন, যা কিনা গ্রহণ করা হয়েছে সাধারণ মানুষের উপকারার্থে দ্রব্যমূল্য কমানোর উদ্দেশ্যেই। ইত্যবসরে তাদের ঘরবাড়ীর দাম খাড়া উর্ধ্বগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং তারা এমন একটা উভয় সংকটে পড়েছে যে, তারা একদিকে না পারছে তাদের উচ্চ হারের দেনা পরিশোধ করতে, অপরদিকে না পাচ্ছে এমন কোন ক্রেতা যার কাছে তারা তাদের সম্পত্তি বিক্রী করে দিতে পারে।

(গ) মুদ্রাস্ফীতি একটা জটিল বিষয়। বিষয়টার উপরে অহেতুক অধিক সময় দেওয়া এই বক্তৃতার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু কতকগুলো কারণে– যা একটু পরে আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই– তার জন্য আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে কিছুটা সময় চেয়ে নিচ্ছি।

আর সব কিছুর মধ্যে, মুদ্রাস্ফীতির বলকে ছেড়ে দেওয়া যায় তখন, যখন ক্রেতাদের হাতের অতিরিক্ত টাকা কৃত্রিমভাবে জিনিষপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি করে অথচ সরবরাহ থাকে কম। অতিবেশী টাকা কিন্তু মালপত্র অতি কম। কিনবার টাকা থাকলেও মাল পাওয়া যায় না। কিন্তু, সম্ভবতঃ বৃটিশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই অবস্থাটার সৃষ্টি হয়নি। সরবরাহকৃত অর্থের বৃহত্তর অংশটা, এক্ষেত্রে, বৃটিশ শিল্প-কারখানায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং এতে করে দেশী বাজারে ভোগ (Consumption) বেড়ে গিয়েছিল। এই সঙ্গে যোগ হয়েছিল, কর-রেয়াত ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্টার্লিং-এর মডারেট বা কম বিনিময় হারের প্রভাব। স্টার্লিং-এর এই মডারেট বিনিময় হার বৃটেনের উৎপাদিত পণ্যের প্রতি বহির্দেশের ক্রেতাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছিল। এর ফলে বৃটিশ শিল্প কারখানার সুবিধা হচ্ছিল, যা কিনা দেশীয় বাজারের বর্ধিষ্ণু সম্প্রসারণের দরুন ইতোমধ্যেই সাধারণভাবে সুবিধা পাচ্ছিল।

ফলে, যুক্তিসঙ্গতভাবেই উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হ্রাস হওয়া উচিৎ ছিল। তাতে উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন নির্দিষ্ট অনুৎপাদনশীল খরচাসমূহ পুষিয়ে যেত। বাদ থাকতো শুধু প্রান্তিক উৎপাদন খরচ, যা অনুরূপ পণ্যের উৎপাদন পরবর্তী (ex-factory) মূল্যের দ্বারা মেটানো যেত। এমনকি অধিকতর মুনাফার ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাসের জন্য উৎপাদনকারীদেরকে পর্যাপ্ত ভর্তুকীও দেওয়া যেত।

দীর্ঘদিনের উচ্চ সুদের হার বৃটিশ অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে বিপরীতমুখী করে দিয়েছে, যা আগামীতে দারুণ ক্ষতিকর পরিণতি ডেকে আনবে। ইতোমধ্যে, যে সকল বিদেশী বাজার তাদের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে সেগুলিকে পুনরায় হস্তগত করাও দুরূহ হবে।

(ঘ) ইয়োরোপে যেসব পরিবর্তন ঘটছে, তাতে পশ্চিম জার্মানীর (বা বলতে পারেন জার্মানীর) বর্তমান শক্তিশালী অর্থনৈতিক দেহে আরও অধিক রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতিবাচক প্রভাব, যা পূর্ব থেকে সৃষ্টি হয়ে আছে তাও বৃটিশ অর্থনীতিতে অশুভ প্রতিক্রিয়ার সূচনা করবে। বর্তমান সরকার সুদের হার কমানোর অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিয়ে অহেতুক গড়িমসি করতে পারেন বটে, কিন্তু পরবর্তী সরকার এবং তা যদি রক্ষণশীল (Conservative) পার্টিরই হয়, তাহলে তাকে নিজেদের পার্টির পূর্ববর্তী সরকারের বহু বিশাল সমস্যায় উত্তরাধিকার সূত্রেই জড়িয়ে পড়তে হবে। এই আলোচনা থেকে যে বিষয়টি ফুটে উঠছে তা সারা দুনিয়ার নীতি নির্ধারকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সুদ একটি হাতিয়ার হিসেবে খোলা বাজার অর্থনীতির ধারণার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সুদ-জড়িত পুঁজির দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত কোন অর্থনীতিকেই পুরোপুরি মুক্ত অর্থনীতি বলে ঘোষণা করা সম্ভব নয়, বিশেষতঃ সেই সরকারের যদি এই এখতিয়ার থাকে যে, সে খুশীমত সুদের হার বাড়াতে বা কমাতে পারবে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরকারকে শোষণের এইরূপ সুযোগ দেয় না।

সুদের অন্যান্য ক্ষতিকর দিক

সুদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করাটা সম্ভবতঃ, এক্ষত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আন্তঃব্যাংক সুদের হার দেওয়া হয় শুধু সমগ্র জমার উপরে, সাধারণ জমাকারীদের সঞ্চয়ী হিসাবের উপর দেওয়া হয় না। সুদের চক্রবৃদ্ধিজনিত (compounding) কার্যকারিতা সত্ত্বেও, ছোট অঙ্কের কোন জমার উপরে প্রাপ্ত সুদ অর্থের প্রকৃত ক্রয়

ক্ষমতার অনেক নীচে থাকে। যদিও স্বল্প মেয়াদী হার উঠানামা করতেই থাকে,তবু পরবর্তীকালে, জমার উপরে প্রাপ্ত সুদ মুদ্রাস্ফীতির হারের নীচেই থেকে যায়। অপর পক্ষে, কোন ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত সমপরিমাণ মূলধন প্রকৃত অর্থেই বৃদ্ধি পেতে পারে।

একটা সুদ-নির্ভর সমাজে, পুঁজিওয়ালারা সব সময়েই টাকা ধার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা এটাও খোঁজখবর নিয়ে দেখে না যে, কর্জ গ্রহণকারীর কর্জ পরিশোধ করার ক্ষমতা আছে কি না। কর্জগ্রহণকারীদের পক্ষে, খুব কম সংখ্যক লোকই এমন আছে যে, তারা তাদের পরিশোধ করার ক্ষমতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। তারা প্রায় জানেই না যে, মহাজনদের কাছ থেকে– তা সেই মহাজন শাইলকের মত কেউ হোক বা কোন নামকরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যাংকই হোক– টাকা ধার নেওয়ার অর্থই হচ্ছে তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ আয় থেকে ধার নেওয়া। এর ফলে, তারা তাদের জীবন যাপনে সামর্থ্যের অধিক ব্যয় করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে যেমন অমিত-ব্যয়িতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৃদ্ধি পায় পরিশোধ করার এবং ওয়াদা রক্ষা করার অক্ষমতা। এই সমস্ত সমাজ ভোগ-চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা অবাস্তব বৃদ্ধি ঘটায়।

সুদের এই অশুভ দিকটা যে সকল অর্থনীতিতে কার্যকর আছে সেগুলির আরও বেশী আলোচনার, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

একটা সমাজে যখন সবাই সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবন যাপনের মান বজায় রেখে চলতে চায়, তখন সেখানে একটা বাতিক (obsession) সৃষ্টি হয়। যে বাতিককে প্রশ্রয় দেওয়া হয় সর্বশেষ মডেলের এটা ওটা নানান কিছুর বিজ্ঞাপনের দ্বারা। যেগুলিতে সাধারণ মানুষের কাছে ধনীদের জীবনযাপন প্রণালী তুলে ধরা হয়, তুলে ধরা হয় সর্বশেষ ডিজাইনের সোফাসেট, বিলাসদ্রব্য, সুসজ্জিত অতি আধুনিক রান্নাঘর, গোসল-খানা ইত্যাদির চিত্র।

স্বল্প আয়ের মানুষেরাও এগুলি কিনতে চায় এবং তারা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য সহজলভ্য টাকার প্রতি নযর দেয়। অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই এর অর্থ দাঁড়ায়, তারা যা আয় করে, খরচ করে তার চেয়ে অনেক বেশী। এর দেনার উপরে তাদেরকে যদি কোনও সুদ নাও দিতে হয়, তবু এর দরুন তার বর্তমান ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বটে, কিন্তু এর পরিবর্তে তার ভবিষ্যৎ ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

মনে করুন, কোন ব্যক্তির মাসিক আয় ১,০০০ (এক হাজার) টাকা এবং সে বাজারে গিয়ে দামী দামী জিনিষপত্র কিনলো ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার, যে টাকাটার সবটাই সে জোগাড় করেছে হাওলাত করে। এবং সে এও ঠিক করেছে যে, সে তার এই ধার করা টাকাটা শোধ করবে মাসিক কিস্তিতে। ধরুন, সে কষ্টেসৃষ্টে তার সাংসারিক সব খরচ চালায় ৬০০ (ছয়শ) টাকায় এবং বাদ বাকী ৪০০ (চারশ) টাকা দিয়ে সে ঋণ শোধ করে প্রতি মাসে। এতে করে তার পূরো ঋণ (৪০,০০০ টাকা) শোধ করতে সময় লাগবে ১০০মাস অর্থাৎ আট বৎসর চার মাস। এবং তার এই সময়টা লাগবে শুধু আসল টাকাটা শোধ করতেই। এই দীর্ঘ সময়ের শুরুতে যে দেনা সে করলো তার বদলে যে সুবিধাটুকু সে পেল তা হচ্ছে, সে তার সেই অধৈর্যকে তৃপ্ত করলো এবং বাসনাকে পূর্ণ করলো, যেজন্য তাকে অপেক্ষা করতে হতো ১০০ মাস বা আট বৎসর চার মাস।

কিন্তু, যদি এমন হয় যে, ধার করা ঐ ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার উপরে ধার্য সুদও পরিশোধ করতে হবে তাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার অবস্থা পূর্বের চাইতে আরও বেশী শোচনীয় হবে। ধরুন, এই দেয় সুদের হার শতকরা ১৪ (চৌদ্দ) টাকা। তাহলে, বলাই বাহুল্য, তার ঋণের বোঝা আরও অনেক বেশী বড় হবে। ফলে, তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা যেমন একদিকে কমে যাবে তেমনি, অপরদিকে, তার ঋণ শোধের সময়ও দীর্ঘতর হবে। এমতাবস্থায়, সেই ব্যক্তিকে মুখ বুঝে কমবেশী ২০ (বিশ) বছর ধরে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, এবং তাকে আরো বেশী কষ্ট স্বীকার করে তার বেসবুরীর মাশুল দিতে হবে মাসে ৫০০ (পাঁচশ) টাকা করে। যার মোট পরিমাণ দাঁড়াবে চক্রবৃদ্ধিহারে বর্ধিত সুদসহ ১,২০,০০০ (এক লক্ষ কুড়ি হাজার) টাকা। এবং এই সম্পূর্ণ টাকাটা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার নিস্তার নেই।

ক্ষতিটা যে ঋণগ্রহীতার, ঋণদাতার নয়, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। ঋণদাতা তো হচ্ছে, শোষণের একটা অত্যন্ত শক্তিশালী পদ্ধতির অংশবিশেষ, যে পদ্ধতিতে, মুদ্রাস্ফীতি ও ঋণ-ক্ষতির (Loan loss) জন্য সুবিধা দান সত্ত্বেও, ঋণদাতা তার পকেটে আরও বেশী টাকা ভরতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি হলে এই আলোচ্য ঋণগ্রহীতার অবস্থা আরও বেশী শোচনীয় হবে। তার ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পেতেই থাকবে। তার পক্ষে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাত্র ৬০০ (ছয় শ') টাকায় মাসকাবারী ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে না। এমন ভাগ্যবানের সংখ্যা তো নিতান্তই কম যারা মুদ্রাস্ফীতির সমান হারে বার্ষিক বর্ধিত বেতন (Increament) পায়।

এই অবস্থাটার আরো বেশী অবনতি ঘটে সেই সমাজে যেখানে লোকেরা আরও বেশী বেশী সুখ-ভোগের পিয়াসী। তাদের পক্ষে এটা সম্ভবই হয় না যে, কয়েক মুহূর্ত বেপরওয়াভাবে খরচ করার কারণে, তারা নিজেদের উপরে কৃচ্ছতা চাপিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করবে। তারা আরও বেশী বেপরওয়া হয়ে আরও বেশী টাকা ঋণ করে, এবং তাদের খরচাদি তাদের আয়ের সীমা পেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ফলে, তেমন ব্যক্তির আগামী কয়েক দশকের উপার্জন, তার ক্রমবর্ধমান ঋণ-পরিশোধ (debt-servicing) এবং তার অনুষঙ্গী অন্যান্য সমস্যাদির দরুন, ঋণদাতা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে।

সামগ্রিকভাবে, এই শ্রেণীর অর্থনীতি অনিবার্যরূপেই ধাবিত হয় ভীষণ সংকটের দিকে। আপনি তো আর আর্থিক সংকটের শীর্ষে না পৌছানো পর্যন্ত বর্তমানের কাছে আপনার ভবিষ্যৎকে সীমাহীনভাবে বন্ধক রাখতে পারেন না। এবং এই সংকট তো সৃষ্টি হয় দায়িত্বহীনভাবে খরচ করার জন্যই, এবং এজন্যই তো আবার মুদ্রাস্ফীতির হারও যায় বেড়ে। মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য যদি সুদের হার বাড়ানো হয় এই আশায় যে, এতে করে খরচের জন্য অর্থ কম পাওয়া যাবে, তাহলে তা ঘটনা পরম্পরায় এমন একটা শৃংখল সৃষ্টি করবে যার অবশ্যম্ভাবী চূড়ান্ত পরিণতি হবে অর্থনৈতিক মন্দা।

এই অবস্থাটা জাতীয় পর্যায়ে খারাপ তো বটেই; কিন্তু এটা যদি অন্যান্য দেশের অর্থনীতিতেও দেখা দেয়, তাহলে একটা বিশ্বজোড়া মন্দা গোটা মানবজাতির উপরেই চেপে বসবে। এবং এই ধরনের বিশ্বব্যাপী মন্দার পরিণাম হবে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলা।

তখন, দেউলিয়াত্ব এবং বিলুপ্তিকরণ বাড়তে থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হবে। বিদ্যমান বেকারত্বের হার বাড়তে থাকবে। স্থাবর সম্পত্তিসংক্রান্ত ব্যবসাদি নষ্ট হতে থাকবে, সর্বত্র একটা সামগ্রিক হতাশা বিরাজ করবে ফলে, বাড়তে থাকবে আশ্রয়হীনতা, বঞ্চনা, প্রতারণা এবং অপরাধ। এমনটা ঘটলেও, বিস্ময়ের কিছু থাকবে না যে, পুঁজিবাদী অটল চ্যাম্পিয়নদের আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অবস্থাটা শুধু সেই সকল ব্যক্তির ব্যক্তিগত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না যারা তাদের পরিশোধের ক্ষমতার চাইতে বেশী ঋণ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ গোটা শিল্প ব্যবস্থাটাই তখন সাময়িক লাভের বিনিময়ে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। শুরুর পর্যায়ে অবশ্য, দেশ শিল্পখাতে যথেষ্টই লাভবান হয়। এতে করে দেশে তৈরী পণ্য সামগ্রীর দাম কমে যায়। ব্যক্তির কাছে অর্থ হস্তান্তরিত করাতে শুধু যে তার ক্রয়-ক্ষমতাই বাড়ে তা নয়, তাতে জাতীয় শিল্পের উৎপাদনের উপরেও প্রভাব সৃষ্টি হয়। চাহিদা বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বাড়ে, এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দামও কমে যায়। এর দরুন, জাতীয় শিল্প

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সুযোগও লাভ করে। তখন সব কিছুকেই মনে হয় উজ্জ্বল ও কুসুমাস্তীর্ণ। অতঃপর, দেখা দেয় অপ্রীতিকর পরিণাম।

যখন অধৈর্য এবং সামর্থ্যের চাইতে অনেক বেশী বেশী খরচ করার দরুন, সামগ্রিক ভাবে গোটা সমাজটাই ব্যাংকগুলোর কাছে ঋণের দায়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তখন গোটা সমাজেরই ক্রয়-ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে তার চৌহদ্দীর মধ্যেই আটকা পড়ে। এমতাবস্থায়, শিল্পের পক্ষে, চালু ও প্রতিযোগিতামূলক থাকার জন্য, বৃহত্তর বিদেশী বাজার অন্বেষণ ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না। যে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি যত ছোট, সে দেশ তত শীঘ্র অন্ধ-গলিতে প্রবেশ করে। এবং যে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি যত বড়, সে দেশ তত বিলম্বে বুঝতে পারে তার আসন্ন সংকট।

দৃষ্টি দেওয়া যাক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দিকে, দেখা যাক সেখানে কি ঘটছে। সন্দেহ নেই, এটা এমন একটা দেশ যার শিল্পকে চালু রাখবার মত নিজস্ব বিশাল দেশী-বাজার আছে। এমন কি, অনেক অর্থনীতিবিদ এমনও বিশ্বাস করেন যে, আমেরিকা যদি বাদবাকী দুনিয়াটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও পড়ে, তবু এর দেশী বাজারের যে সম্প্রসারিত ভিত্তি রয়েছে তা এর শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার গ্যারান্টি দিতে পারবে। কিন্তু,এই অর্থনীতিবিদরা এক্ষত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনি যদি উপরে আলোচিত ব্যাপারটাকে আমেরিকান দৃশ্যপটে বিবেচনা করেন, তাহলে আপনি নিশ্চয় দেখতে পারেন যে, এক্ষেত্রেও সেই একই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য আর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। প্রশ্নটা কেবল সময়ের। বিশাল ঘাট্তি বাজেট এবং হাজার হাজার কোটি ডলারের অনাদায়ী ঋণ সহ, যুক্তরাষ্ট্র, সামগ্রিকভাবে, ইতোমধ্যেই অতি-ব্যয়ে জর্জরিত হয়ে পড়েছে এবং আমেরিকার জনগণকেও ঋণের ভারী বোঝা বইতে হচ্ছে, যা তাদেরকে শোধ করতে হবে ভবিষ্যতে। এতে করে, সামগ্রিকভাবে, জাতীয় ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাবে, অথবা ঋণদাতা সংস্থাগুলো দেউলিয়া হয়ে যাবে। এটা শুধু আকারের প্রশ্ন। কিন্তু, প্রকৃতির নিয়ম অনিবার্যরূপে কাজ করে যাবে এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে তা সমভাবেই প্রযোজ্য হবে।

গ্রীষ্মের দিনে, সুইমিং পুল ও পুষ্করিণীগুলো আবহমণ্ডলের কারণে দ্রুত গরম হয়ে উঠে, কিন্তু হ্রদগুলোর বেলায় এমনটা ঘটতে কিছুটা দীর্ঘ সময় লাগে। অনুরূপভাবে, বড় বড় সমুদ্রগুলোর চাইতে ছোট ছোট সমুদ্রগুলো শীঘ্র তপ্ত হয়ে ওঠে। তথাপি, সেগুলোর প্রত্যেকটাই একই অনিবার্য ভাগ্য বরণ করে। প্রশান্ত মহাসাগর উতপ্ত হয়ে উঠতে এত দীর্ঘ সময় লাগে যে, এর বিশাল জলরাশি গরম হয়ে ওঠতে ওঠতেই, এর উপকূলবর্তী দেশগুলোতে শীতের বাতাস বইতে শুরু করে। এ কারণেই, এর জলবায়ু অপেক্ষাকৃত ছোট মহাসমুদ্রগুলোর উপকুলবর্তী দেশগুলোর জলবায়ুর চাইতে অধিকতর পরিমিত বা নাতিশীতোষ্ণ।

অর্থনৈতিক মহাসমুদ্রগুলোর অবস্থাও অদ্রূপ। ধার-কর্জ করা টাকা দিয়ে খরচ করার যে দর্শন তা মূলতঃ এত বেশী বক্র যে, তা থেকে সোজা-সরল সৎ ফলাফল আশা করাটাই একটা পাগলামি।

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার প্রত্যেকেরই গোচরীভূত হওয়া দরকার। যখন শিল্প এবং জাতীয় অর্থনীতি শ্বাসরুদ্ধকর পর্যায়ে পৌছে যায় তখন দরিদ্র এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ধনী ও উন্নত দেশগুলোর বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির তেজস্ক্রিয় কবলে পড়ে ক্রমবর্ধমান বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

এটা আরও দ্রুত শুরু হয়, শিল্পোন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতাদের চাপ সৃষ্টির কারণে। তারা চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, বাজারগুলোতে বেশী বেশী পণ্য-দ্রব্য বিক্রী করার জন্য যাতে শিল্পকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অক্ষুণ্ন রাখা যায়। এর দরুন যে সমস্যাটার মোকাবেলা তাদেরকে করতে হয় তার দু'টো দিকঃ

(১) জনগণের আধুনিক আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে পড়া,

(২) শিল্পগুলো কর্তৃক নিজেদের টিকে থাকার গরজে জনগণের আরও বেশী সুখভোগ ও আরাম আয়েশের জন্য নতুন নতুন পণ্য-দ্রব্যাদি উদ্ভাবিত করা এবং তার প্রতি জনগণকে প্রলুব্ধ করে তোলা।

কোন রাজনৈতিক সরকারের পক্ষেই জনগণের উচ্চতর জীবনযাত্রার মানের জন্য লাগাতার চাপ বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। তাকে যে কোন মূল্যে অর্থনীতিকে চালু রাখতেই হবে।

স্পষ্টতঃই, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে উন্নত দেশগুলোর জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে তাদের অর্থনীতির, পূর্বের চাইতে অধিক, রক্তমোক্ষণ করতে হবে। এমতাবস্থায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনর্গঠনশীল অর্থনীতিগুলোতে এখন যে নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে তার কি হবে? এবং সাবেক কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার নতুন নতুন উঠতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিদেশী বাজারের যে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তারই বা কি হবে? তাছাড়া, সমাজতন্ত্রী এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দরিদ্র ও নিঃস্ব-উদ্বাস্তু জনসাধারণের কামনা-বাসনা ও আশা-আকাংখা নিয়ে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো যে ব্যাপক ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে, তারইবা কি হবে? এই সব বিষয়গুলো একত্রে অব্যাহত থাকলে, তাতে পৃথিবীর চেহারার যে শুভ কোন পরিবর্তন ঘটবে না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুদ ঃ শান্তির প্রতি হুমকী স্বরূপ

অতীব গুরুত্ববহ এই সতর্কবাণী যা উচ্চারিত হয়েছে অত্যন্ত জোরালোভাবে মানবজাতির সম্মুখে পবিত্র কোরআন কর্তৃক আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে, যাতে বলা হয়েছে যে, সুদভিত্তিক অর্থনীতি পরিণামে গোটা মানবজাতিকে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের প্রতি ধাবিত করবে।

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ
مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝ يَمْحَقُ
ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟
فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝ وَإِن كَانَ
ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

"যারা সুদ খায় তারা সেইভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান সংস্পর্শে এনে জ্ঞান-বুদ্ধিহারা করে ফেলে। এটা এই কারণে যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত'; অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয়, তাহলে অতীতে যা কিছু হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র নিকট ন্যস্ত। এবং যারা পুনরায় ইহা করবে, তারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হবে, সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।'

'আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করবেন এবং দানকে বৃদ্ধি করবেন। বস্তুতঃ, কোন কাফের, পাপীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না।

'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রভুর নিকটে আছে, এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে তোমরা সুদের যা কিছু বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও।'

'এবং যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রয়েছে। এইরূপে তোমরা কারো উপর যুলুম করবে না, এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না এবং যদি কোন (ঋণী) ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে (তার) স্বচ্ছলতা (আসা) পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে, এবং তোমাদের দানরূপে ছেড়ে দেওয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" (আল্ বাকারা -২ঃ ২৭৬-২৮১)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে খোদাতালার তরফ থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, খোদার নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী পুঁজিবাদী সমাজগুলোকে শাস্তি দান করা শুরু করবে তখন, যখন ইতোপূর্বে আলোচিত বিষয়গুলো আখেরে মানুষকে পরিচালিত করবে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের দিকে। গরীবের অধিকার যখন হরণ করা হয়, যখন সমাজে শোষণ চলতে থাকে তখনই শুরু হয় বিশৃংখলা, অরাজকতা এবং যুদ্ধ। 'তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর' – কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, যে রাষ্ট্র সুদের উপর নির্ভর করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তা এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ে অনিবার্যরূপেই শেষ হয়ে যাবে, যখন জাতিগুলো সব একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

হাতে সময় থাকলে, আমি সুদের এই দিকটা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে পারতাম। পবিত্র কোরআনে যে সমস্ত আয়াতে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তার পরবর্তী আয়াতগুলোতেই যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা সুদ ও যুদ্ধের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। যারা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস জানেন তারা মনে করতে পারবেন যে, পুঁজিবাদ শুধু এই সব যুদ্ধ লাগানোর পিছনেই ধ্বংসাত্মক ভূমিকাই পালন করেনি, এগুলোকে দীর্ঘায়িত করার পিছনেও একই ভূমিকা পালন করেছে।

সম্পদ মজুদ করা নিষেধ

ইসলাম সব ধরনের শোষণ এবং অসদুপায়কে প্রত্যাখ্যান করে। যেমন, সম্পদ, পুঁজি, দ্রব্য-সামগ্রী জমিয়ে রাখা, এবং সরবরাহকে এমনভাবে চালিয়ে দেওয়া যাতে করে মূল্যের গতি ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং ব্যাপকভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। পবিত্র কোরআন বলেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ
وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ
عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ
تَكْنِزُونَ ۝

"হে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় ইহুদী যাজক ও সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকে অধিকাংশই অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

'(সেই দিন) যেদিন উহাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং উহা দ্বারা তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বদেশে এবং তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে (এবং তাদেরকে বলা হবে) এ তো সেই বস্তু যা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করতে, সুতরাং তোমরা যা মজুদ করতে (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ কর।"- (আত্ তাওবা- ৯:৩৪,৩৫)

তথাপি, ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধভাবে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় উপার্জন করবার স্বাধীনতা দান করে। প্রত্যেক ব্যক্তির এই স্বাধীনতা ও অধিকার রয়েছে যে, সে সম্পদ আহরণ করবে এবং এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগও গ্রহণ করবে।

দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তোলার ব্যাপারে সব দেশের সরকারগুলোর দৃষ্টি যে বিষয়টার প্রতি নিবদ্ধ থাকে, তা হচ্ছে, কীভাবে সমাজের এক ব্যক্তি তার জীবিকা উপার্জন করে। ট্যাক্স ধার্য করা হয় বিক্রয়ের পরিমাণের উপরে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের মুনাফার উপরে এবং চাকুরীর উপার্জনের উপরে। এটা করা হয়ে গেলে, ব্যক্তির আর্থিক ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করা হয় না। মোটকথা, জাতীয় স্বার্থ শুধু একজনের আয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সেই ব্যক্তি কীভাবে ও কেমনভাবে তার অর্জিত ও মজুদকৃত আয় খরচ করছে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলোর প্রায় কোনটারই কোন ভূক্ষেপ নেই। কেউ যদি ইচ্ছা করে, তবে সে তার ব্যক্তিগত আয় বা সম্পদ নর্দমায় ফেলে দিতে পারে। সে ইচ্ছা করলে দু'হাতে সম্পদ উড়াতে পারে, আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। অথবা, সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে ইচ্ছা করলে কৃপণতা অবলম্বন করতে পারে। সে কি করে, কীভাবে তার টাকা-পয়সা খরচ করবে বা তা কাজে লাগাবে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রের করণীয় কিছুই নেই।

কিন্তু ধর্ম এই এলাকার ভিতরেও পা বাড়ায়। ধর্ম এটা করে উপদেশ ও পরামর্শদান করার মাধ্যমে। ধর্ম কোন ব্যক্তিকে শুধু এটাই বলে না যে, কীভাবে তার উপার্জন করা উচিত; বরং এও বলে যে, কীভাবে তার অর্জিত সম্পদ খরচ করা উচিত, কিংবা উচিত নয়। ব্যয় সম্পর্কিত প্রায় সব আদেশই প্রাথমিকভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ স্বরূপ। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, ইসলাম যখন মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুখ ও আনন্দভোগের বাড়াবাড়ি নিষেধ করে, তখন যদিও তা সরাসরি এই উদ্দেশ্যে করা হয় না যে, এতে করে ব্যয় বাজেট সঠিকভাবে নিরূপিত হবে, তবু সেই লক্ষ্যটাও অর্জিত হয়ে যায়, এবং তা অর্জিত হয় ধর্মীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপজাত হিসেবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলোতে, এই জাতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদেশাবলীকে মনে করা হয় মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনধিকার চর্চা, এবং ব্যক্তির

ব্যয় করার অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ করা। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গীটা মানুষের কাছে নতুন কিছু নয়।

পবিত্র কোরআনের মতে, পূর্ববর্তী যামানার জাতিসমূহ এবং সভ্যতাগুলোও ধর্ম সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাবই প্রদর্শন করতো। যার ফলে, অনেক সময় এই বিতর্কের সৃষ্টি হতো যে, মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ধর্মের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা। যখন, হযরত শোয়াইব (আঃ- প্রাচীনকালের একজন নবী) মিদীয়ানের অধিবাসীদেরকে এই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, কীভাবে টাকা-কড়ি খরচ করা উচিত, এবং কীভাবে উচিত নয়, তার উত্তরে লোকেরা তাঁকে তিরস্কার করতোঃ

قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن
نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟
إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۝

"তারা বললোঃ হে শোয়াইব! তোমার এবাদত-বন্দেগী কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার উপাসনা করে আসছে আমরা তাকে পরিত্যাগ করি, অথবা আমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আমরা যা করতে চাই তাও (পরিত্যাগ করি)? তুমি তো দেখছি বড় বুদ্ধিমান, ন্যায় বিচারক!" (হুদ ১১ঃ৮৮)।

সাদাসিধে জীবনযাপন

ইসলাম সাদাসিধেভাবে জীবনযাপন করতে বলে। অপব্যয় করতে নিষেধ করে, কৃপণতা করতে বারণ করেঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ
فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝

"এবং (কৃপণতা করে) তুমি তোমার হাত বেঁধে রেখো না, এবং (অপব্যয় করে) তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করো না, অন্যথায় তুমি নিন্দিত, ক্লান্ত হয়ে বসে পড়বে।" (বনী ইসরাঈল -১৭ঃ৩০)

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ
وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ
كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ۝

"এবং আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও, এইরূপে মিসকীন ও পথচারীদেরকেও। এবং (তোমাদের ধন-সম্পদ) কোন প্রকারে অপব্যয় করো না।

"নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই, এবং শয়তান তার প্রভুর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (বনী ইসরাঈল-১৭ঃ২৭,২৮)

বিয়ে-শাদীতে ব্যয়

বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানাদি গরীব ও ধনী পরিবারগুলোর মধ্যে যে কায়দায় উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে তা রীতিমত একটা স্পর্শকাতর ব্যাপার। ব্যাবধানটা এত বিরাট যে, এতে করে যে সব গরীব পিতামাতার ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে তাদের জন্য ব্যাপারটা ভয়ানক উৎকণ্ঠা ও অন্তর্জ্বালার কারণ না হয়ে পারে না।

প্রচুর ব্যয়-বহুল বিবাহোৎসব, জাঁকজমক, ধুমধাম, ফুটানি, বড়লোকী দেখানো প্রভৃতি সব কিছুকেই ইসলাম নিন্দা করে। বস্তুতঃ আমরা ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে দেখতে পাই যে, বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানগুলো এত সাদাসিধে ভাবে উদযাপিত হতো যে, অনেকের কাছে সেগুলোকে মনে হতো বিবর্ণ। যদিও আশেপাশের সমাজগুলোর প্রথা-পর্ব, রীতি-নীতি থেকে নানা নতুনত্ব ও কদাচার মুসলিম বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করেছিল, তবু এর মৌলিক যে অনুষ্ঠান তা ধনী-দরিদ্র উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান সরল, সাদামাটা এবং ব্যয়বহুল্যহীন।

'নিকাহ্' -অর্থাৎ বিয়ের ঘোষণা দেওয়া হয় সাধারণতঃ মসজিদে সকলের উপস্থিতিতে, যেখানে ধনী-দরিদ্র সবাই একইভাবে সমবেত থাকে। মসজিদ তো আর ধুমধাম করা বা জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনীর জায়গা নয়, মসজিদ হচ্ছে এবাদতের ঘর।

আনন্দ ও খুশী প্রকাশের জন্য যে বিবাহোত্তর দাওয়াত বা ওলীমা ইত্যাদি করা হয়, তার ব্যাপারে ধনীদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যে অনুষ্ঠানে গরীবদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অভিশপ্ত। সুতরাং, এসব অনুষ্ঠানে আপনি দামী দামী পোষাক পরিহিত সুসজ্জিত ধনীদের পাশাপাশি অতি নিম্নমানের পোষাক পরিহিত গরীবি হালতে উপস্থিত গরীবদেরকেও দেখতে পাবেন।

এতে যেমন ধনীদের চোখ খুলে, তেমনি গরীবরাও তাদের সঙ্গে একত্রে বসে উন্নত মানের সুস্বাদু খাদ্য পানীয় , ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপভোগ করতে পারে।

গরীবের দাওয়াত গ্রহণ

বিত্তশালী ও সমাজ ব্যবস্থার উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদেরকে যদি কোন গরীব থেকে গরীব ব্যক্তিও তার পর্ণকুটীরে নিমন্ত্রণ জানায় তবে তাদেরকে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য জোরালো ভাষায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, আগে থেকেই যদি তাদের কোন নির্ধারিত ব্যস্ততা বা প্রতিশ্রুতি বা কোন অসুবিধা থাকে তবে সে ভিন্নকথা। কিন্তু, ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সাঃ) এটা বরাবর একটা প্রাক্‌টিস ছিল যে, তিনি এমনকি সর্বাপেক্ষা গরীব ব্যক্তিটিরও দাওয়াত কবুল করতেন। যারা তাঁকে (সাঃ) তাঁদের পবিত্র মনীব হিসেবে মানতেন ও ভালবাসতেন তারা তাঁর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাতে গৌরবান্বিত বোধ করতেন। অবশ্য, সমকালীন সমাজে, ধনী ব্যক্তিরা যদি গরীবদের সকলেরই দাওয়াত গ্রহণ করে, তাহলে গরীবদের সঙ্গে খানাপিনা করা ছাড়া তাদের আর অন্য কাজ করবার ফুরসৎ মিলবে না। তবে, মাঝেমধ্যে এ ধরনের দাওয়াতে শামিল হতে হবে, যাতে করে ঐ উপদেশের মর্ম ও স্পিরিটকে অক্ষুণ্ন রাখা যায়।

আমরা ইতোপূর্বে বলে এসেছি যে, মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ। অতএব, ধূমধাম ও হৈ চৈ-পূর্ণ পান-ভোজনের উৎসবাদি এমনিতেই বাদ পড়ে যায়। ব্যয়বাহুল্য এবং অতিরিক্ত উচ্চ মানের জীবনযাত্রাকে নিষেধ করে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা শুধু বিয়েশাদীর ব্যাপারেই প্রয়োজ্য নয়, বরং তা মানবীয় কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই শিক্ষার সৌন্দর্য এটাই যে, এটা জোর করে চাপানো হয়নি, উপদেশ ও ভালবাসার মাধ্যমে দান করা হয়েছে, অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

পরিমিত খাদ্যাভ্যাস

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ
وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ۝

"হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় সৌন্দর্য অবলম্বন কর, এবং আহার কর ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না, কারণ তিনি অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না।" (আল্ আরাফ - ৭৪৩২)

সময় থাকলে আমি ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতাম, যার একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে খাদ্য-দ্রব্যাদির নষ্ট করা বন্ধ করা। তবু, বিষয়টা নিয়ে পরে, সংক্ষেপে হলেও, আমি কিছু বলবো।

টাকা-পয়সা ধার করা

জীবনযাপনের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য টাকা-পয়সা কর্জ করার ব্যাপারে ইসলাম জোরালোভাবে এবং বারবার করে বলে যে, জরুরী অবস্থায় যে ঋণ দেওয়া হয় তা যেন সুদমুক্ত হয়। যাদের আছে তারা যেন যাদের নেই তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দান করে। এটাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ঋণগ্রহীতা যদি তার আর্থিক অনটনের দরুন সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে তাকে আরও সময় দিতে হবে। ঋণ গ্রহীতাকে নিকট আত্মীয়রা সাহায্য করতে পারে। কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকেও ঋণ শোধ করা যেতে পারে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা দিয়েও দায় মুক্ত করা যেতে পারে। ঋণী ব্যক্তি যদি তার পাওনা টাকা মওকুফ করে দেয়, তাহলে সেটাই হবে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সব চাইতে উত্তম। তবে, যে ঋণ গ্রহীতা তার ঋণ পরিশোধে সক্ষম তার উচিত শর্ত পালন করা এবং যথাসময়ে ঋণ শোধ করা। পারলে গৃহীত ঋণের চাইতে কিছু বেশী পরিমাণে ফেরৎ দেওয়া। এটা অবশ্য বাধ্যতামূলকও নয়, পূর্ব-নির্ধারিতও নয়; নইলে এটাও আবার 'সুদ' এর ব্যাপক সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে যাবে। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা হচ্ছেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ
ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ
فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ
مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ

إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟
أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ
عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾
وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ
ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ
ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমরা নির্দিষ্ট কালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেনদেন কর, তখন তোমরা তা লিখে নেও। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন তা ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দেয়, এবং লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, কারণ আল্লাহ্ তাকে শিখিয়েছেন; অতএব সে যেন লিখে; এবং যার উপরে (ঋণ-শোধের) দায়িত্ব সে যেন (সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু) লেখায়, এবং তার প্রভু আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং তার মধ্যে যেন সে কিছু কম না করে। কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং (বিষয়বস্তু) লিখাতে অসমর্থ হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে (বিষয়বস্তু) লিখায়। এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে উপস্থিত দর্শকদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর একজন পুরুষ এবং দু'জন স্ত্রীলোককে (সাক্ষীরাখ), এইজন্য যে, দু'জন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন ভুলে যায়, তাহলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হয়, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। এবং লেনদেন ছোট হোক কিংবা বড় হোক তোমরা তা

মেয়াদসহ লিখতে অবহেলা করো না। এটা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত এবং প্রমাণের জন্য সর্বাধিক দৃঢ় এবং সর্বাধিক নিকটবর্তী পন্থা, যাতে তোমরা সন্দেহে পতিত না হও। কিন্তু যদি নগদ কারবার হয়, যাতে তোমরা পরস্পর (মাল ও মূল্যের) বিনিময় কর, সেরূপ ক্ষেত্রে এর কোন লেখা-পড়া না করলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তাবে না। এবং যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখো, এবং লেখক ও সাক্ষী কাউকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। কিন্তু যদি তোমরা এরূপ কর তাহলে তা তোমাদের অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। বস্তুতঃ, আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।" (আল্‌ বাকারা -২ঃ২৮৩, ২৮৪)

একটা কথা স্মরণ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই আয়াতগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অপপ্রয়োগ করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ বহির্ভূত ভাবে ব্যবহারও করা হয়েছে। এবং এটা করেছে সেই সব মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন উলেমা বা পণ্ডিতরা যারা জিদ করেই বলে থাকে যে, ইসলামের মতে একজন মাত্র স্ত্রীলোকের সাক্ষী যথেষ্ট নয়। তাদের কথা হচ্ছে, প্রতিটি আইনগত শর্ত পূরণের জন্য যেক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষ্যই যথেষ্ট, সেক্ষেত্রে একজন পুরুষ সাক্ষীর তুলনায় দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষীর প্রয়োজন। তারা এই আয়াতগুলির অর্থের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামী আইনশাস্ত্রমতে পুরুষ ও স্ত্রীলোক সাক্ষীর যে ভূমিকা সে সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে। তারা মনে করে যে, পবিত্র কোরআন যখন বলে যে, সাক্ষী হিসেবে একজন পুরুষ হলেই চলবে, তখন তার জায়গায় তার বদলে দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে। এমনিভাবে, দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের বদলায় চারজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে; চারজন পুরুষ সাক্ষীর বদলায় প্রয়োজন হবে আটজন স্ত্রীলোক সাক্ষীর .....।

এই ধারণাটা এত অবাস্তব এবং কোরআনী শিক্ষার সঙ্গে এত সম্পর্কহীন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় বিষয়টির ব্যাপারে মধ্যযুগপন্থীদের অবস্থান দেখে যে কেউ বিরক্ত না হয়ে পারে না। এই আয়াতগুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রণিধানযোগ্যঃ

১. এ আয়াতগুলিতে একথা আদৌ বলা নেই যে, উভয় স্ত্রীলোককেই সাক্ষ্য দিতে হবে;

২. দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটির ভূমিকা পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে এবং তাঁর সেই ভূমিকা তিনি পালন করবেন মাত্র একজন সহকারীরূপে, তার বাইরে নয়;

৩. দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি, যিনি সাক্ষ্যদান করছেন না, তিনি যদি দেখেন যে, সাক্ষীর প্রদত্ত বয়ানের কোন অংশ থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে, সাক্ষী চুক্তির মর্ম সঠিকভাবে

অনুধাবন করতে পারেননি, তাহলে তিনি সাক্ষীকে বিষয়টা সঠিকভাবে মনে করিয়ে দিতে পারেন এবং সাক্ষীকে তার উপলব্ধি শোধরাতে সহায়তা করতে পারেন, অথবা তাঁর স্মরণকে তাজা করে দিতে পারেন।

৪. এটা সম্পূর্ণরূপে সাক্ষ্যদানকারিণী স্ত্রীলোকটির এখতিয়ারাধীন যে, তিনি তার সহায়তাকারিণীর সঙ্গে একমত হবেন কি, হবেন না। তার সাক্ষ্যই একমাত্র স্বাধীন সাক্ষ্যরূপে স্বীকৃত এবং তিনি যদি তার সহায়তাকারিণীর সঙ্গে একমত না হন, তাহলে তার কথাই চূড়ান্ত।

কিছুটা ভিন্ন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকুর পর, এখন আমরা আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই।

ইসলামের শিক্ষানুসারে চুক্তি-সম্পাদনের বিশেষ প্রয়োজনীয় দিকগুলো হচ্ছেঃ

মালপত্র বিক্রীর বেলায়, ঋণগ্রহীতার সঙ্গে ঋণের দলীল লেখার সময় সাক্ষীদের সামনে শর্তাদি নিরূপণ করা; অঙ্গীকার পূরণে সম্পূর্ণরূপে সততা রক্ষা করা এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করা; ট্রাস্টীদের সততার সঙ্গে ট্রাস্টের দায়িত্বাবলী পালন করা। এসবই ইসলাম কর্তৃক চুক্তি সম্পদনে আরোপিত বাধ্যবাধকতার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যাবলীর আওতাভুক্ত।

মনে রাখতে হবে যে, যে অর্থনীতিতে সুদমুক্ত ঋণ দেওয়া হয়, সেখানে ঋণদাতা অহেতুক ঋণ দিয়ে দিয়ে অর্থনীতিকে স্ফীত করে তুলবে না। সুতরাং সমাজের ক্রয় ক্ষমতা যুক্তিযুক্ত সীমার মধ্যেই থাকবে এবং তা সম্পর্কযুক্ত থাকবে বর্তমানের সঙ্গে। ভবিষ্যৎ থেকে ধার করবার প্রবণতা আপ্‌সে আপ দূরীভূত হবে। এই পটভূমিতে স্থাপিত শিল্প অবশ্যই সুদৃঢ় থাকবে এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকির সব উত্থান-পতন কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

ইসলাম এমন একটা জীবনযাপন পদ্ধতি বা লাইফ-স্টাইলের চর্চা করে যা সহজ সরল এবং যার মধ্যে, সত্য বলতে কি, যদিও কোন কৃপণতা নেই, তবু তা এমন আড়ম্বরপূর্ণ ও অপব্যয়ী না যে, তা গরীবদের মনে লাগে এবং তাদের অন্তর্জ্বালার কারণ হয় এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করে।

অর্থনৈতিক শ্রেণী-পার্থক্য

এ ব্যাপারে একটা বিষয় ভালভাবে বোঝা উচিত যে, কিছু সংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ জমা হওয়াটাই শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার এক মাত্র কারণ নয়। বরং মালিক ও শ্রমিক এবং জমিদার ও কৃষকের মধ্যে পুঁজির বিভাজন দ্বারাও শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

একটা শ্রেণী-সমাজ সৃষ্টির আরও বহুবিধ কারণ আছে। এ সম্পর্কিত সবগুলো উপাদানের উল্লেখ করাই সম্ভব নয়, এবং এটাও সম্ভব নয় যে, কী করে সেগুলো যৌথভাবে বা এককভাবে শ্রেণী সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

ঐতিহ্যগত ভারতীয় সমাজের উপরে গবেষণা চালালে, হাজার বছর যাবৎ বিবর্তিত এক সমাজ কাঠামোর অস্তিত্বের একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। দেখা যাবে যে, বিবর্তনের গোটা ব্যাপারটা সম্পদ বিতরণের কারণে প্রভাবান্বিত হয় নি, বরং তা প্রভাবান্বিত হয়েছে গোত্রীয়, সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কারণের দ্বারা। বহিরাক্রমণ, অভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ, উত্তরণের জন্য সংগ্রাম এবং শাসন-দমনের এক দীর্ঘ ইতিহাস সংরক্ষিত আছে ভারতের বর্ণ-ব্যবস্থার ভেতরে, যা খণ্ড খণ্ড বহুবিধ শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে।

মার্কস এই অবস্থাটার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি এ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে পত্র লিখেছিলেন নিউ ইয়র্কের 'দি হেরাল্ড ট্রিবিউনে'। তিনি এই অবস্থাকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দর্শনের সঙ্গে বিসদৃশ বলে মনে করেছেন। অবশেষে মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই শ্রেণী-ব্যবস্থা থাকার কারণেই ভারতে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা একবারেই ক্ষীণ।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সমাজে শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়াটা কেবল তখনই ক্ষতিসাধন করতে শুরু করে, যখন সেখানে অর্থ কীভাবে ব্যয় করা উচিত, সে ব্যাপারে কার্যকর কোন নীতিমালা থাকে না। এমন একটা সমাজের কথা ধরুন, যেখানে মানুষ সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করে, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার ও বাসস্থানের জন্য খামাখা অতিরিক্ত খরচ করে না। যার দরুন, সেখানে কে কত সম্পদ মজুদ করলো, বা কত জনের হাতে কত টাকা জমলো, সে নিয়ে কারও কোন মাথা ব্যথা থাকে না। যেখানে সামান্য সংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ জমা হওয়াটাই মনোকষ্টের কারণ হয় না। মনোকষ্ট শুরু হয় তখনই যখন তারা আড়ম্বর করে বড়লোকী দেখায়ে তাদের টাকা পয়সা খরচ করতে থাকে।

সম্পদ তখনই ক্ষতিকর হয় বা মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যখন তা বেহিসাব ব্যয় করা হয়; যথেচ্ছ অপব্যয় করা হয় বা অপচয় করা হয়। ধনীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা এবং সেই সঙ্গে তাদের ফুটানী, লোক-দেখানো আড়ম্বর, জাঁকজমক, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি যখন গরীবরা, যারা কষ্টেসৃষ্টে কোন মতে জীবনযাপন করে, তাদের নিম্নমানের জীনবযাত্রার অবস্থান থেকে দেখা হয়, তখন সম্পদের বিষম বিতরণ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে নানাভাবে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে।

সুতরাং, ইসলাম কোন ব্যক্তির উপার্জন করা এবং তা জমা করার স্বাধীনতার উপরে খামাখা হস্তক্ষেপ করে না। এবং ইসলাম সরকারী বা পাবলিক সেক্টরের চাইতে প্রাইভেট সেক্টরকেই বেশী অনুপ্রাণিত করে, উৎসাহিত করে।

ইসলাম জীবনযাত্রার একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দান করে, যা সত্যিকার অর্থে যথাযথভাবে পালন করা হলে, জীবন সকলের জন্যই প্রফুল্লকর ও সহজ-সরল হয়ে

উঠবে।

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের এই দিকটা নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই, এ বিষয়ে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন

সম্পদের বিতরণের ক্ষেত্রে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৃত ব্যক্তির সম্পদের নির্ধারিত অংশ তার ওয়ারিশদের যেমন, পিতা মাতা, স্বামী বা স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন সবার মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। কাউকে তার প্রাপ্য ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা তার হক্ এবং এই হক্ খোদাপ্রদত্ত, অবশ্য, কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকলে সে ভিন্ন কথা। তবে, তার বৈধতা নিরূপণ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত, কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়। কোন ব্যক্তি চাইলে তার সম্পত্তির সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ অন্য কাউকে বা কোন প্রতিষ্ঠানকে উইল করে দান করতে পারবে। (দ্রঃ সূরা নিসা, ৪ঃ৮-১৩)। এই ব্যবস্থাগুলো যথারীতি কার্যকর হলে, মাত্র স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ জমা হওয়ার, পুঞ্জীভূত হওয়ার আর কোন সুযোগ থাকবে না।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন মোতাবেক, জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার লাভের বিধি অথবা জমিদারী বা তালুক ইত্যাদির অবিভাজ্যতার বিধি, অথবা দাতার খেয়াল-খুশীমত উইল করার অবাধ ক্ষমতা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকারের সম্পত্তি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভাগ ভাগ হতে থাকে। যার ফলে, দেখা যায় যে, তিন-চার সিঁড়ির বা প্রজন্মের পরেই বড় বড় জমিদারীও ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে। এতে করে জমির উপরে কোন একচেটিয়া মালিকানা টিকতে পারে না, এবং কোন কায়েমী স্বার্থভোগী শ্রেণীরও উদ্ভব ঘটতে পারে না।

ঘুষ নিষিদ্ধ

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم
بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

"এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, এবং তা কর্তৃপক্ষের নিকট (ঘুষ হিসেবে)পেশ করো না, যাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জেনে শুনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে পার।" (আল্ বাকারা ২ঃ১৮৯)

এই বিষয়টা, যা কিনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, তার প্রতি আমি পরে দৃষ্টি দেব 'ব্যক্তিগত শান্তি' শীর্ষক আলোচনায়।

বাণিজ্যিক নীতিমালা

ইসলাম না পুঁজিবাদকে অস্বীকার করে, না বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে; বরং উভয় পদ্ধতির সব ভাল দিক ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে।

নিম্নে বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে দেখা যাবে যে, চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই ইসলাম একটা সুষ্ঠু বাণিজ্যিক নীতিমালা দান করেছে, যা আধুনিক মানুষ, অবশেষে, আবিষ্কার করেছে অনেক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করার পর

১. ইসলামী বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে নিরংকুশ আস্থা এবং সততা- (আল্ বাকারা -২ঃ২৮৩,২৮৪)।

২. ইসলাম ওজনের ত্রুটিযুক্ত নিক্তি, বাটখারা ইত্যাদি ব্যবহার করতে এবং ওজনে কম দিতে নিষেধ করে,{আত্ তাৎফিফ-(মুতাফ্ফেফীন)-৮৩ঃ২-৪}।

৩. বিক্রেতাদেরকে ত্রুটিযুক্ত বা পচা বা রদ্দী মালপত্র বিক্রী করতে নিষেধ করা হয়েছে ইসলামে। কোন বিক্রেতা তার কোন মালের ত্রুটি গোপন রেখে তা বিক্রী করতে পারবে না (মুসলিম)। যদি, তেমন কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রেতার অজান্তেই বিক্রয় করা হয়, তাহলে জানার পর ক্রেতার অধিকার থাকবে সেই ত্রুটিযুক্ত মাল ফেরৎ দেওয়ার এবং মূল্য ফেরৎ নেওয়ার (হাদীস)।

৪. কোন বিক্রেতা তার মালের দাম একেক জনের কাছে একেক রকম চাইতে পারবে না, যদিও তার এই অধিকার আছে যে, সে ক্রেতাদের যাকে খুশী যত খুশী বাটা দিতে পারবে। সে নিজে তার জিনিষপত্রের দাম যুক্তিসঙ্গত ভাবে ধার্য করতে পারবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫. ইসলাম অসঙ্গত বা অন্যায় প্রতিযোগিতা বারণ করে এবং সেই সকল কার্টেলকেও নিষিদ্ধ করে যেগুলো অনুরূপ অন্যান্য প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। নীলামে মাল বিক্রীর সময় মিথ্যা ডাক দিয়ে মালের দাম বাড়াতে কিংবা ছল-চাতুরী করে অতিরিক্ত দাম হেঁকে সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রতারিত করতে নিষেধ করে ইসলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

৬. তেমনিভাবে, ইসলাম চায় যে, কেনা-বেচা যেন খোলামেলাভাবে হয়, সাক্ষী সাবুদের সামনে হয়, এবং ক্রেতাকে যেন ভালভাবে অবহিত করা হয় যে, সে কি কিনছে। (আল্ বাকারা ২ঃ২৮৩, ২৮৪)

সব কথার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, ইসলাম ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার ব্যবধান কমানোর পক্ষে সম্ভাব্য সকল পন্থাই অবলম্বন করে। এতদুদ্দেশ্যে ইসলামঃ

ক) অনেক ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যেমন, পূর্বেই বলা হয়েছে- মদখাওয়া, জুয়াখেলা ইত্যাদি;

খ) সম্পদ মজুদ করে রাখা এবং তার উপর সুদ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করে;

গ) প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করে;

ঘ) সম্পদের দ্রুত সরবরাহকে উদ্বুদ্ধ করে;

ঙ) সাদাসিধে, সরল ও বিনয়ী জীবনযাত্রাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবলম্বন করার জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের প্রতি বার বার আবেদন জানায়, উপদেশ দেয়, নির্দেশ প্রদান করে; যাতে করে তা গরীবের নাগালের একবারেই বাইরে না থাকে।

এ সমস্ত কিছুর অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে অন্যদের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল করে তোলা, এবং তার ভেতরের পশুসুলভ ও বিকৃত প্রবৃত্তিগুলোকে দমন করা, নিধন করা। দম্ভ, ভণ্ডামি, বড়লোকী, উন্নাসিকতা বা হীনমন্যতা, গর্ব, অহংকার, ঔদ্ধত্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থেই জেহাদ পরিচালনা করা। মানুষের মধ্যে যা কিছু শীলিত, মার্জিত ও মহৎ, তা সব কিছুকেই প্রকাশিত করা এবং তাকে অপরের দুঃখকষ্টের প্রতি এমনভাবে সংবেদনশীল করে তোলা যাতে সে অনেক সময় অনুভব করে যে, যখন অন্যেরা দুঃখে-কষ্টে দিনাতিপাত করে এবং অভাবে অনটনে জর্জরিত হয়ে শোচনীয় অবস্থায় কোনমতে প্রাণে বেঁচে থাকে, তখন বিলাসী ও আরাম আয়েশের জীবনযাপন করাটা একটা অপরাধ।

অবশ্য, তেমন উঁচুস্তরের সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা যারা মহৎ মানবিক মূল্যবোধের দিশারী, তাদের সংখ্যা খুবই কম। তবু সমাজে অন্য সবার কল্যাণের জন্য সামগ্রিক-ভাবে একটা চেতনা এমন একটা সম্মানজনক স্তরে পৌঁছায় যে, তাদের পক্ষে এটা আর সম্ভবই হয় না যে, তারা কেবল নিজেদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য চাহিদা ও আরাম-আয়েশ নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং সমাজের কম ভাগ্যবান ব্যক্তিদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি উদাসীন থাকে। জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর শুধু অন্তর্মুখী থাকে না। তারা জীবনের একটা বৃহত্তর চেতনা নিয়ে তাদের চতুষ্পার্শ্বের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে শিখে। তারা অস্বস্তি বোধ করে, যদি না তারা অন্যদের দুঃখদৈন্য লাঘবে বস্তুগতভাবে সহায়তা করতে পারে এবং যদি না তাদেরও জীবনযাত্রার মান বাড়াতে পারে।

এই শ্রেণীর সমাজের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের একবারে প্রথম দিককার এক আয়াতে, যার উল্লেখ পূর্বেও একবার এক বক্তৃতায় করা হয়েছেঃ

وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝

"এবং আমরা তাদেরকে যে রিযক্ দান করেছি তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে।" (আল্ বাকারা -২ঃ৪)

মৌলিক চাহিদা

পূর্ববর্তী 'আর্থ-সামাজিক শান্তি' আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইসলাম কী করে গরীব ও অভাবী ব্যক্তিদেরকে দেয় ভিক্ষার ধারণা বা কন্‌সেপ্টের মধ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করেছে। জাতীয় সম্পদের মধ্যে ব্যক্তির অধিকার কতটুকু তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে যে মানদন্ড কোরআন করীম আমাদেরকে দিয়েছে তা দিয়ে আমরা নিরূপণ করতে পারি, কি পরিমাণ সম্পদ–যা সাধারণ মানুষের মধ্যে সরবরাহ হতে পারতো তা–স্থানান্তরিত হয়েছে মাত্র কতিপয় পুঁজিপতির হাতেঃ

وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۝

"এবং তারা, যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্দিষ্ট হক্; তাদের জন্যেও যারা (সাহায্য) চাইতে পারে, এবং তাদের জন্যেও যারা চাইতে পারে না।" (আল্ মা'আরিজ ৭০ঃ২৫,২৬)।

এই আয়াত দু'টিতে ধনীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সম্পদের একটা অংশের উপরে বৈধ মালিকানা আছে গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের।

আমরা কী করে এটা নির্ণয় করতে পারবো যে, সমাজে যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ হচ্ছে, গরীবদের যে হক্ বা অধিকার ছিল তা হস্তান্তরিত হয়ে গেছে মাত্র কয়েকজন ধনী ব্যক্তির হাতে?

এর জন্য মাপকাঠি হচ্ছে, নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত কতিপয় অধিকার। ইসলামের মতে, মানুষের মৌলিক চাহিদা হচেছ চারটি, যেগুলিকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। কোরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۝

"নিশ্চয় এটা তোমার জন্য (বিধিবদ্ধ) করা হয়েছে যে, তুমি সেখানে ক্ষুধার্তও থাকবে না, এবং উলঙ্গও থাকবে না; এবং তুমি সেখানে তৃষ্ণার্তও থাকবে না; এবং রৌদ্রেও পুড়বে না।" (ত্বা'হা -২০ঃ ১১৯,১২০)

সুতরাং , ইসলাম মৌলিক চাহিদার সর্বনিম্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চার দফার একটি চার্টার বা সনদ পেশ করেছে, যেগুলির পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রেরঃ

১. খাদ্য
২. বস্ত্র
৩. পানি
৪. আশ্রয়

এমনকি, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাদের কোন আশ্রয় বা বাসস্থান নেই এবং যাদেরকে ডাস্টবীনের নোংরা আবর্জনা ঘেঁটে ঘেঁটে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করে তার দ্বারাই ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়। এই কুৎসিৎ দৃশ্য পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরের দুরবস্থা উৎঘাটিত করে দেয় এবং তার ভেতরের ব্যাধির উপসর্গগুলোকে বাইরে প্রকটিত করে তোলে। বস্তুবাদ তার চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বার্থপরতা এবং স্থবিরতার জন্ম দেয়, এবং অপরের দুঃখ কষ্টের প্রতি মানবিক সংবেদনশীলতাকে নিস্পৃহ ও অকেজো করে ফেলে।

অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের প্রায় দেশগুলোতে নিদারুণ দারিদ্র্যজনিত দুঃখদৈন্যের আরও বেশী কুৎসিৎ দৃশ্যাবলী চোখে পড়ে, কিন্তু সেখানকার গোটা সমাজটাই দরিদ্র, এবং দেশগুলো চলেও সেই একই পুঁজিবাদী নীতির ভিত্তিতে। কাজেই, প্রশ্ন এটা নয় যে, এই দেশগুলোর অধিবাসীরা খৃষ্টান, না ইহুদী, না হিন্দু, না মুসলিম, না মুশরেক, - পদ্ধতিটাই সেখানে আসলে প্রকৃতিগতভাবে পুঁজিবাদী।

বিশ্বের তথাকথিত উন্নত জাতিগুলোর মধ্যে অপরাধ দেদার ছড়িয়ে পড়ছে, পাপ প্রচুর হচ্ছে, বিশেষতঃ, নির্দিষ্ট পল্লীগুলোতে, যেগুলোর অস্তিত্বই মানবতার চেহারার উপরে কলংকের দাগ স্বরূপ।

আফ্রিকার এমন অনেক এলাকা আছে, এবং অন্যান্য অনেক দেশও এমন আছে, যে সকল স্থানে সমাজের অধিকাংশ মানুষ সাথে করে নেওয়ার মত এক ঘটি পানিও পায় না। আপনি যদি সারাদিনে এক বেলা পেট ভরে খেতে পান, তাহলে আপনাকে মনে করতে হবে, আপনি ভাগ্যবান। আর পানি? সে তো এক দৈনন্দিন সমস্যা। পৃথিবীতে এমন বহু দেশ আছে, যাদের এমন শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে যে, তারা সামান্য কষ্ট বরদাস্ত না করেও মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে

পারে। তবু তো, এই দেশগুলো গরীব দেশগুলোর কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য তাদের সম্পদ ও সামর্থ্যকে কাজে লাগাবার কোন তোয়াক্কাই করে না।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের মতে, কোন এক ব্যক্তির দঃখ-দুর্দশার জন্য কেবল সেই দেশের সমাজই দায়ী নয়; বরং যে কোন দেশের যে কোন সমাজের যে কোন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা গোটা মানবজাতিরই দুঃখ-দুর্দশা–যে মানবজাতির না আছে কোন ভৌগলিক সীমানা, না কোন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা রাজনৈতিক সীমারেখা–এজন্য গোটা মানবজাতিই দায়ী এবং এজন্য সকল মানুষকেই খোদাতা'লার নিকটে জবাবদিহি হতে হবে। যখন কোথাও কোন দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি হয়, তখন সেটাকে গোটা মানবতার সমস্যারূপেই গণ্য করতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রকে সেই দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

এটা একটা লজ্জার ব্যাপার যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এত সব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। এমন একটা পদ্ধতি থাকা উচিত যদ্বারা সকল মানুষের সংগৃহীত সম্পদকে অতি দ্রুততার এবং যোগ্যতার সঙ্গে সেই সমস্ত এলাকায় পাঠানো যায়, যে সমস্ত এলাকায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়, বা দুর্ভিক্ষের দরুন মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়, অথবা অন্য কোন কারণে মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে, আশ্রয়হীন উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।

সরকারগুলোর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় দায়িত্ব রয়েছে। তাদের জাতীয় পর্যায়ের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের প্রতিটি সদস্যের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা, অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান করা, পানি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। তাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হচ্ছে (এ বিষয়ে আরও বলা হবে পরে), সম্পদ সংগ্রহ অভিযানে সম্পূর্ণরূপে অংশ গ্রহণ করা, যাতে করে ব্যাপক আকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা মানব-সৃষ্ট বিপর্যয়সমূহের মোকাবেলা করা যায় এবং সেই সমস্ত দেশকে সাহায্য করা যায়, যারা নিজেরা তাদের সংকট নিরসনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে অপারগ।

অতএব, সব কিছুকে ঠিক-ঠাক রাখতে চাইলে, এটা রাষ্ট্রেরই একটা দায়িত্ব হবে যে, সে ভিক্ষুক ও গরীবদেরকে তাদের পাওনা সেই সম্পদ ফিরিয়ে দেবে, যার প্রকৃত মালিকানা তাদেরই। সুতরাং, খাদ্য বস্ত্র, পানি ও আশ্রয়ের মৌলিক চাহিদা চারটিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে অন্য সব কিছুর চাইতে।

অন্যকথায়, একটি সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্রে, না থাকবে কোন ভিক্ষুক, না কোন নিঃস্ব মানুষ, যার জন্যে খাদ্য, বস্ত্র, পানি ও আশ্রয়ের কোন বন্দোবস্ত থাকবে না।

এই সব প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দিতে পারলেই, একটা রাষ্ট্রের পক্ষে তার সর্বনিম্ন দায়িত্বগুলো পালন করা হবে। কিন্তু, সামগ্রিকভাবে, সমাজকে এর চাইতে অনেক বেশী কিছু করতে হবে।

'মানুষ শুধু রুটিতে বাঁচে না' একটি গভীর জ্ঞানের প্রবাদ। এইসঙ্গে যোগ করুন বিশুদ্ধ পানীয় জল, পর্যাপ্ত বস্ত্র, এবং মাথার উপরে একটা ছাদের প্রয়োজনীয়তা। তবু, এই সব কিছু প্রয়োজনীয়তাকে একত্রে পূরণ করলেও তা জীবনকে সম্পূর্ণ করতে পারে না। মানুষ সব সময়েই জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সব কিছু ছাড়াও আরও কিছু পেতে চায়। সুতরাং, সমাজকে এমন আরও বেশী কিছু করতে হবে যাতে করে এক ঘেঁয়েমী কেটে যায়; গরীবদের জীবনে এমন কিছু জৌলুসের ব্যবস্থাও করতে হবে যেন তারাও ধনীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খানিকটা হলেও ভোগ করতে পারে।

আবার, এটাও যথেষ্ট নয় যে, সমাজের ভাগ্যবান ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের একটা অংশই শুধু দিয়ে দিবে কম ভাগ্যবানদেরকে। বরং এটাও প্রয়োজনীয় যে, তারা সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের দারিদ্রজনিত দুঃখ-কষ্টেরও ভাগীদার হবে। তাছাড়া, এমন কিছু ব্যবস্থাও থাকা দরকার যাতে ধনী ও গরীব একসঙ্গে মেলামেশা করতে পারে, সমাজের উঁচু স্তরের লোকেরা স্বপ্রণোদিতভাবে সমাজের নীচু স্তরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করবে এবং ব্যক্তিগতভাবে জানবার চেষ্টা করবে যে, দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করার অর্থ আসলে কী। এ ব্যাপারে ইসলামে অনেক ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে, ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পক্ষে এটা সম্ভবই নয় যে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, কিংবা তাদের নিজ নিজ পরিবেশ বা মহলের মধ্যে আলাদা হয়ে থাকবে। আমরা, এর আগেও, এই সব ব্যবস্থাদির উপরে কিছুটা আলোকপাত করেছি।

অর্থনৈতিক ঐক্যের মাধ্যম হিসেবে এবাদৎ বা উপাসনা

১. এক খোদা ছাড়া অন্য আর কোনও খোদা বা ঈশ্বর নেই। এই সত্যের স্বীকৃতির দ্বারা শুরু করলে আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর সৃষ্টির একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এবং এর দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা হয়।

২. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায, যা জামাতবদ্ধভাবে আদায় করাই বাঞ্ছনীয়, তা এক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ, সর্বাপেক্ষা কার্যকর একটি পন্থা। ধনী এবং গরীব, ছোট এবং বড় সব স্তরের লোকদেরকে, বিনাব্যতিক্রমে, একসাথে, সম্ভব হলে, মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে হয়। সবাই না হলেও, মুসলিম সমাজের একটা বৃহৎ অংশ এই নির্দেশ পালনে বাধ্য। যারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করেন তাদের শতকরা

সংখ্যা কোন কোন দেশে কম হতে পারে এবং কোন কোন দেশে বেশী। কিন্তু এটা একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা যা কম বেশী অধিকাংশ মুসলমানই অর্জন করে। নামাযের পদ্ধতিটাই স্বয়ং মানুষের কাছে সাম্যের এক মহান বাণী, যে ব্যক্তি প্রথমে মসজিদে যান, তিনি তাঁর পসন্দমত জায়গায় বসেন, তাঁকে অপর কেউই, তা তিনি সমাজের যত উঁচুস্তরের লোকই হন না কেন, সরিয়ে দেবার চিন্তাও করতে পারেন না। নামাযের সময় সবাই, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, কোন ফাঁক না রেখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। অত্যন্ত পরিপাটিরূপে সজ্জিত কোন ব্যক্তির পাশেই হয়তো দেখা যাবে যে, একজন ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিহিত লোক দাঁড়িয়ে আছে। রোগাটে ও দুর্বল এবং স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী সবাই প্রত্যহ একত্রে মিলিত হয় একই প্লাটফর্মে, যেখানে প্রতিনিয়ত বার বার ঘোষিত হয় এই বাণী ঃ 'আল্লাহু আক্‌বর'- আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ।

কোন একটি এলাকায় বসবাসকারী দুঃখ-দৈন্যে পীড়িত লোকদের সঙ্গে যদি সেই একই এলাকার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গে দৈনিক দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সেই আরাম-আয়েশে জীবনযাপনকারী ব্যক্তির হৃদয়ে তার একটা শক্তিশালী প্রভাব না পড়েই পারে না। এর মধ্যে যে বাণী নিহিত তা অত্যন্ত জোরালো এবং পরিষ্কার, এবং তা হচ্ছেঃ তোমাকে অবশ্যই তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করবার জন্য কিছু একটা করতেই হবে, এবং তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে। অন্যথায়, তুমি খোদার দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যাবে এবং তোমার নিজের কাছেও তুমি নিজে ছোট হয়ে যাবে।

যোগাযোগ ও মেলামেশার এই এলাকাটা প্রতি শুক্রবারে সম্প্রসারিত হয়। তখন আশেপাশের সব এলাকার মুসলমানেরা সম্মিলিত হয় একটা কেন্দ্রীয় মসজিদে। ফলে, প্রতিবেশী ধনী মহল্লার লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় গরীব মহল্লার লোকদের। যোগাযোগের এই এলাকা আরও বেশী সম্প্রসারিত হয় বছরে দু'বার দুই ঈদের উৎসবে। তখন উৎসবের পূর্বে 'ফিৎরানা' দেওয়া হয়; এই ফিৎরানা হচ্ছে এমন একটি ফান্ড, যা স্বেচ্ছা প্রদত্ত দানের দ্বারা গঠিত, এবং তা বিতরণ করা হয় গরীবদের মধ্যে।

৩. রমযান মাস (মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত উপবাস-পালনের মাস) ধনী ও গরীব উভয়কেই একই সমতলে নিয়ে খাড়া করে দেয়। এই মাসে ধনীদেরকেও সমভাবেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বরদাস্ত করতে হয়। এতে করে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, গরীবরা কীভাবে জীবনভর ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে।

৪. 'যাকাত' -এর মাধ্যমে বিত্তশালীদের পুঁজি থেকে গরীবদের কাছে তাদের পাওনা হক্ বা অধিকার স্থানান্তরিত হয়।

৫. পরিশেষে রয়েছে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ, যাকে বলা হয় মানব-ঐক্যের বৃহত্তম সম্মেলন বা প্রদর্শনী। তখন হজ্জ পালনকারী মহিলাদেরকে সাদাসিধে সেলাইকরা কাপড় পরবার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং পুরষদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় সেলাই-ছাড়া দু'প্রস্থ কাপড় পরতে, এবং এটাই হজ্জের ইউনিফর্ম, ধনী-দরিদ্র সবার জন্যই।

কিন্তু, এটাই সবটা নয়। উল্লিখিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও মুসলিম সমাজে আরও নানবিধ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে প্রচলিত রয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমাগতভাবে কমতে থাকে এবং একটা সুস্থ পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয় আলো-বাতাস চলাচলের রাস্তা তৈরী হয়। যে পরিবেশে ধনীরা একটা যুক্তিসম্মত সীমার মধ্যে ধনী থাকবে বটে, কিন্তু তাদেরকে গরীবদের দেখা শোনা করতে হবে, প্রয়োজনে সাহায্য-সহায়তা করতে হবে।

অনুরূপ একটা নীতির কথাই ব্যক্ত করেছেন হযরত ঈসা (আঃ)। যখন, তিনি বলেছেনঃ 'নম্র ও নিরীহগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।' এটা সত্যিই আফসোসের কথা যে, এই নৈতিক নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, পুঁজিবাদ সমাজের দরিদ্র ও নিরীহ ব্যক্তিদের যত্ন-আত্তি করতে, দেখা-শোনা করতে একবারেই ব্যর্থ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব

সমাজ যখন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা কোন বড় ধরনের বিপর্যয়ে নিপতিত হয়, তখন বিকল্প কোন উপায় অবলম্বন করার কথা বলতে গিয়ে (দ্রঃ ইতোপূর্বে আলোচিত মৌলিক চাহিদা) পবিত্র কোরআন যে সমস্ত সঠিক পন্থার বর্ণনা দিয়েছে, তা হচ্ছেঃ

فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ أَوْ إِطْعَٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

"গোলাম আযাদ করা; অথবা দুর্ভিক্ষ কবলিত দিনে অন্ন দান করা; (যথা) নিকট আত্মীয় এতীমকে; অথবা ভূলুণ্ঠিত মিসকীনকে।" (আল্ বালাদ- ৯০ঃ১৪-১৭)

অন্যকথায়, সঠিক পন্থাগুলো হচ্ছেঃ

১. মানবজাতির সেই যথার্থ এবং সত্যিকারের খেদমত যা খোদাতা'লার কাছে গ্রহণযোগ্য। এ সবের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে, যারা দাসত্বে বা অন্য কোন প্রকার বন্ধনে

আবদ্ধ তাদেরকে সাহায্য করা, তা সে যে কোন ভাবেই হোক না কেন। যে কোন সেবা, যা এই ধারণার বিরোধী, তা খোদার দৃষ্টিতে মূল্যহীন। এই আলোকে দেখলে দেখা যাবে যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বিভিন্ন পূর্বশর্ত এবং বিধি-বন্ধনে আবদ্ধ করে আর্থিক সাহায্য দানের যে আধুনিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

২. পরবর্তী পন্থা হচ্ছে, এতীমকে খাদ্য ও পানীয় দান করা, সেই এতীমের যদি অভিবাবক থাকে, তবুও।

৩. শেষ পন্থা হচ্ছে, সহায় সম্বলহীন সম্পূর্ণ নিঃস্ব ব্যক্তি, যাকে মনে হয় যেন সে ধূলায় মিশে গেছে, তাকে খাদ্য ও পানীয় দান করা।

কথা যদিও একবচনেই বলা হয়েছে তবু ১৫নং আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, এখানে ব্যাপক আকারের সংকটের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'ইয়াওম' (আক্ষ-দিন) শব্দের গূঢ়ার্থ, এবং এখানে এর ব্যবহারের রীতি বা স্টাইল থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এই আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থে এই চিত্রই পরিষ্কার ফুটে উঠেছে যে, বড়, বিত্তশালী, ক্ষমতাশালী জাতিগুলো গবীর জাতিগুলোর প্রতি, বিশেষ করে, এই জাতিগুলো যখন সময়ে সময়ে চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে সাহায্যের অপেক্ষায় দিন গুণে, তখন কী রকম ব্যবহার করে থাকে, এদেরকে সাহায্য তো দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা দেওয়া হয় নানান বাঁধনের মধ্যে । ফলে, অন্যকে সাহায্য করার আসল উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে যায়, মূল প্রেরণাও নষ্ট হয়ে যায়। বাহ্যতঃ, তারা একটা দুঃখ থেকে রেহাই পায় বটে, কিন্তু এর দ্বারা তারা পর মুহূর্তেই আর একটা দুঃখের জালে আটকা পড়ে যায়।

বন্ধন বা শর্তযুক্ত সাহায্যের সমস্ত সমকালীন পদ্ধতিকে এখানে স্বল্প কথায় সুস্পষ্ট করেই বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিনদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা যেন কোন গরীব মানুষের বা কোন গরীব জাতির দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের বিনিময়ে সেই সব মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে কোন স্বার্থ হাসিল না করে, এবং তাদেরকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না করে।

এখানে 'এতীম' শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি পরনির্ভর ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য, জাতির ক্ষেত্রেও। এই সব জাতির অবস্থা ঐ সব এতীমের মতই যাদেরকে তাদের বিত্তশালী আত্মীয়-স্বজনরা পরিত্যাগ করেছে। অথচ এদেরকে সাহায্যহীন অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত নয়। এদেরকে সাহায্য করা উচিত। এবং তা করা উচিত সেই বিত্তশালীদেরই যারা প্রাথমিকভাবে তাদের জন্য দায়ী।

এক্ষেত্রে, একটি যথোপযুক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে তৈল-সমৃদ্ধ দেশগুলো। উপসাগরীয় দেশগুলোর যদি, মাত্র কয়েকটি দেশ মানবতার সীমাহীন দুঃখ-দুর্ভোগ দূর করার জন্য হাত বাড়াতো তাহলে, তারা কোন সামান্য কষ্ট বরণ না করেও আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ ও খরাজনিত সব সমস্যার সমাধান করতে পারতো। অনেক টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে তারা। বিপুল সম্পদ রয়েছে তাদের পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। এই সব ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং সম্পদ থেকে যে সুদ তারা পায়, যে আয় তারা করে, শুধু তা দিয়েই গোটা আফ্রিকার দুঃখ-দুর্দশা মোচন করা সম্ভব । আর যাই হোক, ইসলাম তো নিষেধ করে তাদের ঐ সব সুদের টাকা তাদের নিজেদের জন্য খরচ করতে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন দেশটি ক্ষুধা, দারিদ্য ও দুঃখ-দুর্দশার এক বিশাল সাগরে পরিণত হয়েছে। বাদবাকী দুনিয়াটা সে দেশের জনগণকে তাদের ভাগ্যের উপরেই ছেড়ে দিয়ে রেখেছে। ফোঁটা-ফাঁটি যে সাহায্য তাদেরকে দেওয়া হয় তা তাদের দুঃখ-দৈন্যের তুলনায় কিছুই নয়।

এই সব জাতিকে 'এতীম' শব্দটির ব্যাপক অর্থ অনুযায়ী এতীমরূপে বিবেচনা করতে হবে। এই সমস্ত জাতিকে যখন তাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজনরা পরিত্যাগ করে, তখন তা খোদাতা'লার দৃষ্টিতে কঠিন অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।

গরীব জাতিগুলির দুঃখ-দুর্দশার জন্য মানুষ খোদাতা'লা এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক প্রকার হাস্যকর, এমনকি বক্র মনোভাব পোষণ করে থাকে। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের প্রতি মানুষের চরম হৃদয়হীনতা ও অবজ্ঞার জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। আমরা যদি সব মানুষের হৃদয়গুলিকে সহৃদয়তা ও সহমর্মিতার বিশেষ বিশেষ গুণে ভরপূর করে দিতে পারি এবং অপরের জন্য দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে পারি, তাহলে এই পৃথিবীটা এখনও বেহেশ্‌তে রূপান্তরিত হতে পারে।

ইসলামী জাহানে বাইরের দুনিয়াতে একই স্বার্থপর মনোভাব বিরাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ ইথিওপিয়ার কথা বলা যায়। দেশটির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সুতরাং, এই অজুহাতে দেশটিকে সাহায্যদান বন্ধ করা ঠিক হবে না যে, এটাতো সোভিয়েত ইউনিয়নেরই (রাশিয়ারই) দায়িত্ব। সুদানের লক্ষ লক্ষ মুসলমান যদি দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মারা যায়, তাহলে তাদের দুঃখ-যাতনা এই অজুহাতে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না যে, তাদেরকে তো খাওয়ানোর দায়-দায়িত্ব সৌদী আরবের এবং অন্যান্য তৈল-সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর, কেননা, তারাই না আসলে তাদের আত্মীয়,

স্বজন। এটাই হচ্ছে আরবী 'ইয়াতীমান যা মাকরাবাতে'-এর সত্যিকার তাৎপর্য, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে -'নিকট আত্মীয়, এতীম'।

আবার, এটাও এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তি অথবা জাতি যেই হোক না কেন, কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে বা জাতিগতভাবে অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়, তাহলে তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। এর প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, যে দেশগুলো সময়মত, পর্যাপ্ত সাহায্যের অভাবে দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে।

তৃতীয় পন্থা হচ্ছে, 'আও মিসকীনান যা মাতরাবাতে' যা প্রযোজ্য সেই সমস্ত অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেগুলি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং যেখানে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই সম্পূর্ণরূপেই ভেঙে পড়েছে। পবিত্র কোরআনের মতে, সেই সব দেশের জন-সাধারণকে শুধু খাদ্যদান করাটাই যথেষ্ট নয়; এসব ক্ষেত্রে এমন সব ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে যাতে তাদের অর্থনীতিকে পুনস্থাপিত করা যায়, পুনর্বাসিত করা যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে, হাল যামানার বাণিজ্য-সম্পর্ক ঠিক এর উল্টোটা। সম্পদের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে ধনাঢ্য এবং উন্নততর দেশগুলোর দিকেই। পক্ষান্তরে, দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনীতি ঋণের অতলে ডুবছে তো ডুবছেই।

আমি কোন অর্থনীতিবিদ নই, তবে এতটুকু অন্ততঃ বুঝি যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে এটা অসম্ভব যে, তারা উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য-সম্পর্ক বজায় রেখেও চলবে, আবার সেই সঙ্গে তাদের দেশ থেকে ধনী দেশগুলোতে সম্পদের প্রবাহও বন্ধ করবে, এবং তার দ্বারা রপ্তানী আয় ও আমদানী বিল সমান সমান রাখবে।

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত সমস্ত দেশেই লক্ষ্য করা যায় যে, তারা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সব সময় উদগ্রীব থাকে। তাদের এই উর্ধ্বমুখী জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য গরীব দেশগুলোকে উৎসাহিত করা হয় টাকা ধার করার জন্য। উন্নতির সহজ-লভ্য প্রযুক্তি জীবনকে করে তুলছে সহজতর এবং আরামপ্রদ। যদিও, সেই সমস্ত আধুনিক উপকরণের আসক্তি, অবশেষে, মানব চরিত্রের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এবং তার কষ্টসহিষ্ণুতাকে তিরোহিত করে। কিন্তু উন্নত দেশগুলোর লোকেরা যদি চায় যে, তাদের দেহের রক্ত বাড়তেই থাকুক, তাদের গালগুলো রক্তে আরও লাল হয়ে উঠুক, তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য আরও সুঠাম হয়ে উঠুক, তাহলে কী করে আশা করা যায় যে, তারা গরীব দেশগুলোকে মারাত্মক ও ক্রনিক বা চরম রক্তশূন্যতা থেকে সেরে উঠবার

সুযোগ দিবে? কেননা, আরও, আরও রক্তের জন্য তাদের নিজেদের যে পিপাসা তার তো কোন নিবৃত্তি নেই, তাদের জীবনাযাত্রার মানের উন্নতিতেও তো কোনও ক্ষান্তি নেই! কাজেই, টাকা দিয়ে যা কিছু কেনা যায়, তাতো সবকিছু এবং সব সময়েই স্থানান্তরিত হতে হবে তাদেরই অর্থনীতিতে!

কোন প্রকার বাছ-বিচার ছাড়াই জীবন-মান উন্নয়নের এই যে উন্মত্ত প্রতিযোগিতা, তা শুধু যে গরীব দেশগুলোর উত্তরণের সুযোগ-সুবিধাই লুণ্ঠন করছে তাই নয়; তা বরং উন্নত দেশগুলোরও মনের শান্তি এবং হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হরণ করছে। সমগ্র সমাজটাই কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট চাহিদা পূরণের আশার পিছনে মিছেই ছুটে চলেছে। সবাই একটা না একটা কিছুর জন্য সর্বক্ষণ উদ্‌গ্রীব অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, যেন সবাই সবার উপরওয়ালাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাচ্ছে। এটাও এমন একটা অবস্থা যা সমাজকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম।

এই প্রতিযোগিতার প্রবণতাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করে। ইসলাম আপনাদের সামনে এমন এক সমাজের চিত্র তুলে ধরে, যার অধিবাসীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবনযাপন করে, এবং দুর্দিনের জন্যেও কিছু সঞ্চিত রাখে; এবং তা শুধু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়েই নয় , জাতীয় পর্যায়েও ।

এই প্রতিযোগিতার পরিস্থিতিটা দরিদ্র দেশগুলোর জন্য বিপজ্জনকও বটে। কেননা, যখন উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল অর্থনীতির সঙ্গে নতুন নতুন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, এবং তাদের নিজেদের অর্থনীতিতে স্থবিরতা দেখা দেয়, তখন তারা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকতর কঠোর হয়ে ওঠে। এটা অনিবার্যরূপেই ঘটে। কারণ, ধনীদেশগুলোর সরকারগুলোকে, যে করেই হোক, তাদের জনগণের জীবন-মান এমন একটা যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতেই হবে, যে পর্যায়ে জীবনযাপন করতে তারা অভ্যস্ত ।

অবশেষে, এই সমস্ত পরিস্থিতিরই অবনতি ঘটতে থাকে, এবং তা এমন সব অবস্থার ও উপকরণের উদ্ভব ঘটায়, যার পরিণাম যুদ্ধ। এবং এগুলোইতো সেই সব যুদ্ধ যা প্রতিহত করতে চায় ইসলাম।

রাজনৈতিক শান্তি

১. কোন রাজনৈতিক পদ্ধতিই সরাসরি বাতিলযোগ্য নয়

২. রাজতন্ত্র

৩. গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ

৪. গণতন্ত্রের ইস্‌লামিক সংজ্ঞা

৫. ইসলামী গণতন্ত্রের দু'টি স্তম্ভ

৬. পারস্পরিক আলোচনার অগ্রাধিকার

৭. ইসলামিক সরকারের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তিঃ ঐশী কর্তৃত্ব

৮. মোল্লাতন্ত্র

৯. রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রতি বিভক্ত আনুগত্য

১০. আইন প্রণয়নের অধিকার কি ধর্মের একচেটিয়া?

১১. ইসলামিক রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি

১২. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঃ
নিরংকুশ সুবিচারের নীতি সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য

১৩. জাতিসংঘের ভূমিকা।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে সেগুলির প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যার উপদেশ দিচ্ছেন নিশ্চয় তা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (আন্ নিসা - ৪ঃ৫৯)

রাজনৈতিক শান্তি

রাজনৈতিক শান্তির বিষয়টিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই খুব সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ইস্যু হচ্ছে, জনগণের জন্য কোন্ রাজনৈতিক পদ্ধতিটি ভাল হবে বা মন্দ, তা নির্ণয় করা। আবার, আমাদেরকে এটাও খুঁজে-বের করতে হবে যে, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা এবং অসন্তোষের জন্য কে দায়ী-কে রাজনৈতিক পদ্ধতি ও তার অন্তর্নিহিত ত্রুটিবিচ্যুতি, না কি অন্য কিছু? দোষটা কি পদ্ধতির, না কি যারা চালায় তাদের? অনৈতিকভাবে, স্বার্থপর, লোভী অথবা দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব, যা গণতান্ত্রিক উপায়েই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তা কি সমাজের জন্য সত্যিসত্যিই ভাল ও কল্যাণকর? না কি তার পরিবর্তে, অন্য কোন পদ্ধতির সরকার, যেমন, সদাশয় একনায়কত্ব?

আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং তার নিশ্চয়তাদানের ব্যাপারে, সমকালীন রাজনীতিবিদদেরকে দেওয়ার মত কিছু উপদেশ আছে ইসলামের।

মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিরংকুশ নৈতিকতা অনুসরণ করে চলার জন্য ইসলাম অসাধারণ জোর দেয়, রাজনীতিও এর কোন ব্যতিক্রম নয়।

কোন রাজনৈতিক পদ্ধতিই সরাসরি বাতিলযোগ্য নয়

আমরা এখানে এই মন্তব্য দিয়ে শুরু করতে পারি যে, ইসলামে বিশেষ কোন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতিকে, অন্য সব পদ্ধতি বাদ দিয়ে, বৈধ বলে উল্লেখ করা হয় নি।

সন্দেহ নেই যে, পবিত্র কোরআন এমন একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথাই বলেছে যেখানে শাসকগণ জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত হবে, কিন্তু এটাই একমাত্র পদ্ধতি নয় যা ইসলাম অনুমোদন করে। কোন সার্বজনীন ধর্মের তরফে এটা কোন মৌলিক বিশেষ-অধিকার হতে পারে না যে, তা মাত্র একটি রাজনৈতিক পদ্ধতিকেই বাছাই করে নিয়ে সেটাকেই শুধু স্বীকৃতি দিবে। এবং এই সত্যকে উপেক্ষা করবে যে, পৃথিবীর সকল এলাকা এবং সমাজের জন্য একটি মাত্র রাজনৈতিক পদ্ধতি কখনই কার্যতঃ প্রযোজ্য হতে পারে না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতেও গণতন্ত্রের বিকাশ এখনও অতটা ঘটেনি, যতটা বিকাশ ঘটলে গণতন্ত্র তার কাংখিত রাজনৈতিক আদর্শের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। পুঁজিবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অত্যন্ত শক্তিধর রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলার ফলে কোথাও সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়াই

সম্ভব হচ্ছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে দুর্নীতির ক্রমবর্ধমান সমস্যাদি, যুক্ত হচ্ছে "মফিয়া" চক্রের অস্তিত্বের প্রসার ও অন্যান্য প্রেশার গ্রুপ। যে কেউ সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে যে, গণতন্ত্র, এমনকি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশী গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও নিরাপদ নয়। এমতাবস্থায়, তৃতীয় বিশ্বের জন্য গণতন্ত্র কী করে উপযোগী হতে পারে?

সুতরাং, যদি বলা হয় যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র আফ্রিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো অথবা পৃথিবীর তথাকথিত ইসলামী দেশগুলোর জন্যেও প্রযোজ্য হতে পারে তবে, তা হবে, একটা ফাঁকা ও অবাস্তব দাবীরই সমতুল্য।

আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে, ইসলাম বিশ্বের কোন রাজনৈতিক পদ্ধতিকেই প্রত্যাখ্যান করে না। ইসলাম এটা জনগণের পসন্দ না-পসন্দের উপরেই ছেড়ে দেয়, এবং কোন দেশের ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপরেও ছেড়ে দেয়। ইসলাম যার উপরে জোর দেয়, তা সরকার পদ্ধতি নয়, তা বরং, সরকার কীভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে, তার উপরেই। জনগণকে আমানত জেনে দায়িত্ব পালনে যদি ইসলামী আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কোন শাসন-পদ্ধতি পরিচালিত হয় তবে ইসলাম যে কোন পদ্ধতিকে–তা সে সামন্তবাদ, রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র যা-ই হোক না কেন– তাকে আপন পরিসরে ঠাঁই করে দিতে সক্ষম।

রাজতন্ত্র

পবিত্র কোরআনে রাজতন্ত্রের উল্লেখ এসেছে বহু বার এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার কোন নিন্দাও করা হয় নি। নিম্নোক্ত আয়াতে একজন ইসরাঈলী নবী ইসরাঈলীদেরকে তালূত সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ঃ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ
قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ
مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ
يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

"এবং তাদের নবী তাদেরকে বললো 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালূতকে বাদশাহ্ নিযুক্ত করেছেন।' তারা বললো, 'সে কিভাবে আমাদের উপরে হুকুমত লাভ করতে পারে, অথচ তার চাইতে আমরাই হুকুমতের বেশী হকদার এবং তাকে তো এমন কিছু আর্থিক প্রাচুর্যও দেওয়া হয় নি?' সে বললো, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন, এবং তিনি তাকে জ্ঞানে এবং দৈহিক শক্তিতে অধিক সমৃদ্ধ করেছেন।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাকে চান তাঁর শাসনক্ষমতা দান করেন, এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্য দাতা, সর্বাজ্ঞানী।" (আল্ বাকারা ২ঃ ২৪৮)

রাজতন্ত্রকে আরও ব্যাপক অর্থে- অর্থাৎ জনগণ নিজেরাই রাজা, এই অর্থেও উল্লেখ করা হয়েছে কোরআন করীমেঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟
نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا
وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝

"এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করেছিলেন, এবং তোমাদেরকে বাদশাহ্ করেছিলেন, এবং তোমাদেরকে এমন কিছু দান করেছিলেন যা তিনি (তদানীন্তন) জগতের অন্য কোন জাতিকে দান করেন নি।" (আল্ মায়েদা-৫ঃ২১)

তবে রাজ্যজয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রসারিত সার্বভৌমত্বের, সাধারণতঃ সুখ্যাতি করা হয় নি। এটা আমরা দেখতে পাই শেবার রানী কর্তৃক তাঁর পরিষদকে প্রদত্ত উপদেশের মধ্যে, যার উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে।

শেবার রানীর সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হয়েছে এভাবেঃ

قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۝

"সে বললো, বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তারা সেটাকে ধ্বংস করে দেয় এবং সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করে। এবং তারা এটাই করে থাকে।" (আন্ নমল-২৭ঃ৩৫)

রাজারা ভালও হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে, যেমন ভাল বা মন্দ হতে পারে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রীরাও এবং প্রেসিডেন্টরাও। কিন্তু পবিত্র কোরআন এমন এক শ্রেণীর রাজার কথা বলে যাদেরকে আল্লাহ্ই নিযুক্ত করে থাকেন। এরা হচ্ছেন বাদশাহ্ সোলায়মান (আঃ)-এর ন্যায়। হযরত সোলায়মান (আঃ)কে ইহুদী ও খৃস্টানরা শুধু একজন রাজা হিসেবেই মানে কিন্তু, তিনি কোরআন শরীফের মতে আল্লাহ্র একজন নবীও ছিলেন।

এথেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কখনও কখনও নবুওয়্যত এবং বাদশাহী একই সঙ্গে এক ব্যক্তির উপরে অর্পিত হয়েছে এবং তাঁদের বাদশাহী আল্লাহ্ কর্তৃক সরাসরি মনোনীত।

পবিত্র কোরআনে নবীর কর্তৃত্বের মাধ্যমে প্রদত্ত আর এক প্রকারের সার্ভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى
ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর তাঁর এই রসূলের এবং তাদেরও যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর, যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তাহলে, তোমরা তা আল্লাহ্ এবং তাঁর এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের উপরে ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়ে অতীব উত্তম।" (আন্ নিসা-৪ঃ৬০)

এই আয়াতের উল্লেখ আমরা শুধু বিভিন্ন প্রকার সার্বভৌমত্বের সংখ্যা গণনার জন্যই করছি না, বরং এই ব্যাপারেও জোর দেওয়ার জন্য করছি যে, পবিত্র কোরআনের মতে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সব সময়ে সঠিক ব্যক্তিরাই যে অবশ্যম্ভাবীরূপে নির্বাচিত হন, এটা ঠিক নয়। এটা খুবই সম্ভব যে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণও কোন এক ব্যক্তির মহান নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলীকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হতে পারে এবং তাদের উপরে তাকে চাপিয়ে দিতে চাইলেও তারা তার নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে। সমস্ত রাজনৈতিক মানদণ্ডে তার নিযুক্তিকে একনায়কত্ব বলে নিন্দাও করা হবে। অথচ তার নিযুক্তি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তা যে জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে হতো না,

তা তো সুনিশ্চিত। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা হচ্ছে, জনসাধারণ তাদের পসন্দ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভাসা-ভাসাভাবে, প্রভাবান্বিত হয়ে, এবং সর্বশেষ আন্দাজের ভিত্তিতে। এবং তারা তাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য সত্যিকারের উপযুক্ত নেতৃত্বের গুণাবলী যাচাই করে নিতে পারে না।

এথেকে বুঝা যায় যে, খোদাতা'লার অনুগ্রহভাজন জাতির ইতিহাসে এমন বহু সময় আসে যখন তাদের রাজনৈতিক উত্তরণের জন্য ঐশী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে। অনুরূপ সময়ে খোদাতা'লা কোন রাজা বা সার্বভৌম নেতা মনোনয়নের দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। এথেকে, অবশ্য, এমনটা ধারণা করার কিছু নেই যে, সকল রাজা বা নেতাই খোদাকর্তৃক ঐশীভাবে মনোনীত অথবা সেভাবেই অনুমোদিত। কোরআন করীম এই জাতীয় ধারণা সমর্থন করে না। এই ভুল ধারণাটা সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল মধ্যযুগীয় খৃষ্টান পদ্ধতির মধ্যে। যেমন রাজা রিচার্ডের সেই বিলাপঃ

'উত্তাল বিক্ষুব্ধ সব সমুদ্রের সমগ্র জলরাশিও কোন ঐশী মনোনীত রাজার সুগন্ধী মলম ধূয়ে ফেলতে পারে না।' (শেকস্‌পীয়ার)।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ

গণতন্ত্রের ধারণা বা কন্‌সেপ্টের ভিত্তি, এর গ্রীক উৎস সত্ত্বেও, আব্রাহাম লিংকনের সেই গেটিস্‌বার্গ বক্তৃতা। যে বক্তৃতায় তিনি সংক্ষেপে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এই বলেঃ'Government of the people, by the people, for the people'- অর্থাৎ, জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য। এটা অবশ্যই একটা সুন্দর ও বহুল প্রচলিত পদসমষ্টি। কিন্তু, এর সম্পূর্ণ প্রয়োগ পৃথিবীর প্রায় কোথাও হচ্ছে না।

এই সংজ্ঞার তৃতীয় অংশটি 'জনগণের জন্য' কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং বিপৎপূর্ণ। কোন জিনিষটাকে 'জনগণের জন্য' বলে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করা যাবে? সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন-পদ্ধতিতে এটা প্রায়ই ঘটে যে, 'জনগণের জন্য' বলতে আসলে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্যই বলা হয়, বাদবাকী সংখ্যলঘিষ্ঠের জন্য নয়।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, কেবল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই একতরফাভাবেই এমন অতীব গুরুত্ব বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে, যার প্রকৃত ঘটনা ও তথ্যাদিকে আরও ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখতে পাবেন যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে সেটা একটা সংখ্যালঘু-সিদ্ধান্তই ছিল যা কিনা গণতান্ত্রিকভাবে পাশ করা হয়েছে এবং সংখ্যাগুরুর উপরে চাপানো হয়েছে। নানাবিধ সম্ভাবনার মধ্যে আরও একটা সম্ভাবনা হচ্ছে, শাসক দল বা রুলিং পার্টিকে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

করা হলেও তা করা হয় প্রায় সব নির্বাচনী এলাকাতেই প্রথম দফায় অর্জিত সামান্য সংখ্য গরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই।তাছাড়া, নির্বাচনের দিনে যদি ভোটারের উপস্থিতি কম থেকে থাকে, তাহলে তো একথা নির্দ্বিধায় বলা যাবে না যে, রুলিং পার্টির প্রতি সত্যিসত্যিই সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন রয়েছে। এমনকি রুলিং পার্টি যদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয় লাভ করেও, তবু, তাদের শাসনামলের মধ্যেই এমন বহু কিছু ঘটে যেতে পারে, যার দরুন জনমতও পাল্টে যেতে পারে। তখন আর চলতি সরকার সম্বন্ধে একথা বলা যাবে না যে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি। আর যাই হোক, প্রতিটি সরকার পরিবর্তনের পিছনে আসলে কাজ করে ভোটারদের হৃদয়ের ক্রমাগত পরিবর্তন।

এমনকি, সরকার যদি ভোটারদের কাছে জনপ্রিয় থাকে তবু, এমনটা ঘটা কোন অসম্ভব কিছু নয় যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রুলিং পার্টির অনেক সদস্যের আন্তরিক সমর্থন থাকে না। তবু তারা পার্টি- আনুগত্যের কারণে সমর্থন দিয়ে যায়। এমতাবস্থায়, বিরোধীদল বা দলগুলোর চাইতে শাসক-দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিপন্ন হলেও, ঐ তথাকথিক সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত হবে বস্তুতঃপক্ষে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, যা কিনা চাপিয়ে দেওয়া হবে জনসাধারণের উপরে।

এটাও লক্ষ্যণীয় যে, 'জনগণের জন্য' যা কল্যাণকর বা ভাল বলে ধারণা করা হয়, সময়ের ব্যবধানে তারও পরিবর্তন ঘটে থাকে। সিদ্ধান্ত যদি নিরংকুশ বা সার্বজনীন নীতির ভিত্তিতে গৃহীত না হয়, বরং তা যদি গৃহীত হয় কোন ব্যক্তির বা পার্টির বিবেচনায় 'জনগণের জন্য' কল্যাণকর হওয়ার ভিত্তিতে, তাহলে সময়ে সময়ে তাদের নীতিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। আজ যা ভাল মনে হচ্ছে আগামীকাল তা খারাপ মনে হতে পারে, পরশু আবার তা-ই ভাল হতে পারে।

যে লোকটি রাস্তার লোক তার জন্য তো এই পরিস্থিতিটা হবে প্রতারণাপূর্ণ। অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল ধরে ব্যাপক আকারে কম্যুনিজমের যে পরীক্ষা- নিরীক্ষা চলছিল তারও ভিত্তি তো ছিল, আর যাই হোক, ঐ একই শ্লোগানঃ 'জনগণের জন্য'। সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই তো আর একনায়কতান্ত্রিক ছিল না।

এটাও লক্ষ্যণীয় যে, 'জনগণের দ্বারা সরকার' -এর ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে পৃথকীকরণ রেখা টানা হয়, তা অত্যন্ত ক্ষীণ, এমনকি অনেক সময় তার কোন অস্তিত্বই থাকে না । কেউ কি দুনিয়ার সব নির্বাচিত সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলোর নিন্দা এই বলে করতে পারবে যে, সেগুলো 'জনগণের দ্বারা' ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় নি? অবশ্য, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রের পক্ষে

ভোটারদের কাছে প্রার্থীদের কথা এমন নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া সম্ভব যে, ভোটারদের জন্যে আর বিকল্প কোন প্রার্থীকে নির্বাচিত করবার কোন সুযোগই থাকে না। এই ধরনের পদক্ষেপ এবং অন্যান্য আরও অনেক কঠোর কর্তৃত্বপূর্ণ কৌশল পাশ্চাত্য জগতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার পরিচালিত দেশগুলোতেও কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সর্বত্রই অবলম্বন করা সম্ভব।

বস্তুতঃ, গণতন্ত্রকে পৃথিবীর প্রায় কোথাও পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়নি, এবং নির্বাচন 'জনগণের দ্বারা' প্রায় হয় না বললেই চলে। নির্বাচনী কারচুপি, ভোট কেনাবেচা, পুলিশী যুলুম এবং অন্যান্য দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে পৃথিবীতে গণতন্ত্রের মর্ম এবং আদর্শ এত বেশী ভেজাল মিশ্রিত হয়ে পড়েছে যে, এতে গণতন্ত্রের খুব সামান্যই আর বাকী আছে।

গণতন্ত্রের ইসলামিক সংজ্ঞা

কোরআন মজীদের মতে, জনগণ তাদের জন্য উপযোগী যে কোন শাসন পদ্ধতিকে তাদের ইচ্ছা মাফিক গ্রহণ করতে পারে। গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, গোত্রীয় অথবা সামন্তীয় শাসন, সব পদ্ধতিই বৈধ হতে পারে, যদি তা জনগণ তাদের ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করে।

তবু, মনে হয় যে, গণতন্ত্রকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে কোরআন করীমে এবং তার উচ্চ প্রসংশাও করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য, তবে তা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধাঁচে নয়। ইসলাম পবিত্র কোরআনে কোথাও গণতন্ত্রের কোন শূন্যগর্ভ সংজ্ঞা দান করেনি। ইসলাম শুধু অতি গুরুত্ববহ তাৎপর্যপূর্ণ নীতিসমূহের কথাই বলেছে এবং বাদবাকী সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে জনগণের উপরেঃ অনুসরণ কর এবং লাভবান হও, অথবা পথভ্রষ্ট হও এবং ধ্বংস হয়ে যাও।

ইসলামী গণতন্ত্রের দু'টি স্তম্ভ

ইসলামিক ধারণার (কনসেপ্টের) যে গণতন্ত্র, তার স্তম্ভ মাত্র দু'টি, এগুলি হচ্ছেঃ

১. গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনের ভিত্তি হতে হবে আমানতদারী ও সাধুতা। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, যখনই তুমি তোমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে, তখন তা এই চেতনা নিয়ে করবে যে, খোদাতা'লা তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখছেন এবং তিনি তোমার সিদ্ধান্তের জন্য তোমাকেই দায়ী করবেন। ভোট তাদেরকেই দিবে যারা তাদের জাতীয় আমানতের দায়িত্ব পালনে সব চাইতে যোগ্য এবং তারা নিজেরাও আমানতদার। এই

শিক্ষার মধ্যে এ কথাও নিহিত আছে যে, যারা ভোট দেওয়ার অধিকারী তাদেরকে অবশ্যই ভোট দিতে হবে, যদি না পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় অথবা ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা থাকে।

২. সরকারগুলিকে অবশ্যই কাজকর্ম চালাতে হবে নিরংকুশ সুবিচারের নীতির ভিত্তিতে।

ইসলামী গণতন্ত্রের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে, যখনই তুমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তুমি তা করবে নিরংকুশ সুবিচারের নীতির ভিত্তিতে। সে বিষয়টি যা-ই হোক না কেন রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক বা অর্থনৈতিক, – সুবিচারের ব্যাপারে কোনও আপোষ করা চলবে না। সরকার গঠিত হওয়ার পরে পার্টির ভেতরে ভোট দানের ক্ষেত্রেও সব সময় সুবিচার অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। অতএব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কোন দলীয় স্বার্থ বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া যাবে না। এই মূলনীতির আলোকে যদি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহলে, পরিশেষে তা-ই হবে সত্যিকার অর্থেই 'জনগণের' 'জনগণের দ্বারা' এবং 'জনগণের জন্য'।

পারস্পরিক আলোচনার অগ্রাধিকার

পবিত্র কোরআনে গণতন্ত্রের মর্মকথা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে; এবং রাজতন্ত্রকে অধর্মীয় বা অনৈশ্বরিক বলে নাকচ করে না দিয়েও, মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উপদেশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য সব সরকার পদ্ধতির চাইতে সুনিশ্চিতরূপে গণতন্ত্রই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

আদর্শ মুসলিম সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ
وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟
لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝
وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ۝

"এবং তোমাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী মাত্র, এবং আল্লাহ্‌র নিকট যা কিছু আছে তা উৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক স্থায়ী- তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে; এবং যারা বড়পাপ ও অশ্লীল কার্যকে বর্জন করে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়, এবং যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, এবং নামায কায়েম করে; এবং তাদের কাজ কর্ম তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, এবং আমরা তাদেরকে যা রিযক্ দান করেছি তা থেকে খরচ করে। এবং তাদের উপরে যখন কোন যুলুম হয়, তখন তারা অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করে।" (আশ্ শূরা-৪২ঃ৩৭-৪০)

'আম্‌রোহুম শূরা বাইনাহুম' (তাদের কাজ-কর্ম তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়) বাক্যাংশটি মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং এতে পরিষ্কারভাবে এই ইংগিত দেওয়া হয়েছে যে, সরকারের কাজ-কর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে হবে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে; এবং একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, সরকার হচ্ছে জনগণের সরকার -যা কিনা গণতন্ত্রের সংজ্ঞার প্রথম অংশ। ফলে, জনগণের সাধারণ ইচ্ছাই (common will) হয়ে উঠে শাসনের ইচ্ছা (ruling will) পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমেই। গণতন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে 'জনগণের দ্বারা' এই অংশের কথাও পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে এক আয়াতের মধ্যেঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে ন্যস্ত কর তাদের উপরে যারা সেগুলির দায়িত্ব সম্পাদনে সর্বাধিক যোগ্য।' (আন্ নিসা-৪ঃ৫৯)

এর অর্থ এই যে, তুমি যখন তোমার শাসকবর্গ মনোনীত করার জন্য তোমার ইচ্ছা প্রকাশ করবে, তখন তুমি সেই আমানত তার উপরেই অর্পণ করবে যে তার ন্যায্য প্রাপক। শাসকবর্গ নির্বাচনে জনগণের অধিকারের কথা তো নিশ্চয়ই বলা হয়েছে, তবে তা প্রসঙ্গক্রমে। আসল জোর দেওয়া হয়েছে, কী করে সেই অধিকার প্রয়োগ করা হবে তার উপরেই। মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এটা শুধু তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রশ্নই নয় যে, তারা তাদের অধিকারকে যেমন খুশী প্রয়োগ করবে, এটা বরং তারও চেয়ে অনেক বড় প্রশ্ন, এটা জাতীয় আমানতের প্রশ্ন। আমানতের ব্যাপারে তো আপনার এটা ওটা নানানটা পসন্দের সুযোগ নেই। আপনাকে সম্পূর্ণ সততা, বিশ্বস্ততা এবং নিঃস্বার্থপরতার সঙ্গে আপনার আমানতের দায়িত্ব সম্পাদন

করতে হবে। আমানত, অবশ্যই, সেখানেই অর্পিত হতে হবে, যেখানে তা সত্যিকার অধিকার বলেই অর্পিত হওয়া উচিত।

অনেক মুসলিম পণ্ডিত বা আলেম এই আয়াতটির উদ্ধৃতি দিয়ে শুধু এতটুকুই বলতে চান যে, ইসলামও গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও পদ্ধতির কথা বলেছে, ঠিক যেমন তা বলা হয়েছে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শনে। কিন্তু, কথাটা আংশিক সত্য।

পবিত্র কোরআনে পরামর্শের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সমসাময়িক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ন্যায় দলীয় রাজনীতির যেমন কোন স্থান নেই, তেমনি তার মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংসদগুলোতে বা প্রতিনিধি পরিষদে যে স্টাইলে এবং যে স্পিরিটে রাজনৈতিক বিতর্কাদি অনুষ্ঠিত হয়, তারও কোন স্থান নেই। বিষয়টির এই দিকটা নিয়ে যেহেতু আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি সেহেতু, আর বেশী কিছু বলার দরকার নেই এখানে।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞার দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে এটাও লক্ষ্য করা দরকার যে, পারস্পরিক পরামর্শের এই ধারণা অনুযায়ী ভোট দানের অধিকার প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ভোটারদের এখতিয়ারভুক্ত, এবং এক্ষেত্রে এমন কোন বিধি বা শর্ত আরোপ করা চলবে না যাতে সেই অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে, কোন ভোটার তার ভোট একজন ক্রীড়ণকের পক্ষেও দিতে পারে, কিংবা তার ভোট সে নষ্ট করতেও পারে অথবা তার ব্যালট পেপারটি সে ব্যালট-বাক্সের পরিবর্তে ডাস্টবিনেও ফেলতে পারে। এজন্য সে নিন্দাভাজনও হবে না; গনতন্ত্রের নীতি খেলাপ করার জন্য তার প্রতি দোষারোপও করা হবে না।

আল্ কোরআনের সংজ্ঞা অনুসারে, একজন ভোটার তার ভোটের নিরংকুশ মালিক নয়, বরং আমানতদার। একজন আমানতদার হিসেবে, তাকে অবশ্যই তার আমানত ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং সৎভাবে সম্পাদন করতে হবে, যাতে করে এই আমানত তার বিবেচনামতে যথার্থ প্রাপকের কাছেই অর্পিত হয়। তাকে অবশ্যই সচেতন ও সাবধান থাকতে হবে যে, তাকে তার কাজের জন্য খোদাতা'লার দৃষ্টিতে দায়ী হতে হবে।

এই ইসলামী কন্‌সেপ্ট বা ধারণা মতে, যদি কোন রাজনৈতিক দল কোন প্রার্থী মনোনীত করে, আর যদি কোন দলীয় সদস্য মনে করে যে সেই প্রার্থী তার জাতীয় আমানতের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে, তাহলে সেই সদস্যের উচিত হবে, সেই আমানত সম্পাদনে অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে দলত্যাগ করা। পার্টি আনুগত্য কোন সদস্যের ব্যক্তিগত পসন্দ-অপসন্দের উপরে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

তাছাড়া আমানত সম্পাদিত হতে হবে সরল বিশ্বাসে। সুতরাং প্রত্যেক ভোটারকে নির্বাচনের সময় ভোটাধিকার প্রয়োগে পূর্ণরূপে অংশ গ্রহণ করতে হবে, যদি না সে কোন কারণে অপারগ হয়। অন্যথায়, সে তার আমানতের দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ হবে। ভোট দানে বিরত থাকা বা ভোটাধিকার প্রয়োগ পরিহার করে চলার যে ধারণা যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচক মণ্ডলীর প্রায় অর্ধেক মাত্র ভোটার ভোট দানের গরজ করে থাকে, তার কোন জায়গা নেই ইসলামী কন্‌সেপ্টের গণতন্ত্রে।

ইসলামী সরকারের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তিঃ

হাল যামানার মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে এই ধারণাটা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যে, ইসলাম গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। আবার এদেরই রাজনৈতিক দর্শন অনুসারে, খোদা হচ্ছেন চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ, সার্বভৌমত্ত্ব শুধু তাঁরই এখতিয়ারভুক্ত।

ঐশী কর্তৃত্ব

নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌র মালিকানা বা বাদশাহাত সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে এই বলেঃ

فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ۝

"অতএব, আল্লাহ্ মহিমান্বিত প্রকৃত সর্বাধিপতি (বাদশাহ্)। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ (উপাস্য) নেই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।" (আল্ মুমেনূন - ২৩ঃ১১৭)

এই যে মৌলিক নীতি অর্থাৎ, শাসন করবার সমস্ত অধিকার কেবল আল্লাহ্‌র, এবং তিনিই সার্বভৌমত্বের একমাত্র প্রভু, তা নানাভাবে উল্লেখিত হয়েছে কোরআন করীমে, উপর্যুক্ত আয়াত তারই অন্যতম উদাহরণ।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয় দু'ভাবেঃ

ক) আইন (শরীয়াহ্ বা ব্যবস্থা), যার সর্বপ্রধান উৎস হচেছ কোরআন করীম, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) -এর সুন্নাহ্ এবং সেই সঙ্গে তাঁর সহীহ্ হাদীসসমূহ, যেগুলির বর্ণনা দিয়ে গেছেন প্রথম যমানার মুসলমানরা। এ সবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আইন প্রণয়ণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় নীতি-নির্দেশনা। এবং বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার

মধ্যে হস্তক্ষেপ করবার কোনও অধিকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোন সরকারেরও নেই।

খ) উল্লিখিত নীতির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণের কোন প্রক্রিয়াই বৈধ বলে গ্রাহ্য হবে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ইসলামের বিভিন্ন ফের্কার আলেমদের মধ্যে আইন-কানুন বা শরীয়াহ্ সম্পর্কে কোন ঐকমত্য নেই। তবে একটা ব্যাপারে সব আলেমরাই একমত যে, আইন প্রণয়ণের খাস-এখ্তিয়ার (Prerogative) একমাত্র আল্লাহ্র এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা প্রকাশিত করেছেন ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপরে কোরআনী ওহীর (ঐশীবাণীর) মাধ্যমে।

মুসলিম সরকারগুলো কীভাবে কার্য পরিচালনা করবে, সে ব্যাপারে জনপ্রিয় ধারণা হচ্ছে, দৈনন্দিন প্রশাসনিক ব্যাপারে, কাজেকর্মে, ব্যবস্থাদি গ্রহণে সরকার হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ্র ইচ্ছা প্রকাশের বা রূপায়ণের যন্ত্রতুল্য মাধ্যম এবং ক্ষমতা অর্পিত হওয়ার মাধ্যমে জনগণই হয়ে ওঠে সার্বভৌমত্বের অধিকারী, আর এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

মোল্লাতন্ত্র

এটাই হচ্ছে তথাকথিত গোঁড়াপন্থীদের কট্টর মত। এরা মুসলিম জনগণের আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রবণতার সঙ্গে সমঝোতায় আসে শুধু এই শর্তে যে, মোল্লাদেরকে এই চূড়ান্ত অধিকার দিতে হবে যে, তারা সমস্ত গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বৈধতা যাচাই করবে 'শরীয়া'র ভিত্তিতে।

এটা যদি গৃহীত হয়, তাহলে এই দাবীটার অর্থ হবে এই যে, আইন প্রণয়ণের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব খোদার হাতে থাকবে না, তা তুলে দেওয়া হবে গোঁড়াপন্থীদের হাতে, কিংবা বিশেষ কোন ফের্কার মোল্লাদের হাতে। যখন আপনি তাদের হাতে তুলে দেওয়া এই ভয়ংকর ক্ষমতাকে বিচার করে দেখবেন এই প্রেক্ষাপটে যে, কোনটি শরীয়া, এবং কোনটি শরীয়া, নয়, তা নিয়েই স্বয়ং মুসলিম আলেমদের মধ্যে মৌলিক মত-পার্থক্য রয়েছে, তখন যে পরিণতি আপনার সামনে ভেসে ওঠবে, তা এক কথায় ভয়াবহ। গোঁড়াপন্থীদের মধ্যে আইন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারার গোষ্ঠী (School of Thought) রয়েছে অসংখ্য। এমন কি, একই গোষ্ঠীর মধ্যেও ফতওয়া দানের ব্যাপারে সব সময়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাছাড়া, ইতিহাসে দেখা যায় যে, খোদার প্রকৃত ইচ্ছা কি -যা প্রকাশ পেয়েছে ইসলামী শরীয়া'তে -তা নিয়েও তাদের অবস্থান থেকে থেকেই পরিবর্তিত হয়েছে।

এই চিত্রটা একটা জটিল সমস্যা উপস্থাপিত করেছে সমকালীন ইসলামী বিশ্বের সামনে, যে বিশ্ব মনে হয়, আজও অব্দি তার প্রকৃত পরিচয় খুঁজে ফিরছে এটা এখন মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সামনে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠছে যে, ঐ সকল মোল্লা বা আলেমদের ঐকমত্যে পৌছবার জায়গা মাত্র একটাই, এবং তা হচ্ছে, তাদের 'শরীয়াহ্' প্রবর্তনের আপোষহীন দাবী। সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর মোল্লাদের জিহ্বায় আরও বেশী করে পানি এসেছে ইরানী বিপ্লবের পর। তাদের কথা হচ্ছে, খোমেনী যদি পারে তাহলে আমরা পারবো না কেন? এর পরে পরেই অবস্থিত তাদের আজগুবী কল্পনার রাজ্য, তাদের স্বপ্নের দেশ।

সাধারণ মানুষেরা তো বিভ্রান্ত। আপনার রাজনৈতিক মেনিফেস্টো রচনা করতে এবং তা কার্যকর করতে আপনি কি আল্লাহর বাণী এবং রসূলে পাক (সাঃ)-এর বাণীকে অগ্রাধিকার দেবেন, না কি নিরীশ্বর ও তাকওয়াশূন্য সমাজের কোন মানুষকে অগ্রাধিকার দেবেন? প্রশ্নটি সাধারণ মানুষের জন্যে অত্যন্ত কঠিন কারণ, তিনি নিজেই তো এ ব্যাপারে হতভম্ব হয়ে আছেন এবং একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়ে আছেন।

বহু মুসলিম দেশের জনগণ ইসলামকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসেঃ তারা খোদার ইচ্ছার (Will of God) জন্য এবং ইসলামের পবিত্র পয়গম্বর (সাঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। তথাপি, গোটা দৃশ্যটির মধ্যে এমন একটা কিছু রয়ে গেছে, যার জন্য তারা বিভ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ এবং দারুণভাবে অস্থির। যে অবস্থাটা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)-এর প্রতি তাদের ভালবাসা সত্ত্বেও, অতীতের সরকারগুলোর আমলে বহু রক্তাক্ত ঘটনার স্মৃতিকে জাগরূক করে দেয়। যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছিল হয় মোল্লাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণে, নয় তো মোল্লাদেরকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করার কারণে। মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থাটা হচ্ছে, তারা পরস্পর বিভক্ত এবং দ্বিধান্বিত। অনেকে আছেন যাঁরা মোল্লাদেরকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে পারেন না, বরং তাদের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। তাঁরা, অবশ্য মনে মনে এই আশাই পোষণ করেন যে, নির্বাচনের সময়ে মোল্লারা নয়, তাঁরাই নির্বাচিত হবেন, এবং তাঁরাই হবেন শরীয়ারও নির্বাচিত শক্তিশালী চ্যাম্পিয়ন। তাঁদেরকেই জনসাধারণ শরীয়া'র অভিভাবক হিসেবে মোল্লাদের চাইতে অধিক পসন্দ করবে। তাঁদের হাতেই জীবন সহজতর হবে, বাস্তবমুখী হবে; যা সম্ভব হবে না 'বেহেশ্তের হেফাযতকারীদের' কঠোর ও আপোষহীন নিয়ন্ত্রণের অধীনে। কিন্তু এটা যে একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা তা ঠিকই অনুধাবন করেন সত্যিকারের সৎ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদরা আফসোস যে, তাঁরা দ্রুত সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছেন। রাজনীতি ও প্রতারণার সঙ্গে সত্য ও সাধুতা, এবং অন্য কোন মহৎ

গুণ, মনে হয়, হাতে হাত দিয়ে চলতে পারে না। বুদ্ধিজীবীরা মোটামুটিভাবে গণতন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত। তাঁরা ইসলামকে ভালবাসেন, কিন্তু তাঁরা ধর্মতান্ত্রিক শাসনকেও ভয় পান। তাঁরা গণতন্ত্রকে ইসলামের বিকল্প হিসেবে মনে করেন না বটে, কিন্তু তাঁরা সত্যিসত্যি এটাও বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে গণতন্ত্রকেই পেশ করেছে স্বয়ং পবিত্র কোরআনঃ

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝

"এবং যারা নিজেদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নামায কায়েম করে, এবং তাদের কাজ তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, এবং আমরা তাদেরকে যা রিযক্ দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।" (আশ্ শূরা -৪২ঃ৩৯)

وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۝

"এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর; অতঃপর যখন তুমি সংকল্প কর, তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন।" (আলে ইমরান-৩ঃ১৬০)

বিভিন্ন দলের মধ্যে এইরূপ দড়ি টানাটানির মোটফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পাকিস্তানের মত তরুণ মুসলিম দেশগুলো একটা নিরর্থক বিভ্রান্তি ও পরস্পরবিরোধী অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে। এ সব দেশের নির্বাচকমণ্ডলীগুলো মেজাযগতভাবেই এর বিরোধী যে, আইন পরিষদগুলোতে মোল্লারা কোন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আসুক। এমনকি, শারীয়াহ্-জ্বর বা উত্তেজনা যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখনও মোল্লারা নির্বাচনে শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগের বেশী আসনে জয়লাভ করতে পারেনি তবু, রাজনৈতিক নেতারা মোল্লাদের একটা অতিরিক্ত সমর্থনের বদলায় আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়, এবং এর মাধ্যমে তারা একটা সম্পূর্ণ ঈর্ষামুক্ত অবস্থানে চলে যেতে যায়। যদিও, মনের গভীরে তারা এই নিশ্চিত বিশ্বাসই রাখে যে, 'শরীয়াহ' প্রবর্তনের ব্যাপারটা বস্তুতঃ কোন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের আইন প্রণয়ণের নীতি-বিরুদ্ধ।

যদি আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব খোদার হাতেই থাকে, যা কিনা কোন মুসলমানই অস্বীকার করতে পারবে না, তাহলে এর যৌক্তিক পরিণাম এটাই দাঁড়ার যে, মোল্লারা বা আলেমরাই কেবল 'শরীয়া' আইন বুঝবার এবং তার সংজ্ঞা দেবার খাস-এখতিয়ার রাখে। এই দৃশ্যপটে, আইন পরিষদগুলোর নির্বাচিত করার সকল কর্মকাণ্ডই ব্যর্থ ও অনর্থক প্রতিপন্ন হয়। আর যাই হোক সংসদ সদস্যদের কাজতো শুধু এতটুকুই নয় যে, তারা কেবল মোল্লাদের দেখিয়ে দেওয়া জায়গাগুলোতেই দস্তখত করবে।

এটা সত্যিই দুঃখবহ যে, না রাজনীতিবিদরা, না বুদ্ধিজীবীরা কখনও আন্তরিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করেন যে, পবিত্র কোরআন কোন্ ধরনের সরকার পদ্ধতি বা পদ্ধতিগুলোর কথা বলে বা স্বীকৃতি দেয়।

রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রতি বিভক্ত আনুগত্য

আল্লাহ্‌তা'লার কথা এবং কাজের মধ্যে কোনও পরস্পরবিরোধিতা নেই। রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রতি কারো আনুগত্যের মধ্যে কোন সংঘাত নেই ইসলামে। কিন্তু, এই প্রশ্নটা কেবল ইসলামের সঙ্গেই সম্পৃক্ত নয়।

মানবেতিহাসে এমন বহু ঘটনা ঘটে গেছে যখন বহু প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকেই এই প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

রোমান সাম্রাজ্য, বিশেষ করে, খৃষ্টান আমলের প্রথম তিন শতাব্দীতে খৃষ্টধর্মের প্রতি এই দোষারোপ করতো যে,তা আনুগত্যকে সাম্রাজ্য ও খৃষ্টধর্মের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এই অভিযোগের পরিণতি এই হতো যে, আনুগত্যহীনতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হতো এবং তাদের উপরে বর্বর ও অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো, তাদেরকে ঘরবাড়ী ছেড়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হতো।

চার্চ এবং রাষ্ট্রের মধ্যেকার এই সার্বক্ষণিক সংঘাত-সংঘর্ষ ইয়োরোপীয় ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথা বলা যায়, তিনি রোমান ক্যাথলিক মতবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনছিলেন যে, তা আনুগত্যকে বিভক্ত করে ফেলেছে। তাঁর জোর দাবী এটাই ছিল যে, প্রথম আনুগত্য থাকতে হবে ফরাসী জনগণ ও ফরাসী সরকারের প্রতি, এবং ফ্রান্সে কোন ভ্যাটিকান পোপকে রোমান ক্যাথলিকদের কোন ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করবার অনুমতি দেওয়া হবে না; এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতকেও রাষ্ট্রের কোন কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না।

সমকালীন ইতিহাসে, আমার নিজের সম্প্রদায় আহ্‌মদী মুসলমানরা পাকিস্তানে অনুরূপ কারণে মারাত্মক সমস্যাদির মোকাবেলা করছে। পাকিস্তানের দীর্ঘতম সময়ের শাসক সামরিক ডিক্টেটর জেনারেল মোহাম্মদ জিয়াউল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগপন্থী মোল্লা-মৌলবীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, আহমদীরা বিভক্ত আনুগত্যের সেই সেকেলে অভিযোগের অতি সহজ শিকারে পরিণত হতে থাকে ক্রমাগত বর্ধিত হারে। এমনকি, পাকিস্তান সরকার জেনারেল জিয়ার অধীনে, এক ধরনের একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে আহমদীদের বিরুদ্ধে। এবং তাতে এই দাবী রটনা করে যে, আহমদীরা না ইসলামের প্রতি অনুগত, না পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি। (পাকিস্তান সরকারের সেই 'কালো' শ্বেত-পত্রের বিস্তারিত ও অকাট্য জবাব দিয়েছেন এই ভাষণদাতা স্বয়ং ঃ অনুবাদক)

এটা সেই একই উন্মত্ত প্রেতাত্মা, যা আসর ফেলেছে বা পেয়ে বসেছে নতুন করে। মদ একই আছে, তবে বোতল বদলে ফেলা হয়েছে।

অতি সম্প্রতি, কুখ্যাত সালমান রুশদীর ঘটনার সময়ে, বৃটেনে এবং ইয়োরোপের বহু স্থানে মুসলমানরা সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল যে, তারা বিভক্ত আনুগত্য পোষণকারী। যদিও এটার তীব্রতা তুঙ্গে পৌছেনি, তবু, আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার ক্ষতিসাধন করবার যে ক্ষমতা, তাকে খাটো করে দেখবার অবকাশ নেই।

আইন প্রণয়নের অধিকার কি ধর্মের একচেটিয়া?

এটা একটা সার্বজনীন বিষয়। বিষয়টা নিয়ে অদ্যাবধি তেমন কোন পরীক্ষা নিরীক্ষাই চালানো হয় নি। রাজনীতিবিদরা বা ধর্মীয় নেতারা, কেউই, ধর্ম এবং রাষ্ট্রের মধ্যেকার এই সূক্ষ্ম নীল বিভক্তিকরণ রেখাটিকে মুছে ফেলবার উদ্যোগ নেয়নি।

খৃষ্টানদের সম্বন্ধে যতটা বলা যায় তা হচ্ছে, তাদের মধ্যে এই ইস্যুটার সমাধান চিরদিনের জন্য হওয়া উচিত ছিল। কেননা, এ ব্যাপারে ফরীশিদেরকে প্রদত্ত ঈসা (আঃ)-এর সেই ঐতিহাসিক জবাবই যথেষ্ট ছিলঃ

'অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেনঃ সুতরাং কায়সারের জিনিষ কায়সারকে দিয়ে দাও, কিন্তু খোদার জিনিষ খোদাকে।' (মথি-২২ঃ২১)

এই কথা ক'টি গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ। যতটুকু প্রয়োজন তার সবটুকুই এতে বলা হয়েছে।

ধর্ম ও রাষ্ট্র হচ্ছে, সমাজ নামক ওয়াগনটির অনেকগুলো চাকার মধ্যে দু'টি চাকা। এই ওয়াগনের চাকার সংখ্যা দু'টি, চারটি, না আটটি, সেটা বড় কথা নয়; চাকাগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা, সেগুলো তাদের কক্ষে ঠিক মত ঘুরছে কিনা, সেটাই বড় কথা। এগুলোর একটার সঙ্গে আর একটা ধাক্কা লাগার প্রশ্নই ওঠে না।

পূর্ববর্তী সমস্ত ঐশী শিক্ষার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে পবিত্র কোরআন এই বিষয়বস্তুকে বিস্তারিতভাবে পেশ করেছে, এবং সমাজের প্রত্যেকটি অংশের কাজকর্মের পরিধিকে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করে চিহ্নিত করে দিয়েছে। বিষয়টাকে অত্যন্ত লঘু করে দেখানো হবে যদি কেউ ধারণা করেন যে, এমন তো কোন মিলন-বিন্দু বা কমন (সাধারণ) জায়গা নেই, যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র একে অপরের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ধর্ম ও রাষ্ট্র-নীতিবিদ্যা অবশ্যই ওভারল্যাপ করে বা উপরোউপরি হয়, কিন্তু তা হয় পরস্পর সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে, একচেটিয়া করণের কোন উদ্দেশ্যই কারো থাকে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রতিটি ধর্মের নৈতিক শিক্ষার একটা বৃহৎ অংশ পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রণীত আইন-কানুনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গৃহীত হয়। এই অংশটা কোন কোন রাষ্ট্রে ক্ষুদ্র হতে পারে, আবার কোন কোন রাষ্ট্রে তা তুলনামূলকভাবে আইনের একটা বৃহৎ অংশও হতে পারে। নির্ধারিত শাস্তিসমূহ লঘু অথবা গুরু হতে পারে; কিন্তু শাস্তিদান করা হয়, এমন বহু অপরাধের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অননুমোদনকে, ধর্মের বরাত ছাড়াই সবসময়ে গোচরীভূত করা যায়। এগুলোর সঙ্গে অনেক সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) আইনের সঙ্গতি যদি নাও তাকে তবু, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী জনসাধারণ এ সব ব্যাপারে কদাচিৎ কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারের মোকাবেলায় আসতে চায়।

এটা শুধু মুসলমান বা খৃষ্টানদের বেলাতেই প্রযোজ্য নয়, এটা বরং পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য, 'মনুস্মৃতি' -এর খাঁটি হিন্দু আইনের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সরকারের সেক্যুলার আইনের কোন মিল নেই। তবু, সেখানে জনসাধারণ যে করেই হোক, একটা সমঝোতার অবস্থায় জীবনযাপন করছে।

যদি ধর্মীয় আইনকে বিভিন্ন দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় তাহলে পৃথিবীটা অনিবার্যরূপে একটা রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হবে। কিন্তু, মানুষের সৌভাগ্য যে, তেমনটা ঘটেনি।

ইসলামের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন সমস্যার উদ্ভব হতে পারে না। কেননা,এ ব্যাপারে যে চূড়ান্ত এবং অনমনীয় নীতি ইসলাম পেশ করে তা হচ্ছে 'নিরংকুশ সুবিচার'

-এর নীতি। এই নীতিই হতে হবে সেই সমস্ত সবকারেরও কেন্দ্রীয় ও মৌলিক নীতি যারা দাবী করে যে, তারা গুণগতভাবে ইসলামিক।

রাষ্ট্রনীতিবিদ্যার ইসলামী ধারণার এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে বুঝতে গিয়ে, অবশ্য আদৌ তা যদি বুঝতে চান, ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা এর খুব সামান্য অনুধাবন করে থাকেন। তাঁরা অপরাধ সম্পর্কিত সাধারণ আইন প্রয়োগের বেলায়, বৈশিষ্ট্যগতভাবে সার্বজনীন ও ধর্মীয় সম্বন্ধহীন কোন অপরাধের সঙ্গে ধর্মের নির্দিষ্ট আদেশাবলীর আওতাভুক্ত কোন অপরাধের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। বস্তুতঃ কোন অপরাধের জন্য যদি কোন ধর্মের সুনির্দিষ্ট আইন থাকে, তবে তা কেবল সেই ধর্মেরই অনুসারীদের জন্য প্রয়োজ্য হবে সেভাবেই তাদের বিচার চলবে।

এই উভয় শ্রেণীর অপরাধকে পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। এক্ষেত্রে এমন একটা বিরাট ধূসর এলাকা রয়েছে, যেখানে সাধারণ বা 'কমন' অপরাধগুলোর সঙ্গে ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশ্নও যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত সর্বগ্রাহ্য মানবীয় নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত নোংরা কাজ বা অপরাধের বিষয়টিও। একইভাবে, খুন, মদ্যপান ও জন-বিশৃংখলার প্রশ্নও আছে, এই সব অপরাধের জন্য কোন কোন ধর্মে সুনির্দিষ্ট শাস্তি প্রদানেরও বিধান রয়েছে।

অতএব, প্রশ্ন উঠে যে, রাষ্ট্র এই সকল অপরাধের নিষ্পত্তি কীভাবে করবে? এই প্রশ্ন থেকেই আবার প্রশ্ন উঠবে যে, ইসলাম এক্ষেত্রে এমন কোন সুস্পষ্ট এবং সুসংজ্ঞায়িত ফর্মুলা দেয় কিনা, যা সমস্ত মুসলিম সরকারের জন্য অবশ্য গ্রহণীয়; এবং অনুরূপ কোন ফর্মুলা অমুসলিম সরকারগুলোর জন্যেও দেয় কিনা, যা তাদের জন্য গ্রহণীয়? ইসলামে যদি অনুরূপভাবেই মুসলিম সরকারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়ও, তাহলেও আরও অনেক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে। যেমন, সেই রাষ্ট্রের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে, যে রাষ্ট্র নিজেকে কোন নির্দিষ্ট ধর্মের আদেশের অধীন মনে করে এবং নিজের অনুসৃত ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষাকে তার সকল নাগরিকের উপরে আরোপ করে, তা সেই নাগরিকরা সকলে সেই ধর্মের অনুসারী হোক, বা না হোক।

ধর্মের একটা কর্তব্য হচ্ছে নৈতিক বিষয়গুলোর প্রতি আইন পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তবে, এর কোন প্রয়োজন নেই যে, সমস্ত আইন প্রণয়নকেই ধর্মের এখ্তিয়ারের আওতাধীনে আনতে হবে।

এত বেশী ফের্কা বা সম্প্রদায়, এবং এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের তারতম্য, এবং এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিশ্বাসের পার্থক্যের পরিণতি তো স্রেফ বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্য ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মদ্যপান

নিষিদ্ধ, তবু এজন্য শাস্তি কি হবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা নেই কোরআন করীমে। এজন্য কিছু কিছু হাদীসের উপরে নির্ভর করা হলেও, তার সঠিকত্বকে আইন শাস্ত্রের বিভিন্ন গোষ্ঠী চ্যালেঞ্জ করে থাকে। এক এলাকায় বা দেশে শাস্তি এর রকম, অন্য এলাকায় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার তো কোন কমতি নেই কোথাও। ইসলামের ক্ষেত্রে যা সত্য তা তো অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্য। তালমুদের আইনের প্রয়োগ তো বস্তুতঃ সম্ভবই নয়। খৃষ্টানটির অবস্থাও তদ্রূপ।

সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) আইনের অধীনে যে কোন ধর্মের যে কোন অনুসারী তার ধর্ম পালন করতে পারে। তার সত্য বলবার ক্ষমতার উপরে রাষ্ট্রীয় আইনের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই সে সত্যকে মেনে চলতে পারে। সে তার এবাদত-বন্দেগী বা উপাসনা করতে পারে এবং তার উপাসনার আচার-অনুষ্ঠানাদিও পালন করতে পারে; এক্ষেত্রে অনুমতির জন্য কোন নির্দিষ্ট আইন পাশ করার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

এই প্রশ্নটিকে আরও একটা দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। ইসলাম যদি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মুসলিম সরকারগুলোকে ইসলামী আইন অনুযায়ী দেশ শাসনের অধিকার দেয়, তাহলে নিরংকুশ সুবিচারের মানদণ্ডে ইসলামকে অন্যান্য দেশগুলোর অন্যান্য সরকারগুলোকেও এই অধিকার দানে সম্মত হতে হবে যে, তারাও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ধর্মের আইন অনুযায়ী দেশ শাসন করবে। সুতরাং নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য হিন্দু আইন প্রযোজ্য হবে। এমনটি হলে, তা হবে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের জন্য এক অতি মর্মান্তিক অবস্থা। তারা তখন সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকবার যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। তাছাড়া, ভারত যদি 'মনুস্মৃতি'র আইন দ্বারা শাসিত হয়, তাহলে ইসরাঈল কেন পারবে না 'তালমুদের' আইন দ্বারা ইহুদী ও অইহুদী সবাইকে শাসন করতে? এমতাবস্থায় ইসরাঈলী জনগণের জীবন তো চরমভাবে দুর্বিসহ হয়ে উঠবেই, সেই সঙ্গে খোদ ইহুদীদেরও একটা বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর অবস্থা একই রকম হবে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের এই ধারণাটা ইসলামে কেবল তখনই একটা বৈধতা পেতে পারবে, যখন তা এই ধারণাটাও পেশ করবে যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ইসলামী শরীয়াহ্‌কে আইন করেই প্রবর্তন করতে হবে। কিন্তু, এতে আবারও একটা আপাতঃ বিরোধী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। কেননা, এতে করে, একদিকে, নিরংকুশ সুবিচারের নামে, সকল রাষ্ট্রকেই তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের আইন প্রয়োগের অধিকার দিতে হবে। অপরদিকে, পৃথিবীর দেশে দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিটি কাজকর্মই এমন একটি ধর্মের কঠোর শাসনের মধ্যে পড়বে, যে

ধর্মে তাদের বিশ্বাসই নেই। এটা হবে তখন নিরংকুশ সুবিচারের ধারণার প্রতি একটা প্রকাশ্য অবমাননা।

এই উভয় সংকট অবস্থাটার প্রতি তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ইসলামী আইনের প্রবক্তারা না কোন দৃষ্টি দিয়েছে, না তার সমাধানকল্পে কোন প্রচেষ্টা নিয়েছে। ইসলামী শিক্ষাকে আমি যতটা বুঝি তদনুসারে, সমস্ত রাষ্ট্রকেই পরিচালিত করতে হবে নিরংকুশ সুবিচারের নীতির ভিত্তিতে। আর এটা যদি করা হয়, তাহলে প্রতিটি রাষ্ট্রই পরিণত হবে মুসলিম রাষ্ট্রে।

এই সমস্ত যুক্তিতর্ক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই-এই বহু আলোচিত নীতির প্রেক্ষিতে এটা বোধ করি পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে যে, কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ধর্মের পক্ষে আইন প্রনয়ণের সর্ব প্রধান অথরিটি হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

ইসলামিক রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি

আমার গবেষণা সুস্পষ্টরূপে আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে যে, পবিত্র কোরআন সরকার পরিচালনার বিষয়টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে কোন প্রকারেই কোন পার্থক্যই করেনি।

রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে, সে সম্পর্কিত নির্দেশাবলী মানব জাতির সবার জন্যই অভিন্ন, যদিও সেজন্য প্রাথমিকভাবে মুমিনদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে কোরআন শরীফে। পবিত্র কোরআন যে রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির কথা বলে, তা হিন্দু, শিখ্ বৌদ্ধ, কনফুসিয়াস, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলিম ইত্যাদি সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

এই নির্দেশের মর্মকথা যে সমস্ত আয়াতে বলা আছে সেগুলি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করে এসেছি এখন আমরা অনুরূপ আরও দু'একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেব এখানেঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

"কিন্তু না , তোমার প্রভুর কসম! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সেই সকল বিষয়ে তোমাকে বিচারকরূপে মান্য করবে যে সকল বিষয়ে তাদের পরস্পরের

মধ্যে বিবাদ হয়, এবং যে সকল বিষয়ে তুমি ফয়সালা কর তাতে তারা সংকোচ বোধ না করবে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে।" (আল নিসা-৪ঃ৬৬)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن
تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সুবিচারের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার বা আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধেই যায়। (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হবে) যদি সে ধনী হয় বা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্খী। সুতরাং, তোমরা হীনকামনার অনুসরণ করো না যাতে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পার। এবং যদি তোমরা কথার মারপ্যাঁচে (সত্যকে) গোপন কর অথবা এড়িয়ে যাও, তাহলে (জেনে রেখো) তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন।" (আন্-নিসা- ৪ঃ১৩৬)

হযরত রসূলে পাক (সাঃ) -এর হাদীসও এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি প্রত্যেক রাজা বা শাসনকর্তা এবং কর্তৃপক্ষকে এই বলে দায়ী করেছেন যে, তারা তাদের প্রজাদের অথবা অধীনস্থদের প্রতি কীরূপ আচরণ করেছে সে ব্যাপারে তাদের প্রত্যেককেই খোদাতা'লার কাছে জবাবদিহি হতে হবে। কিন্তু, এ বিষয়ের আলোচনা যেহেতু আমরা পূর্বেই করে এসেছি সেহেতু এ নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই।

এই গবেষণার সারকথা হচ্ছে, ইসলাম এমন এক কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে, যা হবে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ; এবং যার রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির সকল কাজকর্ম রাষ্ট্রের সকল প্রজাসাধারণের জন্য অভিন্নভাবে এবং সমভাবে প্রযোজ্য হবে। এবং সরকারের কোন কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় মতপার্থক্যের কোন ভূমিকাই থাকতে পারবে না।

ইসলাম মুসলমানদেরকে সুনিশ্চিতরূপে এই উপদেশ দেয় যে, তাদেরকে পার্থিব প্রতিটি ব্যাপারে অবশ্যই আইনের শাসন মেনে চলতে হবেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى

أَلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর তাঁর এই রসূলের এবং তাদেরও যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর, তাহলে তোমরা তা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং শেষ দিবসের উপরে ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়ে অতীব উত্তম"। (আন্‌ নিসা- ৪ঃ৬০)

কিন্তু মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধের যে ক্ষেত্রটি তা সম্পূর্ণরূপেই ধর্মের জন্য একচেটিয়া এবং সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবার কোনও অধিকার নেই রাষ্ট্রের। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস এবং তার প্রকাশের ও পালনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে মনের ও হৃদয়ের। মানুষের এটা একটা মৌলিক অধিকার যে, সে যাকে খুশী বিশ্বাস করবে; সে চাইলে আল্লাহ্‌র এবাদত করবে, নয়তো তার ধর্মের বা পৌত্তলিক বিশ্বাসের নির্দেশ অনুসারে প্রতিমার পূজা করবে।

সুতরাং ইসলামের মতে, রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষেত্রগুলিতে যেমন হস্তক্ষেপ করবার অধিকার ধর্মের নেই, তেমনি, সব ধর্মের একচেটিয়া ক্ষেত্রগুলিতেও হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই রাষ্ট্রের। অধিকার ও দায়িত্বকে ইসলামে এত পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে যে, এতদুভয়ের মধ্যে সংঘাতের কোন অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে কোরআন করীমের অনেকগুলি আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় শান্তি সম্পর্কিত আলোচনায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময়, অনেক ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, তারা তাদের স্বাভাবিক সীমারেখার বাইরেও তাদের ধর্মনিরপেক্ষীকরণ বা সেক্যুলারাইজেশনের পরিধিটা বাড়াতে চান। একই প্রবণতা, অপর পক্ষে, ধর্মতান্ত্রিক অথবা যাজক বা মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের প্রতি সহানুভূতি অনুভব না করলেও, তাদের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রগুলোর কাত হয়ে পড়া বা অস্থিতিশীল অবস্থাকে যে কেউ খানিকটা হলেও অনুভব না করে পারবেন না। কিন্তু কেউ যখন সেক্যুলার দেশগুলোর তথাকথিত উন্নত উদার মনের জনগণেরও অনুরূপ অপরিণত মনোবৃত্তি দেখতে পান, তখন তা বিশ্বাস করাই তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এটাই শুধু মানুষের রাজনৈতিক আচরণের একমাত্র দিক নয়, যা বুঝে ওঠা দুষ্কর। রাজনীতি যতক্ষণ পর্যন্ত শুধু জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে একত্র

অনড়ভাবে আবদ্ধ থাকবে এবং তার সেই দর্শনকেই কাজে লাগাবে, ততক্ষণ নিরংকুশ নৈতিকতা বলতে কিছু থাকবে না। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যতক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধ জাতীয় সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত, নিজেদের বুঝমত জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত হলেই সত্য, সাধুতা, ন্যায়পরতাকে জলাঞ্জলি দিবে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটাই থাকবে রাষ্ট্রের প্রতি কোন নাগরিকের আনুগত্যের মানদণ্ড, ততক্ষণ মানুষের রাজনৈতিক আচরণ থাকবে সন্দেহজনক, বিতর্কিত এবং আপাতঃবিরোধী।

পবিত্র কোরআন সরকার ও জনগণের দায়িত্বাবলীর কথা বলেছে। এর মধ্যে কতকগুলো দায়িত্বের উল্লেখ করা হয়েছে এই বক্তৃতার পূর্ববর্তী অংশগুলোতে। যেমন, খাদ্য, বস্ত্র,আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা-সমূহের কথা; আন্তর্জাতিক সাহায্য সম্পর্কিত নীতির কথা; সরকার ও জনগণ উভয়ের প্রতি জবাবদিহিতার কথা; তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা; নিরংকুশ সুবিচারের কথা; এবং সমস্যার প্রতি জনগণের স্পর্শকাতরতা এবং যাতে করে তাদের কোন দাবীদাওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে আওয়াজ তুলতে না হয়, তারও কথা।

সরকার যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামিক পদ্ধতির হয়, তাহলে এটা সরকারেরই দায়িত্ব যে, তা সব সময়ে সতর্ক থাকবে যাতে করে জনসাধারণকে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য হরতাল করতে না হয়, শিল্প কারখানায় ধর্মঘট করতে বা বিক্ষোভ করতে না হয়, কিংবা অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত হতে না হয়। এক্ষণে, আমরা অন্যান্য আরও কিছু দায়িত্বের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দেব। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

"এবং যদি তুমি কোন জাতির পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর তাহলে সেক্ষেত্রে তুমিও সমানভাবে (তাদের অঙ্গীকার) তাদের দিকে নিক্ষেপ কর।। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদেরকে ভালবাসেন না।" (আল্ আনফাল - ৮ঃ৫৯)

যারা শাসন করবে তাদেরকে এমনভাবে শাসন করতে হবে যাতে কোনপ্রকার অরাজকতা, বিশৃংখলা, দুর্ভোগ এবং দুঃখদৈন্যের সৃষ্টি না হয়; বরং তাদেরকে এমন অধ্যবসায় সহকারে কার্যকরভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করতে হবে যাতে সমাজের প্রতিটি স্তরে শান্তি স্থাপিত হয়।

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ

خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

"অথবা, কে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির দোয়া শোনেন যখন সে তাঁর নিকট দোয়া করে এবং (তিনি) তার কষ্ট দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকার করে দেন? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।" (আন্ নমল-২৭ ঃ ৬৩)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিরংকুশ সুবিচারের নীতি সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য

এমন কি, আজকের রাজনৈতিক নেতা ও রাজনীতিবিদদেরও ইসলামিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এ এমন এক ধর্ম, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যার ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে নিরংকুশ সুবিচার বা ইনসাফ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ
شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ
أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসেবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদৌ এই অপরাধ করতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, এটাই তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং তোমরা যে কাজকর্ম করছো তার সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" (আল্ মায়েদা-৫ঃ৯)

আমি এটা দাবী করতে পারি না যে, দুনিয়ার সব বড় বড় ধর্মগুলোর সবকিছুই আমি পড়ে ফেলেছি। তবে, এ কথা বলাও ঠিক হবে না যে, আমি সেগুলির কিছুই জানি না। এইসব ধর্মের উপর পড়ালেখা করতে গিয়ে আমি এগুলির ধর্মগ্রন্থসমূহে এমন একটি নির্দেশও খুঁজে পাইনি যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের অনুরূপ। এমন কি, ঐ সব ধর্মগ্রন্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উল্লেখ নেই বললেই চলে। যদি অনুরূপ কোন শিক্ষা অন্য কোন ধর্মেও পাওয়া যায়, তাহলে আমি আপনাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিতে

ধর্মে তাদের বিশ্বাসই নেই। এটা হবে তখন নিরংকুশ সুবিচারের ধারণার প্রতি একটা প্রকাশ্য অবমাননা।

এই উভয় সংকট অবস্থাটার প্রতি তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ইসলামী আইনের প্রবক্তারা না কোন দৃষ্টি দিয়েছে, না তার সমাধানকল্পে কোন প্রচেষ্টা নিয়েছে। ইসলামী শিক্ষাকে আমি যতটা বুঝি তদনুসারে, সমস্ত রাষ্ট্রকেই পরিচালিত করতে হবে নিরংকুশ সুবিচারের নীতির ভিত্তিতে। আর এটা যদি করা হয়, তাহলে প্রতিটি রাষ্ট্রই পরিণত হবে মুসলিম রাষ্ট্রে।

এই সমস্ত যুক্তিতর্ক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই-এই বহু আলোচিত নীতির প্রেক্ষিতে এটা বোধ করি পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে যে, কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ধর্মের পক্ষে আইন প্রনয়ণের সর্ব প্রধান অথরিটি হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

ইসলামিক রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি

আমার গবেষণা সুস্পষ্টরূপে আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে যে, পবিত্র কোরআন সরকার পরিচালনার বিষয়টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে কোন প্রকারেই কোন পার্থক্যই করেনি।

রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে, সে সম্পর্কিত নির্দেশাবলী মানব জাতির সবার জন্যই অভিন্ন, যদিও সেজন্য প্রাথমিকভাবে মুমিনদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে কোরআন শরীফে। পবিত্র কোরআন যে রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির কথা বলে, তা হিন্দু, শিখ্ বৌদ্ধ, কনফুসিয়াস, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলিম ইত্যাদি সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

এই নির্দেশের মর্মকথা যে সমস্ত আয়াতে বলা আছে সেগুলি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করে এসেছি এখন আমরা অনুরূপ আরও দু'একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেব এখানেঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

"কিন্তু না , তোমার প্রভুর কসম! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সেই সকল বিষয়ে তোমাকে বিচারকরূপে মান্য করবে যে সকল বিষয়ে তাদের পরস্পরের

মধ্যে বিবাদ হয়, এবং যে সকল বিষয়ে তুমি ফয়সালা কর তাতে তারা সংকোচ বোধ না করবে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে।" (আল নিসা-৪ঃ৬৬)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن
تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সুবিচারের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার বা আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধেই যায়। (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হবে) যদি সে ধনী হয় বা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্খী। সুতরাং, তোমরা হীনকামনার অনুসরণ করো না যাতে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পার। এবং যদি তোমরা কথার মারপ্যাঁচে (সত্যকে) গোপন কর অথবা এড়িয়ে যাও, তাহলে (জেনে রেখো) তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন।" (আন্-নিসা- ৪ঃ১৩৬)

হযরত রসূলে পাক (সাঃ) -এর হাদীসও এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি প্রত্যেক রাজা বা শাসনকর্তা এবং কর্তৃপক্ষকে এই বলে দায়ী করেছেন যে, তারা তাদের প্রজাদের অথবা অধীনস্থদের প্রতি কীরূপ আচরণ করেছে সে ব্যাপারে তাদের প্রত্যেককেই খোদাতা'লার কাছে জবাবদিহি হতে হবে। কিন্তু, এ বিষয়ের আলোচনা যেহেতু আমরা পূর্বেই করে এসেছি সেহেতু এ নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই।

এই গবেষণার সারকথা হচ্ছে, ইসলাম এমন এক কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে, যা হবে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ; এবং যার রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির সকল কাজকর্ম রাষ্ট্রের সকল প্রজাসাধারণের জন্য অভিন্নভাবে এবং সমভাবে প্রযোজ্য হবে। এবং সরকারের কোন কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় মতপার্থক্যের কোন ভূমিকাই থাকতে পারবে না।

ইসলাম মুসলমানদেরকে সুনিশ্চিতরূপে এই উপদেশ দেয় যে, তাদেরকে পার্থিব প্রতিটি ব্যাপারে অবশ্যই আইনের শাসন মেনে চলতে হবেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى

أَلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর তাঁর এই রসূলের এবং তাদেরও যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর, তাহলে তোমরা তা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং শেষ দিবসের উপরে ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়ে অতীব উত্তম"। (আন্‌ নিসা- ৪ঃ৬০)

কিন্তু মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধের যে ক্ষেত্রটি তা সম্পূর্ণরূপেই ধর্মের জন্য একচেটিয়া এবং সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবার কোনও অধিকার নেই রাষ্ট্রের। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস এবং তার প্রকাশের ও পালনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে মনের ও হৃদয়ের। মানুষের এটা একটা মৌলিক অধিকার যে, সে যাকে খুশী বিশ্বাস করবে; সে চাইলে আল্লাহ্‌র এবাদত করবে, নয়তো তার ধর্মের বা পৌত্তলিক বিশ্বাসের নির্দেশ অনুসারে প্রতিমার পূজা করবে।

সুতরাং ইসলামের মতে, রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষেত্রগুলিতে যেমন হস্তক্ষেপ করবার অধিকার ধর্মের নেই, তেমনি, সব ধর্মের একচেটিয়া ক্ষেত্রগুলিতেও হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই রাষ্ট্রের। অধিকার ও দায়িত্বকে ইসলামে এত পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে যে, এতদুভয়ের মধ্যে সংঘাতের কোন অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে কোরআন করীমের অনেকগুলি আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় শান্তি সম্পর্কিত আলোচনায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময়, অনেক ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, তারা তাদের স্বাভাবিক সীমারেখার বাইরেও তাদের ধর্মনিরপেক্ষীকরণ বা সেক্যুলারাইজেশনের পরিধিটা বাড়াতে চান। একই প্রবণতা, অপর পক্ষে, ধর্মতান্ত্রিক অথবা যাজক বা মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের প্রতি সহানুভূতি অনুভব না করলেও, তাদের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রগুলোর কাত হয়ে পড়া বা অস্থিতিশীল অবস্থাকে যে কেউ খানিকটা হলেও অনুভব না করে পারবেন না। কিন্তু কেউ যখন সেক্যুলার দেশগুলোর তথাকথিত উন্নত উদার মনের জনগণেরও অনুরূপ অপরিণত মনোবৃত্তি দেখতে পান, তখন তা বিশ্বাস করাই তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এটাই শুধু মানুষের রাজনৈতিক আচরণের একমাত্র দিক নয়, যা বুঝে ওঠা দুষ্কর। রাজনীতি যতক্ষণ পর্যন্ত শুধু জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে একত্র

অনড়ভাবে আবদ্ধ থাকবে এবং তার সেই দর্শনকেই কাজে লাগাবে, ততক্ষণ নিরংকুশ নৈতিকতা বলতে কিছু থাকবে না। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যতক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধ জাতীয় সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত, নিজেদের বুঝমত জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত হলেই সত্য, সাধুতা, ন্যায়পরতাকে জলাঞ্জলি দিবে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটাই থাকবে রাষ্ট্রের প্রতি কোন নাগরিকের আনুগত্যের মানদণ্ড, ততক্ষণ মানুষের রাজনৈতিক আচরণ থাকবে সন্দেহজনক, বিতর্কিত এবং আপাতঃবিরোধী।

পবিত্র কোরআন সরকার ও জনগণের দায়িত্বাবলীর কথা বলেছে। এর মধ্যে কতকগুলো দায়িত্বের উল্লেখ করা হয়েছে এই বক্তৃতার পূর্ববর্তী অংশগুলোতে। যেমন, খাদ্য, বস্ত্র,আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা-সমূহের কথা; আন্তর্জাতিক সাহায্য সম্পর্কিত নীতির কথা; সরকার ও জনগণ উভয়ের প্রতি জবাবদিহিতার কথা; তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা; নিরংকুশ সুবিচারের কথা; এবং সমস্যার প্রতি জনগণের স্পর্শকাতরতা এবং যাতে করে তাদের কোন দাবীদাওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে আওয়াজ তুলতে না হয়, তারও কথা।

সরকার যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামিক পদ্ধতির হয়, তাহলে এটা সরকারেরই দায়িত্ব যে, তা সব সময়ে সতর্ক থাকবে যাতে করে জনসাধারণকে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য হরতাল করতে না হয়, শিল্প কারখানায় ধর্মঘট করতে বা বিক্ষোভ করতে না হয়, কিংবা অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত হতে না হয়। এক্ষণে, আমরা অন্যান্য আরও কিছু দায়িত্বের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দেব। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

"এবং যদি তুমি কোন জাতির পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর তাহলে সেক্ষেত্রে তুমিও সমানভাবে (তাদের অঙ্গীকার) তাদের দিকে নিক্ষেপ কর।। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদেরকে ভালবাসেন না।" (আল্ আনফাল - ৮ঃ৫৯)

যারা শাসন করবে তাদেরকে এমনভাবে শাসন করতে হবে যাতে কোনপ্রকার অরাজকতা, বিশৃংখলা, দুর্ভোগ এবং দুঃখদৈন্যের সৃষ্টি না হয়; বরং তাদেরকে এমন অধ্যবসায় সহকারে কার্যকরভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করতে হবে যাতে সমাজের প্রতিটি স্তরে শান্তি স্থাপিত হয়।

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ

خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

"অথবা, কে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির দোয়া শোনেন যখন সে তাঁর নিকট দোয়া করে এবং (তিনি) তার কষ্ট দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকার করে দেন? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।" (আন্ নমল-২৭ ঃ ৬৩)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিরংকুশ সুবিচারের নীতি সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য

এমন কি, আজকের রাজনৈতিক নেতা ও রাজনীতিবিদদেরও ইসলামিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এ এমন এক ধর্ম, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যার ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে নিরংকুশ সুবিচার বা ইনসাফ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ
شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ
أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসেবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদৌ এই অপরাধ করতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, এটাই তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং তোমরা যে কাজকর্ম করছো তার সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" (আল্ মায়েদা-৫ঃ৯)

আমি এটা দাবী করতে পারি না যে, দুনিয়ার সব বড় বড় ধর্মগুলোর সবকিছুই আমি পড়ে ফেলেছি। তবে, এ কথা বলাও ঠিক হবে না যে, আমি সেগুলির কিছুই জানি না। এইসব ধর্মের উপর পড়ালেখা করতে গিয়ে আমি এগুলির ধর্মগ্রন্থসমূহে এমন একটি নির্দেশও খুঁজে পাইনি যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের অনুরূপ। এমন কি, ঐ সব ধর্মগ্রন্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উল্লেখ নেই বললেই চলে। যদি অনুরূপ কোন শিক্ষা অন্য কোন ধর্মেও পাওয়া যায়, তাহলে আমি আপনাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিতে

পারি যে, ইসলাম সেই শিক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবে, কেননা ইসলামের শিক্ষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্বশান্তির মূল চাবিকাটি।

বিশ্বশান্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ সারাটা পৃথিবী উদ্বিগ্ন। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ক্রমোন্নতির ফলে একটা ক্ষীণ আশার আলো ফুটে উঠছে। তাই বিশ্ব এখন একটা খোশ-মোজাযেই আছে। বড় বড় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে সাধারণ ঐকমত্য সূচিত হয়েছে তাকে অতিশয় আশাব্যঞ্জক বলে মনে হচ্ছে, এমনকি, যে সব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী পরিবর্তন এখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার সম্ভাব্য ফলাফলের প্রেক্ষিতে তা সুখকর বলেও প্রতীয়মান হচ্ছে।

বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জগৎ, মনে হচ্ছে, অতি-আস্থাশীল ও উল্লসিত হয়ে উঠেছে। এই উল্লাস চেপে রাখা আমেরিকানদের পক্ষে তো কষ্টসাধ্যই হয়ে পড়েছে; এবং তাদের এই উল্লাস দিনে দিনে বৃদ্ধিও পাচ্ছে। তারা মনে করে যে, কম্যুনিষ্ট জগতের উপরে তাদের একটা সর্বাত্মক বিজয় হয়েছে, যাকে অনেকেই মনে করে, অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়্যের বিজয়।

বর্তমান সময়ের আঞ্চলিক-রাজনীতির (Geo-Political) পরিস্থিতি এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করাটা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না। তবে, এই বিষয়টার উপরে আমি হয়তো ঘন্টা কয়েক সময় দিতে পারবো, এ বছর (১৯৯৪) জুলাইয়ের শেষে অনুষ্ঠিতব্য যুক্তরাজ্যের আহ্‌মদী মুসলিম সম্প্রদায়ের বার্ষিক জল্‌সাতে।

জাতিসংঘের ভূমিকা

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে বিশ্বশান্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তন্মধ্যে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এবং তা হচ্ছে জাতিসংঘ সম্পর্কিত। জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং রক্ষায় (অর্থাৎ স্থাপন করতে এবং ধরে রাখতে) পূর্বের চাইতে অনেক বেশী কার্যকর যে ভুমিকা পালন করতে যাচ্ছে, তা নিয়েই এ বিতর্ক।

দু'টি পরাশক্তির মধ্যেকার শীতল যুদ্ধ শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, বলা হচ্ছে যে, এতদিন তাদের উভয়ের যে ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তার ব্যবধান এখন কমে আসার উত্তম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে, নিরাপত্তা পরিষদে আরও কম ভেটো প্রয়োগ, এবং বিশ্বজোড়া সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যাপারে আরও বেশী ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এমনটি হচ্ছে, ভবিষ্যতে নিরাপত্তা পরিষদের একটা সম্পূর্ণ নতুন চেহারা ফুটে উঠবে।

বাকী মাত্র একটাই গেটো–চীন; চীনের বাইরে-থেকে খেলে যাওয়ার বিপদ। কিন্তু, চীনের অত্যন্ত জটিল সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষিতে, চীনকে সম্মত হওয়ার পক্ষে সুবিধাদি দেখিয়ে রাজী করানোটাও কোন অসম্ভব ব্যাপার হওয়া উচিত হবে না।

এই স্বপ্ন সত্য হবে কি না, সেটা ভিন্ন কথা। ধরা যাক, নিরাপত্তা পরিষদ এবং একইভাবে জাতিসংঘ এত বেশী শক্তিশালী রাজনৈতিক সংস্থারূপে আবির্ভূত হলো যে, তা পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম, এবং ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোকে পৃথিবীর জাতিসমূহের সর্বোচ্চ ইচ্ছার কাছে জবরদস্তি করে হলেও নতি স্বীকার করাতে সক্ষম। তবে, এই ধরনের একটা দৃশ্যপটের কথা চিন্তা করা সম্ভব ছিল না, বার্লিন-প্রাচীরের পতনের পূর্বে। তবু, প্রশ্ন একটা থেকেই যাচ্ছে; না, বরং তা আরও বৃহৎ আকারে রাজনৈতিক দিগন্তে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, এবং তা এই যে, জাতিসংঘকে তার বিপুল আয়তনের বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক যৌথ ক্ষমতার দরুন যে নতুন ভূমিকা পালন করতে হবে, তাতে সে কার্যতঃ বিশ্ব-জোড়া শান্তি অর্জনে সক্ষম হবে কি না?

আমার কথাগুলো যদি অতি-নৈরাশ্যবাদী শোনায়, তাহলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু, আমার যে উত্তর এই প্রশ্নের, তা একটা নিতান্তই আত্মপক্ষ সমর্থনসূচক– 'না'। পৃথিবীর বুকে যুদ্ধ এবং শান্তির এই ইস্যুটি কেবল পরাশক্তিগুলোর সম্পর্কের সুতোতেই ঝুলন্ত নয়। বরং, এটা একটা গভীর এবং জটিল প্রশ্ন, যার শিকড়গুলো প্রোথিত রয়েছে পৃথিবীর জাতিসমূহের রাজনৈতিক দর্শন এবং নৈতিক মনোভঙ্গীর গভীর প্রদেশে।

তদুপরি, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার প্রসার্যমান ব্যবধান পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে বাধ্য। এর কিছু কিছু ফলাফলের কথা এই বক্তৃতার পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশগুলোর পরস্পরের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরংকুশ সুবিচারের নীতি গৃহীত হবে এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলা হবে, এবং গরীবদের সম্পদ হরণকারী অসাধু বাজার পদ্ধতিসমূহ জাতিসংঘের সকল সদস্য কর্তৃক তাদের জন্যই অপসারিত হবে, ততক্ষণ কোন শান্তিই নিশ্চিত হতে পারবে না, এমনকি, পৃথিবীর জাতিগুলোর জন্য, তা কল্পনাও করা যাবে না। যতদিন পর্যন্ত জাতিসংঘের সহিত তার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সম্পর্ক এখনকার চাইতে আরও বেশী পরিষ্কাররূপে সংজ্ঞায়িত ও সুনির্দিষ্ট করা না হবে, ততদিন বিশ্বশান্তির ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা বিবর্ণই থেকে যাবে।

জাতিসংঘ কোন একটা দেশের তথাকথিত অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কতটা হস্তক্ষেপ করতে পারবে, তা একটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর প্রশ্ন। কিন্তু, তবু তা বিশ্ব-শান্তি অর্জনের জন্য একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু যদি, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জাতিসংঘের কার্যপ্রণালী নিরংকুশ সুবিচারের নীতির ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে না; এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মান বা স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলা হচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে জাতিসংঘ কর্তৃক কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা ও সুযোগ যদি অধিক থাকে , তাহলে, তা সমস্যা সমাধান করার চাইতে সমস্যার সৃষ্টিই করবে বেশী। সুতরাং, এই ইস্যুটার উপরেও পুংখানুপুংখ, ধীরস্থির, স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এতদিনে যা ঘটেছে, তা শুধু এতটুকু যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং প্রাচ্য ব্লকের দেশগুলো স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দর্শন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার প্রতিবেশী পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে জীবনের মান উন্নত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাপারটা, আবার বিরাট এক বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেছে।

ঘটনাবলী কীভাবে রূপ পরিগ্রহ করে তা দেখার আগে কুয়াশা অপসারিত হবে না। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কি সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটবে? এবং তার পশ্চাতে কি আবারও সামগ্রিকভাবেই পুঁজিবাদের উন্মত্ত প্রত্যাবর্তন ঘটবে? না কি, মিশ্র-অর্থনীতির একটা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে? সর্বময়-ক্ষমতার অধিকারী সরকারগুলোর কেন্দ্রীয় কঠোর নিয়ন্ত্রণই কি একেবারেই ভেঙ্গে পড়বে? নাকি সর্বময় নিয়ন্ত্রণ স্বয়ং খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়বে, যার পরিণতিতে সৃষ্টি হবে এক নৈরাজ্যকর অবস্থা? না কি সর্বময় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ক্রমাগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে দেয়া-নেয়ার নীতির ভিত্তিতে নতুন কোন আপোষমূলক পদ্ধতির প্রবর্তন হবে যাতে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের অধিকারসমূহ ক্রমাগতভাবে বর্ধিতহারে স্বীকৃতি লাভ করবে এবং মৌলিক মানবাধিকারসমূহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে?

এখন অপেক্ষা করে এটাই দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একদিকে মিঃ গর্বাচেভের 'পেরেস্ত্রয়কা' ও 'গ্লাসনস্ত'-এর ধারণা এবং অপরদিকে কম্যুনিষ্ট শাসক গোষ্ঠীর কট্টর গোঁড়াপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে সংগ্রাম, তার ফলাফল কি দাঁড়ায়। আমার জানা মতে, ইউ,এস,এস, আর -এর শ্রেণীহীন সমাজের প্রায় সবটুকু মুনাফাই বাঁটোয়ারা হয়ে যায় পার্টির উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সিভিল সার্ভেন্টস্ এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর মধ্যে। কাজেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, তারা সবাই বর্তমানে যে রক্তপাতহীন প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হয়ে চলেছে তার জন্মলগ্নের এই জটিল পর্যায়ে কি ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে, তাও দেখার জন্যে অপেক্ষা করা।

এগুলো এবং অনুরূপ আরও অনেক প্রশ্নের জবাব পেতে হবে, নইলে বিশ্বশান্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উপরে এগুলোর কী প্রভাব পড়বে তা কারো পক্ষেই সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভব হবে না।

কেবলমাত্র দু'টো পরাশক্তির মধ্যেকার দাঁতাতই শান্তির আশা বয়ে আনতে পারে না। বরং, এর বিপরীতে, এই দাঁতাতের দরুন, বিশেষ করে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপরে বিপদাবলীর ওঁৎপেতে থাকা প্রেতাত্মাগুলোকেই ডেকে আনা হবে। দু'টো পরাশক্তির মধ্যে এতদিন যে অনাস্থা ও ঈর্ষাপরায়ণতা বিরাজ করছিল, বস্তুতঃ তার কারণেই দুর্বল জাতিগুলো তাদের মাথার উপরে একটা আচ্ছাদন পেয়ে যেতো। তাছাড়া এর দরুন দুর্বল জাতিগুলোর এই ক্ষমতাও ছিল যে, তারা আনুগত্য পরিবর্তন করে প্রয়োজনে 'পশ্চিম' থেকে 'পূর্বে' কিংবা 'পূর্ব' থেকে 'পশ্চিমে' যোগ দিতে পারতো। এতে তাদের পক্ষে কৌশলগত অবস্থান পরিরবর্তনের এবং দর কষাকষি করবার সুযোগও থাকতো। কিন্তু এখন আর সেটাও নেই। এই দুর্বল জাতিগুলো এখন স্বাধীন জাতি হিসেবে ভবিষ্যতে সসম্মানে বেঁচে থাকবার কতটুকু আশাই বা আর করতে পারে?

এই পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনা আবারও চলে যায় জাতিসংঘের দিকে, জাতিসংঘ শান্তির এক দুর্গস্বরূপ এবং একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আশার আলোক বর্তিকা-স্বরূপ। অন্ততঃ, এটাই সকলের কাম্য। যদিও, গভীর ও পুংখানুপুংখ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে চিত্র ফুটে ওঠে তা একেবারেই বিবর্ণ, পীড়াদায়ক, এমনকি, ভয়াবহ।

নতুন করে যে ক্ষমতার ভারসাম্যের উদ্ভব ঘটছে, তাতে কি জাতিসংঘ কার্যতঃ একটি মাত্র পরাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না? এর ফলে, ছোট ও দুর্বল জাতিগুলোর পক্ষে তো শিকারের জানোয়ারের অনিবার্য পরিণতি থেকে বাঁচবার আর কোন পথই খোলা থাকবে না।

বর্তমানের জাতিসংঘ একদিকে সুবিচারের বিপক্ষে, এবং অপরদিকে যে জাতি যখন তার রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে সেই জাতির পক্ষে, কাজ করার ক্ষেত্রে বার বার একটি শক্তিশালী সংস্থা হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করতে পেরেছে। সাম্প্রতিক কালে, জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় 'ন্যায্য ও অন্যায্য'-এর ধারণা কখনও কোন ভূমিকা পালন করেছে বলে আমাদের স্মৃতিতে নেই; এবং এর বর্তমান যে কাঠামো তাতে এর পক্ষে ভবিষ্যতেও কোন অর্থবহ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। রাজনীতি ও কুটনীতি, আধুনিক রাজনীতির যমীনে এত গভীরভাবে এবং শক্তভাবে প্রোথিত যে, এখন সেখানে

নিরংকুশ সুবিচারের পক্ষে শিকড় গাড়ার আর কোন জায়গাই নেই; ফলে তার উত্তরণের কোন উত্তম সুযোগও আর বাকী নেই। এটাও একটা কঠিন ও তিক্ত সত্য–যাকে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোন ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব হবে না যে, এই বিশাল ও জবরদস্ত সংস্থাটিকে এখন পেঁচালো কুটনৈতিক কার্যকলাপ, লবিং বা তোয়াজ-তোষামোদ, গোপন কারসাজি এবং ক্ষমতার লড়াইয়ের জায়গায় পরিণত করা হয়েছে, এবং এ সবকিছুই করা হচ্ছে বিশ্বশান্তির নামেই।

সুতরাং, কোরআন করীমের মতে, পৃথিবীর জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা নিজেকে সুবিচার অর্থাৎ ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রাখবে। নিরংকুশ ইনসাফ ছাড়া শান্তির কল্পনা করাও অসম্ভব। শান্তির নামে শান্তি নস্যাতের দৃঢ় প্রতিবাদে যে কেউ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে, বিবেকের শ্বাসরোধ করতে পারে, এবং তারপরও বলতে পারে যে, সে এসব কিছুই করছে শান্তি প্রতিষ্ঠার অভীষ্ট লক্ষ্যেই; কিন্তু এসব কিছুর দ্বারা সে যা অর্জন করবে, তা শান্তি নয়, মৃত্যু।

হায়! দুনিয়ার বড় বড় রাজনীতিকদের খুব স্বল্প সংখ্যক নেতাই বুঝেন–মৃত্যু এবং শান্তির পার্থক্য।

মৃত্যু জন্ম নেয় শক্তিমদমত্তের অন্যায়, অবিচার, স্বৈরাচার ও অত্যাচারের গর্ভে;

শান্তি, সে তো সুবিচারের সন্তান।

পবিত্র কোরআন বার বার শান্তির কথা বলেছে, কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই তার সাথে সাথে সুবিচারের কথাও বলেছে। শান্তির উল্লেখ এসেছে বারবার, কিন্তু তা সুবিচার প্রতিষ্ঠার শর্ত সাপেক্ষেই। দু'জন মুসলমান অথবা দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা কিংবা সক্রিয় শত্রুতা চলাকালীন অবস্থায় পবিত্র কোরআনের নির্দেশ হচ্ছেঃ

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ
بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ
أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ
أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

নিরংকুশ সুবিচারের পক্ষে শিকড় গাড়ার আর কোন জায়গাই নেই; ফলে তার উত্তরণের কোন উত্তম সুযোগও আর বাকী নেই। এটাও একটা কঠিন ও তিক্ত সত্য–যাকে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোন ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব হবে না যে, এই বিশাল ও জবরদস্ত সংস্থাটিকে এখন পেঁচালো কুটনৈতিক কার্যকলাপ, লবিং বা তোয়াজ-তোষামোদ, গোপন কারসাজি এবং ক্ষমতার লড়াইয়ের জায়গায় পরিণত করা হয়েছে, এবং এ সবকিছুই করা হচ্ছে বিশ্বশান্তির নামেই।

সুতরাং, কোরআন করীমের মতে, পৃথিবীর জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা নিজেকে সুবিচার অর্থাৎ ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রাখবে। নিরংকুশ ইনসাফ ছাড়া শান্তির কল্পনা করাও অসম্ভব। শান্তির নামে শান্তি নস্যাতের দৃঢ় প্রতিবাদে যে কেউ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে, বিবেকের শ্বাসরোধ করতে পারে, এবং তারপরও বলতে পারে যে, সে এসব কিছুই করছে শান্তি প্রতিষ্ঠার অভীষ্ট লক্ষ্যেই; কিন্তু এসব কিছুর দ্বারা সে যা অর্জন করবে, তা শান্তি নয়, মৃত্যু।

হায়! দুনিয়ার বড় বড় রাজনীতিকদের খুব স্বল্প সংখ্যক নেতাই বুঝেন–মৃত্যু এবং শান্তির পার্থক্য।

মৃত্যু জন্ম নেয় শক্তিমদমত্তের অন্যায়, অবিচার, স্বৈরাচার ও অত্যাচারের গর্ভে;

শান্তি, সে তো সুবিচারের সন্তান।

পবিত্র কোরআন বার বার শান্তির কথা বলেছে, কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই তার সাথে সাথে সুবিচারের কথাও বলেছে। শান্তির উল্লেখ এসেছে বারবার, কিন্তু তা সুবিচার প্রতিষ্ঠার শর্ত সাপেক্ষেই। দু'জন মুসলমান অথবা দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা কিংবা সক্রিয় শত্রুতা চলাকালীন অবস্থায় পবিত্র কোরআনের নির্দেশ হচ্ছেঃ

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ
بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ
أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ
أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

"এবং যদি মুমিনদের দু'টি দল (ব্যক্তি হোক বা জাতি হোক) পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাবে; যদি (মীমাংসার পরেও) তাদের উভয়ের মধ্য থেকে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করে আক্রমণ করে বসে, তাহলে তোমরা সকলে মিলে যে বিদ্রোহ করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি সে ফিরে আসে, তাহলে তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করিয়ে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।"

"নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর, যাতে তোমাদের উপরে রহম করা হয়।" (আল্ হুজুরাত- ৪৯ঃ১০, ১১)

উপর্যুক্ত আয়াত দু'টিতে বোধগম্য কারণেই, অমুসলিমদের কথা বলা হয়নি। কেননা, এটা আশা করা যায় না যে, তারা আল্ কোরআনের শিক্ষা মেনে চলবে। তথাপি, এই আয়াতদ্বয়ের শিক্ষা সারা পৃথিবীর জন্যই অনুসরণযোগ্য উৎকৃষ্ট আদর্শরূপে গৃহীত হতে পারে।

যখন দুনিয়ার চোখগুলো জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের দিকে তাকিয়ে আছে এই আশা নিয়ে যে, তারা আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদগুলো মিটিয়ে ফেলার জন্য অধিক কার্যকর বৃহত্তর এবং অর্থবহ ভূমিকা পালন করবে, এবং দুনিয়াটাকে একটা সুরক্ষিত, নিরাপদ ও শান্তির আবাসে রূপান্তরিত করবে, তখন দেখা যাচ্ছে, জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডের অতীত ইতিহাসে এমন কিছু নেই যার প্রেক্ষিতে আস্থা রাখা সম্ভব যে, এই অতি ব্যগ্র চিন্তাটা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারবে। এটা এখন লবীং, ষড়যন্ত্র, গোপন কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটা বিশ্ব-মল্লক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে, প্রেসার-গ্রুপ গঠন করা, প্রতিপক্ষের উপরে যে করেই হোক প্রাধান্য বিস্তার করা। যেখানে বিবেকের দংশনের কোন ভূমিকা নেই, যেখানে মানব-বিবেকের প্রবেশের পথই রুদ্ধ, তাকে অবশ্যই, জাতিসমূহের একটা পরিষদ বলা যায় বৈ কি! হোক না তা দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর বিশৃংখলায় পরিপূর্ণ! কিন্তু, এমন একটা পরিষদকে জাতিসংঘের পরিষদ বলাটা তো একটা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাই যদি হয় ঐক্যের ধারণা (কন্‌সেপ্ট), তাহলে তার পরিবর্তে কোনও ব্যাপারেই ঐক্যবদ্ধ নয়, কিন্তু সত্য ও সুবিচারের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ, এমন একটা জাতিপুঞ্জের ভেতরে আমি একলা হলেও বেঁচে থাকার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকবো।

প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয় করা আবার তাতেই অসম্মতি জ্ঞাপন করা, এমন একটা কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার প্রতি প্রত্যেকটি জাতির উচিত মনোযোগ নিবদ্ধ করা এবং তার সমাধান করা। যে কেউ ভাবলে অবাক হবে, তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে যে, জাতিগুলোর কার্যাবলী যে পদ্ধতিতে, যে স্টাইলে পরিচালিত হচ্ছে, তার মধ্যে নিহিত যে বিপদাবলী, তার প্রতি চোখ বন্ধ রেখে, চিত্তের দুয়ার বন্ধ রেখে আর কতদিন চলবে মহান এই পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রবর্গ!

বিশ্বশান্তি আজ এই ক্ষীণ আশার একখণ্ড সূতোর ডগায়, অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে যে, অবশেষে–

সুবিচারের জয় হবে,
সুবিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

ব্যক্তিগত শান্তি

১. নিজের সাথে শান্তিতে থাকা,
২. সৎকাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা,
৩. আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভালবাসা,
৪. অপরের সেবা করা,
৫. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা,
৬. অন্যান্য মানুষের জন্য সর্বক্ষণ সতর্ক থাকা,
৭. সদয় ও স্নেহময় সেবাযত্নের পরিধি বৃদ্ধি করা,
৮. মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য,এবং
৯. আল্লাহ্ ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়।

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ
تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ۝

"যারা ঈমান আনে, এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখো আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।" (আর্ রাদ- ১৩ঃ২৯)।

নিজের সাথে শান্তিতে থাকা

পরিশেষে শেষ– তবে অপ্রয়োজনীয় নয়, -আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, একটি শান্তিপূর্ণ অথবা অশান্তিপূর্ণ সমাজের সৃষ্টিতে সমাজের প্রত্যেকটি সদস্যের গুণাবলী এবং দৃষ্টিভঙ্গী সর্বাপেক্ষা বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আমরা এ পর্যন্ত ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সেই সৌধসমূহের স্থাপত্য ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছি যা ইসলাম নির্মাণ করতে চায়। এই সব সৌধ নির্মাণের জন্য যে ইট ব্যবহার করতে হবে তার উপরে অর্থাৎ ব্যক্তির চরিত্র ও গুণাগুণের উপরেই বেশী জোর দিয়েছে ইসলাম। বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং তা বিস্তারিতভাবে বলা আছে কোরআন করীমের সর্বত্রই। আমার বুঝ মতে, ইসলাম সমাজের প্রতিটি সদস্যের চরিত্রে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো সৃষ্টি করতে চায়।

সৎকাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা

ইসলামের মতে, কামনা-বাসনা এবং ইচ্ছা-অভিলাষ উভয়ই কর্মরত ও ত্রাসকৃত হয়ে থাকে ঐশী হেদায়াত বা নির্দেশনার অধীনে, যাতে করে একটা সুষম ভারসাম্য অর্জিত হতে পারে। এইরূপ একটা ভারসাম্য ব্যতীত সামাজিক শান্তি অর্জন করা অসম্ভব। ইসলাম সেই সমস্ত বাসনা-কামনা এবং ইচ্ছা-অভিলাষকে উদ্বুদ্ধ করে যেগুলো পূরণের জন্য মানুষের আর্থিক অবস্থার উপরে ততটা নির্ভর করতে হয় না, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সমাজের সব স্তরের মানুষই বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে পেতে পারে।

সাধারণ গতানুগতিক অবস্থার উর্ধ্বে উঠার এবং মান-মর্যাদা অর্জনের অভিলাষ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু, অন্যদেরকে ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠার এই বাসনাকে যদি সুশৃংখল ও ত্রাস করা না হয়, তাহলে তা ক্ষতিকর হতে বাধ্য। ঈর্ষা এবং অবৈধ ক্রিয়াকলাপ, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মুক্ত প্রতিযোগিতার চেতনাকে এতটা বিষিয়ে তুলতে পারে যে, সারাটা সমাজই তখন প্রতিযোগিতার চেতনা থেকে লাভবান হওয়ার চাইতে, বরং , দুর্ভোগ পোহাতেই শুরু করে।

খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভের জন্য ড্রাগ ব্যবহারের প্রবণতাকে এক্ষেত্রে একটা ছোট উদাহরণরূপে গণ্য করা যায়। কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার জন্য সমতল মাঠের অভাব অত্যন্ত বিশ্রী উদাহরণ পেশ করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অবৈধ খেলার ধরন, এক্ষেত্রে, উন্নত দেশগুলোর ধরন থেকে ভিন্ন। তৃতীয় বিশ্বে দ্রুত অর্থনৈতিক সাফল্যের

জন্য যে সমস্ত পন্থা অবাধে অবলম্বন করা হয়, তার মধ্যে কয়েকটা হচ্ছে, দুর্নীতি, ভেজাল-মিশ্রণ, চুক্তিভঙ্গ, প্রতারণা ইত্যাদি। এ কারণেই, মানবীয় কার্যকলাপের সকল ক্ষেত্রেই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। এই জাতীয় শিক্ষার অভাব অতি ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে।

ইসলাম আমাদেরকে এ ব্যাপারে যে বিস্তারিত নির্দেশাবলী দান করে, তা প্রতিযোগিতামূলক আচরণের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু, হায়! স্বয়ং মুসলিম দেশগুলোতেও, যেখানে ইসলামীকরণ এবং মৌলবাদের এত কথা শোনা যায়, সেখানেও শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য বিষয়গুলোকে ইসলামী করণের জন্য, কদাচিৎ কাউকে কোন সত্যিকারের উদ্যোগ নিতে দেখা যায়; কী করুণ এই ট্রাজেডি!

এ ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষার সারকথা ব্যক্ত করা হয়েছে কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا
يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

"এবং প্রত্যেকের জন্যই কোন না কোন (চূড়ান্ত) লক্ষ্যস্থল রয়েছে যার প্রতি সে (সমস্ত) মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। সুতরাং, (তোমাদের লক্ষ্যস্থল এই যে) তোমরা পুণ্য অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর; তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।" (আল্ বাকারা- ২ঃ১৪৯)

এই সংক্ষিপ্ত বয়ানে, সীমাহীন প্রজ্ঞা বিস্ময়কররূপে সন্নিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হয়েছে। এই বাণী পথ-নির্দেশক নীতি হিসেবে, সর্বপ্রকারের প্রতিযোগিতায় সর্বক্ষেত্রেই গৃহীত হতে পারে। সাধুতাকে সর্বোচ্চে স্থান দিতে হবে। সাধুতাই হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য। স্বয়ং এটাই হবে সমস্ত প্রতিযোগিতার বিষয়। সমস্ত অবৈধ কাজকর্ম বা তৎপরতাকে এবং সংকীর্ণতাকে এক আঁচড়েই সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে হবে।

সময় থাকলে, আমরা আরও ব্যাপক আলোচনায় যেতে পারতাম এবং ইসলামী শিক্ষা থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতাম যে, এই শিক্ষা কী করে প্রতিযোগিতাকে সুস্থ, খাঁটি ও বিশুদ্ধ রাখে। মানুষ কদাচিৎ উপলব্ধি করে যে, হৃদয় ও মনের সত্যিকারের শান্তি নিহিত থাকে সৎ হওয়ার মধ্যে, অসৎ ও অবৈধ উপায়ে মিছেমিছি অসাধারণ হয়ে ওঠার মধ্যে নয়।

এই শ্রেণীর লোকেরা কখনই শান্তি পায় না– না সমাজে, না নিজেদের অন্তরে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়, তারা এক প্রকার বিরাট সাফল্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেহারা দেখাতে চায়; কিন্তু এটা তাদের শূন্যগর্ভ জয়ের ভড়ং মাত্র, এটা কোন প্রকৃত বিজয়ের আনন্দের প্রকাশ নয়।

পাকিস্তানের একজন কোটিপতির এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে তার বন্ধুটির চরম হতাশার এক আশ্চর্যজনক কাহিনী শুনিয়েছিলেন। একবার তিনি তাঁর বন্ধুর এক বিরাট সাফল্যে তাঁকে মুবারকবাদ জানান। কিন্তু, খুশী হওয়া তা দূরের কথা সেই কোটিপতি তৎক্ষণাৎ যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। তিনি তাঁর শার্টের বোতামগুলো খুলে ফেললেন এবং দু'হাত দিয়ে এমনভাবে নিজের বুক খামছাতে শুরু করলেন, যেন জানোয়ারের মত থাবার নখ বসায়ে বুকটা ফাড়ায়ে ফেলবেন। এবং চীৎকার করে বলতে থাকলেনঃ 'জাহান্নামে যাক এই কামিয়াবী! কেউ যদি আমার বুকটা ফাড়িয়ে দেখতে পারতো, তাহলে সে দেখতো যে, এর ভেতরে শুধু আগুন জ্বলছে, আগুন'। এই যে কঠিন বাস্তবতা তা কেউ বা স্বীকার করে কেউ করে না। কিন্তু, কেউই মানবীয় স্বভাবকে পরাভূত করতে পারে না। কেউ বিশাল সম্পদ সঞ্চয়ে সাফল্য লাভ করতে পারে, এবং জীবনের সর্বপ্রকার সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতায় ডুবে থাকতে পারে। কিন্তু এই সত্য প্রকাশ করার মধ্যে কোন ঈর্ষা নেই যে, ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক লোক, যদি থাকেও, এমন আছেন যে, যারা সত্যি সত্যিই সুখী এবং পরিতৃপ্ত। তাদের এই অবস্থার বর্ণনা দেওয়া আছে কোরআন করীমে এইভাবেঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ۝
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ ۝ كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ ۝
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۝ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۝ ٱلَّتِى تَطَّلِعُ
عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍۭ ۝

"দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী এবং অপবাদকারীর জন্য, যে ধন-সম্পদ জমা করে এবং তা বারংবার গণনা করে। সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে, কক্ষণো না; সে নিশ্চয় 'হুতামায়' নিক্ষিপ্ত- হবে, এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে যে, 'হুতামা' কি? ইহা আল্লাহ্‌র লেলিহান আগুন, যা অন্তরসমূহের গভীরে গিয়ে

পৌঁছবে। নিশ্চয় ইহাকে চতুর্দিক থেকে তাদের উপরে বন্ধ করে দেওয়া হবে, সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহে।" (আল্ হোমাযা-১০৪ঃ ২-১০)

তাই সত্যিকারের নির্মল সন্তুষ্টি, যে কারো নাগালের বাইরেই থেকে যাবে, যদি না সে মানবস্বভাবে প্রোথিত বাসনা-কামনাকে সৎকাজে নিয়োজিত করে, সৎ হয়, এবং মহৎ জীবনযাপন করে।

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভালবাসা

নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ পরিবার পদ্ধতিতে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি করার কথা আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করে এসেছি। এখানে তার উল্লেখ করা হচ্ছে শুধু এই কথাটা তুলে ধরার জন্য যে, পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির গুণাবলী বিকশিত করার প্রয়োজন রয়েছে; কেননা এরাই প্রত্যেকে সমানভাবে এক একটি ইটরূপে সমাজ-সৌধ নির্মাণে ভূমিকা পালন করে থাকে। ইটের মান উন্নত করা ব্যতীত অট্টালিকার মান উন্নত করা সম্ভব নয়।

অপরের সেবা করা

অপরের সেবা গ্রহণের মাধ্যমে নয়, অপরের সেবা করার মাধ্যমেই সন্তোষ অর্জন করার উপায়ে জোর দেয় ইসলাম। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের নিম্নোক্ত অংশে সেই বাণীই বর্ণিত রয়েছেঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হয়েছে, তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়ে থাক এবং অসঙ্গত কাজ থেকে বারণ করে থাক, এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ"। (আলে ইমরান-৩ঃ১১১)

এতে এই ইঙ্গিতই রয়েছে যে, মুসলমানদেরকে অন্যদের উপরে খামাখাই শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়নি। মুসলিম হলেই যে সে অন্য সবার চাইতে এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে, তা ঠিক না। এই ভাল হওয়াটা প্রত্যেককে অর্জন করতে হবে, এবং তা অর্জন করতে হবে অন্যদের খেদমত করার মাধ্যমে, যাতে করে কল্যাণ বা নেয়ামতসমূহ তার কাছ থেকে প্রবাহিত হয়ে অন্য সবার উপরে যায়।

হযরত রসূলে পাক (সাঃ) 'খাইর' -যা শ্রেষ্ঠতর এবং শ্রেষ্ঠতম উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তার তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে একবার বলেছিলেনঃ

'উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম; উপরের হাতগুলো দান করে এবং খরচ করে, নীচের হাতগুলো যাচ্না করে এবং গ্রহণ করে।' (ইব্নে উমর -রাঃ - কর্তৃক বর্ণিতঃ বুখারী ও মুসলিম)।

পবিত্র কোরআনে এবং হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহে এই বিষয়টির উপরে এত বেশী জোর দেওয়া হয়েছে যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর অনেক সাহাবী (সঙ্গী) এ ক্ষেত্রে মানবিক গুণাবলীর অতি উচ্চ আদর্শের নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁরা শুধু অন্যদের সেবা করার জন্য প্রচেষ্টাই চালাতেন না, বরং তাঁরা অন্যদের কাছে কোন প্রকার অনুগ্রহ চাইতে এবং গ্রহণ করতেও ইতঃস্তত করতেন।

আউফ ইবনে মালিক আশজাই (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ *"সাত, আট বা নয় জন ছিলাম আমরা রসূলুল্লাহ্র (সাঃ)-এর সঙ্গে, এক সময় তিনি বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহ্র রসূলের সঙ্গে একটা অঙ্গীকার করবে না? আমরা কিছুক্ষণ আগেই একটা অঙ্গীকার করেছিলাম। সুতরাং আমরা বল্লাম, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা তো আপনার সঙ্গে আমাদের অঙ্গীকার করেছি।' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবারও তাঁর প্রশ্নটি করলেন। আমরাও একই উত্তর দিলাম এবং বল্লাম, 'এখন আমরা আপনার সঙ্গে আর কি অঙ্গীকার করবো?' তিনি (সাঃ) বল্লেন, 'তোমরা আল্লাহ্র এবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। তোমরা পাঁচওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করবে। আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, এবং কারো কাছেই কোন কিছু চাইবে না।' এরপর, আমি লক্ষ্য করেছি যে, যদি কখনও তাঁদের কারো হাত থেকে অশ্ব-চালানোর ছড়িও পড়ে যেতো, তিনি সেটাকেও তুলে দেওয়ার জন্য কাউকে বলতেন না।" (মুসলিম)।*

সেবার উপরে এই কারণে জোর দেওয়া হয়নি যে, এটা একটা শুষ্ক এবং কঠোর পন্থা, বরং এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিশীলিত করা এবং মানুষের মধ্যে অধিক সমৃদ্ধ মূল্যবোধের অভিরুচি সৃষ্টি করা। একবার যদি অধিকতর উন্নত অভিরুচির সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে মানুষকে অপরের কৃপা ও সেবা পাওয়ার চাইতে অপরের সেবা করার মধ্যেই বেশী আনন্দ লাভের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

আল্লাহ্র সৃষ্টির সেবা ঈমানের অর্ধাংশ।

ইসলামী আদর্শের একটি বাণী এই যে, সৎকাজ স্বয়ং তার পুরস্কার। এটা যুক্তি দ্বারা বোঝানো যায় না; বুঝা যায় অভিজ্ঞতা দ্বারা।

আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা

ইসলাম মানব-চরিত্রে উন্নততর মূল্যবোধ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় না। ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে এই চেতনারও সৃষ্টি করে যে, একজন মানুষের সমস্ত সৎকাজের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এবং হওয়া উচিত,-অন্য সব কিছুর উর্ধ্বে-খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি জোর দিলে, লোক দেখানোর জন্য বা সস্তা হাত তালি পাওয়ার জন্য সৎকাজ করার প্রবণতা আর থাকে না। একজন খাঁটি মুমিনের জন্যে এটাই যথেষ্ট বরং তার চাইতেও বেশী; কারণ সে বিশ্বাস রাখে যে, তার সমস্ত কাজ, ভাল বা মন্দ, -সর্বদ্রষ্টা খোদাতা'লার জানার মধ্যেই রয়েছে। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে পবিত্র কোরআন মন্তব্য করেছেঃ

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا
لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

"সেদিন এ (পৃথিবী) তার যাবতীয় সংবাদ বলে দিবে, কেননা তোমার প্রভু-প্রতিপালক এর প্রতি ওহী করবেন, সেদিন মানুষ দলে দলে বের হয়ে আসবে যেন তাদেরকে তাদের কর্মসমূহ দেখানো যায়। তখন, কোন ব্যক্তি এক অণু পরিমাণও পুণ্যকর্ম করে থাকলে সে তা দেখবে, এবং কোন ব্যক্তি এক অণু পরিমাণও মন্দ কর্ম করে থাকলে সে তা দেখবে।" (আল্ যিল্যাল -৯৯ঃ৫-৯)

মনে রাখতে হবে যে, মানব সমাজ সংশোধনের লক্ষ্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মানুষের অহমিকার এবং লোক-দেখানোর ও প্রশংসা কুড়ানোর যে প্রবণতা এটাই তার একমাত্র কার্যকর প্রতিষেধক।

পরহিত বা সাদাকা'র ব্যাপক সংজ্ঞার মধ্যে, রসূলে পাক (সাঃ), নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এবং এগুলির দ্বারাও আল্লাহ্‌র পুরস্কার লাভ করা যাবেঃ

'প্রত্যহ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যার উপরে সূর্য উদিত হয়, তার জন্য পরহিত বা সদাকাহ্ বাধ্যকর, দুই ব্যক্তির মধ্যে সুবিচার করা পরহিত; কোনও ব্যক্তিকে তার বাহনে বা সওয়ারীতে উঠতে সাহায্য করা বা মাল-সামান তুলে দেওয়া

পরহিত; অসুবিধার সৃষ্টিকারী কোন কিছু পথ থেকে অপসারিত করা পরহিত।' (আবু হোরায়রা - রাঃ - বর্ণিতঃ বুখারী ও মুসলিম)।

'যদি কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপণ করে, তা থেকে যা কিছু খাওয়া হবে, তা তার পক্ষে পরহিত বা সাদকাহ্, তা থেকে কোন কিছু গোপনে নেওয়া হলে, তাও পরহিত, তা থেকে কোন কিছু ফেলে দেওয়া হলে, তাও পরহিত'। (জাবির - রাঃ - বর্ণিতঃ মুসলিম)।

'নিজেকে ঢেকে রাখো (জাহান্নামের) আগুন থেকে, এবং তা একটা খেজুরের অর্ধেকটা সাদাকা স্বরূপ দান করার বিনিময়ে হলেও, এবং তাও যদি তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে অন্ততঃ একটা ভাল কথা বলো।' (আদিঈ ইবনে হাতিম - রাঃ - বর্ণিতঃ বুখারী)।

'কোন ব্যক্তির যদি কোন কিছুই না থাকে, তাহলে সে তার হাত দিয়েই কাজ করবে নিজের উপকারের জন্য, এবং সে অপরকে ভিক্ষাও দিবে; যদি সে কাজ করতে অসমর্থ হয়, তাহলে সে একজন অভাবী অসহায়কে সাহায্য করবে; সে যদি তাও করতে না পারে, তাহলে সে অন্যদেরকে সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে; সে যদি সেটাও না পারে, তাহলে সে মন্দকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে সেটাও একটা পরোপকার বা সাদাকাহ্ (আবু মূসা আশারী - রাঃ - বর্ণিতঃ বুখারী ও মুসলিম)।

এমনকি, নিজের স্ত্রীর মুখে এক লোকমা খাদ্য তুলে দেওয়ার মাধ্যমে ও আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করা যায়।

অন্যান্য মানুষের জন্য সর্বক্ষণ সতর্ক থাকা

ইসলাম অপরের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সহানুভূতিশীলতার সৃষ্টি করে। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে ইতোপূর্বে, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক শান্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। কাজেই এ নিয়ে আর বেশী আলোচনার দরকার নেই।

সদয় ও স্নেহময় সেবাযত্নের পরিধি বৃদ্ধি করা

ইসলাম মানুষের ভালবাসার পরিধি ও ক্ষমতার প্রসার ঘটায় এবং তা শুধু স্বজন ও স্বজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং তা আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টির জন্যই সম্প্রসারিত করে।

ইসলাম যেহেতু দাবী করে যে, সে সর্বশেষ অবতীর্ণ ধর্ম, এবং যেহেতু সে কেবল একটা মাত্র জাতিকেই সম্বোধন করে না, সম্বোধন করে সমগ্র মানব জাতিকেই, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই যে কেউ আশা করতে পারে যে, ইসলামের দাবী অনুযায়ী ইসলামের

নবীকেও (সাঃ) হতে হবে সমগ্র মানবজাতির জন্য আলো এবং কল্যাণের উৎস। কিন্তু, যে কেউ এতে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না, যখন তিনি পবিত্র কোরআনে দেখবেন যে, ইসলামের পবিত্র নবী (সাঃ)-কে বলা হয়েছেঃ

رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

'সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত – আশিস ও কল্যাণ'(আল্ আম্বিয়া- ২১ঃ১০৮)।

আরবী শব্দ **'আলম'** এর অর্থ 'একটি বিশ্ব' বা 'সমগ্র বিশ্ব।' অবশ্য শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আলম'-এর বহুবচন- 'আলামীন-রূপেই। কাজেই, এখানে আমরা এর তরজমা করেছি 'সমগ্র বিশ্বজগৎ'।

কোন সংশয়বাদী হয়তোবা এত বিশাল একটা উপাধির পূর্ণ যৌক্তিকতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে চাইবে না; কিন্তু সার্বজনীন নবুওয়্যতের যে মর্যাদা ও এখতিয়ার - যা নিঃসন্দেহে রসূলে পাক (সাঃ)-এর অধিকারে ছিল- তাতে গভীরতর উপলব্ধি জন্মালেই কেবল তার কাছে প্রকাশিত হবে সেই উপাধির নিগুঢ় প্রজ্ঞা, যাতে তাঁকে (সাঃ) বলা হয়েছেঃ 'রহ্মাতুল্লিল 'আলামীন' (সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত)।

মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য

কোরআনী ধারণা বা কন্সেপ্ট অনুযায়ী, শুধু জড়জগৎ সৃষ্টির পশ্চাতে যে দর্শন নিহিত তার মাধ্যমে স্রষ্টার উদ্দেশ্য খুব সামান্যই সাধিত হতো, বরং তা হতো স্রষ্টার পক্ষে, আল্লাহ্ মাফ করুন, একটা ব্যর্থ কাজ। এমনটি হলে, স্রষ্টাকে জানতোই বা কে, আর কে-ই বা তাঁর সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞানের অংশীদার হতো। সেটা হতো আদৌ কিছু সৃষ্টি না করারই শামিল।

সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্য ছিল একটা চৈতন্য সৃষ্টি করা, এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই চৈতন্যকে উন্নত করা, তাকে প্রসারিত এবং বৃদ্ধি করা, যাতে করে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

এই বিষয়টি কোন সাধারণ বিষয় নয়। এর জন্য সামগ্রিক আলোচনার প্রয়োজন; যা আজকের এই বক্তৃতায় শেষ করা সম্ভব নয়। কাজেই, প্রাসঙ্গিক যতটা, তা সহজভাবে বলতে চাইলে বলা যায় যে, সৃষ্টির পিছনে চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল, সর্বোন্নত স্তরের এক সচেতন অস্তিত্বের সৃষ্টি করা, যে অস্তিত্ব স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র পরম সৌন্দর্য-যা তাঁর সৃষ্টির সর্বত্রই প্রতিবিম্বিত-তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন করবে। এবং সেই সঙ্গে তার সহসৃষ্টিকেও (অর্থাৎ মানবজাতিকেও) পরিচালিত করবে স্রষ্টার চূড়ান্ত সেই লক্ষ্যের

প্রতি। অথবা, অন্ততঃপক্ষে, তাদের মধ্যে যারা স্রষ্টার আনুগত্য করতে চায়, তাদেরকে পরিচালিত করবে সেই লক্ষ্যে।

কিছুক্ষণের জন্য ধরুন, কল্পনা করা যাক যে, সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বলতে কিছুই নেই। তাহলে, তৎক্ষণাৎ দেখা যাবে যে, সৃষ্টির আদি কারণ (Raison d'etre), এবং এই বিশ্বজগতের রক্ষণাবেক্ষণ, সব কিছু সহসাই চুরমার হয়ে গেছে।

একটা সহজবোধ্য উদাহরণ দেওয়া যাক, একটা ফল-গাছের চারা রোপণ করা, এবং তার পরিচর্যা করা, তার গোড়ায় পানি দেওয়া, বাড়তি ডালপালা কেটেছেঁটে দেওয়া, এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদির পিছনে কারণ হচ্ছে, তার ফল। যদি কোন ফলই না থাকে, তাহলে কোন গাছও থাকবে না। যদি চূড়ান্ত স্তরে ফল উৎপাদনের কোন ধারণা না-ই তাকে, তাহলে তো চারা লাগানো এবং তার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার যাবতীয় কাজ বৃথা ও নিরর্থক প্রতিপন্ন হবে। অতএব, সমগ্র ফলের গাছটি- তার শিকড়-বাকড়, কাণ্ড, ডাল-পালা, পাতা ও কুঁড়ি- সব নিয়েই তার ফলের কাছে বাঁধা যদিও সময়ের হিসেবে। আগে থেকেই, গাছটির সকল অংশই সেই চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের কাছে বাঁধা, তবু সেই উদ্দেশ্যের পিছনে যে হিতৈষণা রয়েছে তা-ই স্বয়ং সৃষ্টির কলকব্জাও সৃষ্টি করে।

সৃষ্টির সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাদবাকী বিশ্বজগতের যে সম্পর্ক, তার আলোকে কেউ যদি ইসলামের শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করে, তাহলে সে সবিস্ময়ে অনুধাবন করতে পারবে যে, ইসলাম শুধু মানুষ এবং খোদা, খোদা এবং মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ককেই বেষ্টন করে নেই বরং তা মানুষের সঙ্গে তার চারপাশের প্রাণিজগৎ ও জড়জগতের সম্পর্ককেও পরিবেষ্টন করে আছে।

যা কিছু অস্তিত্ববান তা সবই পবিত্র (উৎসর্গীত) হয়, কিন্তু এই কারণে নয় যে, তা মানুষের চাইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, বরং তার কারণ হচ্ছে, তা বিশেষ করে, সৃষ্টি করাই হয়েছে মানুষের জন্য, তা সে প্রত্যক্ষেই হোক, আর পরোক্ষে হোক। বিশ্বজগতে কোন কিছুই কখনও নিরর্থক, দূরবর্তী বা সম্পর্কহীন অবস্থায় থাকে, না। এমনকি, সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী নক্ষত্রগুলোরও মানব-সৃষ্টির পরিকল্পনার মধ্যে একটা অর্থ এবং একটা স্থান রয়েছে। এই বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বার বার আলোচিত হয়েছে পবিত্র কোরআনে; তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো নিম্নেঃ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰهَا ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّٰهَا ۝
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰهَا ۝ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ
مَن زَكَّىٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ۝

"কসম সূর্যের এবং তার প্রাতঃকালীন কিরণের; কসম চন্দ্রের যখন তা উহার (সূর্যের) অনুগমন করে; কসম দিবসের যখন তা উহাকে (সূর্যকে) প্রকাশিত করে; কসম রাত্রির যখন তা উহাকে (সূর্যকে) আচ্ছাদিত করে। কসম আকাশের এবং তারও যে, তিনি একে (বিস্ময়কররূপে) সুগঠিত করেছেন; কসম পৃথিবীর এবং তারও (উদ্দেশ্যেরও) যে, তিনি একে সুবিস্তৃতি দান করে গঠন করেছেন; কসম আত্মার এবং তারও যে, তিনি একে পূর্ণ ও পরিমিত করেছেন, অতঃপর তিনি এর প্রতি প্রকাশ করেছেন-এর মন্দ পথ এবং এর তাক্ওয়ার পথ; সুতরাং, যে একে পবিত্র করেছে সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, এবং যে একে (মাটিতে) প্রোথিত করেছে (অপবিত্র করেছে) সে অকৃতকার্য হয়েছে।" (আশ্ শাম্স্ - ৯১ঃ২-১১)

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

"এবং যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে সব কিছুই তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।" (আল্ জাসিয়াহ-৪৫ঃ১৪)

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ
مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

"এবং তিনি রাত্রি ও দিবসকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তাঁরই আদেশে নক্ষত্র রাজিও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয় এতে ঐ জাতির জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে যারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায়"। (আল্ নহল- ১৬ঃ১৩)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ۝

"তোমরা কি দেখ না যে, যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলকেই আল্লাহ্ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তিনি তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহকে তোমাদের উপরে সম্পূর্ণ করেছেন? এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যারা জ্ঞান, হেদায়াত এবং সমুজ্জ্বল কেতাব ব্যতীতই আল্লাহ্ সম্বন্ধে কলহ করে থাকে।" (লোকমান-৩১ঃ২১)

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

"নিশ্চয় আমরা ইন্সানকে (মানুষকে) সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করেছি।" (আত্ তীন- ৯৫ঃ৫)

এই বিষয়টির উপরে কোরআন করীমে বহু আয়াত আছে, এমনকি অনেক ছোট ছোট সম্পূর্ণ সূরা'ও (অধ্যায়) আছে, যেগুলিতে এটাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মানুষ হচ্ছে একটি 'বিন্দু জগৎ' (Micro Universe), যা সকল প্রকার সৃষ্টি থেকেই প্রভাব গ্রহণ করেছে। এমন কি, সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী যে তারকা তারও অংশগ্রহণ রয়েছে 'মানুষ' নামের এই বিন্দু জগতটিতে।

কিন্তু, এই যে সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, তা মনিবের প্রতি ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, বরং ভৃত্যের প্রতি মনিবের সম্বন্ধ। মনিবরা কখনও তাদের সেবা দানকারী ভৃত্যদের কাছে নতশির হয় না বা সিজদা দান করে না। অতএব, মানুষ হয়ে উঠেছে সমগ্র বিশ্বজগতের মনিব, এবং সে ভৃত্য শুধু একজনেরই যেজন এই অসীম বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রভু।

কত বিশাল পার্থক্য এই দর্শনের সঙ্গে আর সব ধর্মের দর্শনের; যেগুলি কেবল মূর্তিপূজারই শিক্ষা দেয় না, বরং প্রকৃতি পূজারও শিক্ষা দেয় নানাভাবে। তাদের দর্শনসমূহে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, সাগর, বৃক্ষ, বজ্র, ঝঞ্ঝা, এমনকি অনেক প্রাণী যেমন, গাভী, সর্প, অথবা পাখী প্রভৃতিকেও মানুষের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। দেবতারূপে এদের উপাসনা করতে শিখানো হয়েছে মানুষকে। কেননা এরা নাকি কোন না কোনভাবে মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠতর। অর্থাৎ, মানুষকে স্থান দেওয়া হয়েছে সবকিছুর নীচে, এবং তাকে দাসানুদাস করা হয়েছে সব কিছুরই। অথচ, এ সবকিছুরই সৃষ্টি হয়েছে মানুষেরই সেবার জন্যে।

সমস্ত পরিকল্পনায়, ইসলামী উপলব্ধিতে, মানুষ হচ্ছে, এক অর্থে সমস্ত সৃষ্টির প্রভু। সুতরাং, মানুষ স্রষ্টার প্রতি চরম বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ। কেননা, সে-ই, একমাত্র সে-ই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি থেকে সর্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত, এবং তার সেবার জন্যই সব কিছুকেই বাধ্য করেছেন আল্লাহ্‌তা'লা।

অন্যকথায়, মানুষ সকল বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে মাত্র একটি বন্ধনের বিনিময়ে,- সেই বন্ধন তার স্রষ্টার সাথে। মানুষ, সে-তো সমগ্র বিশ্বজগতের বিবেকের ও চেতনার মূর্তরূপ এবং প্রতীক। সে যখন তার স্রষ্টার সমীপে নতশির হয় এবং সিজদাপ্রণত হয়, তখন তার মধ্য দিয়ে নতশির ও সিজদাপ্রণত হয় সারাটা সৃষ্টি। সে যখন তার স্রষ্টার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তখন, বলা যায়, সারাটা সৃষ্টিই প্রত্যাবর্তন করে স্রষ্টার প্রতি।

চূড়ান্ত এই সম্যক-উপলব্ধি এবং এই লক্ষ্যে জীবনকে গঠন করাই, ইসলামের মতে, চূড়ান্ত শান্তি। এই যে দর্শন, তা বিধৃত রয়েছে পবিত্র কোরআনের একটি শব্দগুচ্ছের মাত্র কয়েকটি শব্দের মধ্যেই, যা মুসলমানরা প্রায়শঃ পাঠ করে থাকেঃ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী"। (আল্ বাকারা- ২ঃ১৫৭)

খুব কম সংখ্যক লোকই উপলব্ধি করে যে, এই যে প্রত্যাবর্তন তা দৈহিক নয়, আধ্যাত্মিক। এটা শুধু কোন ঘটনার বর্ণনা মাত্র নয়। এটা বরং, মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্যের এক স্মারকবাণী। একটা স্যামন (বড় জাতের মাছ বিশেষ) যেমন শান্তি পেতে পারে না তার জন্মের স্থান, তার পোনা ছাড়ার জায়গায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত, তেমনি মানব হৃদয়ও শান্তি পেতে পারে না তার সৃষ্টির উৎসস্থলে আধ্যাত্মিকভাবে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত। এবং এটাই হচ্ছে নিম্নে প্রদত্ত আয়াতের তাৎপর্যঃ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ
تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۝

"যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখো, (কেবল) আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে"। (আর্ রা'দ -১৩ঃ২৯)

আল্লাহ্ ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়

'আল্লাহ্ ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়'-এই ফর্মূলা ছাড়া মানুষ না তার নিজেকে নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারে, না সমাজের জন্য শান্তি আনতে পারে। আল্লাহ্র ভালবাসাই কেবল সত্যিকারের শ্রদ্ধা জন্মাতে পারে তাঁর সৃষ্টির প্রতি। সৃষ্টির স্তর যত উন্নত হয়, তত কাছাকাছি হয় তা স্রষ্টার এবং তত শক্তিশালী হয়ে উঠে স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির বন্ধন।

মানুষ তখন অধিকতর উচ্চ ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রদ্ধা করতে থাকে অপরাপর মানুষকে, অর্থাৎ- মানুষ তার স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যের খাতিরে গোটা মানবজাতিকেই শ্রদ্ধা করতে থাকে। অতএব, যে কেউ বলতে পারে যে, এটা তো খোদার প্রতি সেই ভালবাসাই, যা তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ধরা যাক, কিছুক্ষণের জন্য এই দৃশ্যপট থেকে খোদাকে অপসারিত করা হলো, তাহলে দেখা যাবে যে,মানবীয় সম্পর্ক সহসাই একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

আল্লাহ্র অস্তিত্বের অস্বীকৃতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয় মানুষের 'অহং' দ্বারা। এটা একটা অতিশয় হাস্যকর এবং চরম অজ্ঞ দর্শন যে, মানুষ খোদা ছাড়াই বাঁচতে পারে। নাস্তিকতা শেষ পর্যন্ত যা অর্জন করে, তা কেবল তার জন্য একজন খোদারই মৃত্যু ঘটায় না, তা বরং, অকস্মাৎ অসংখ্য খোদারও জন্ম দেয় । তখন প্রত্যেকটি সচেতন সত্তা, যা অস্তিত্ববান, তা সহসাই তার নিজের প্রতি এক একজন খোদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তার অহং, স্বার্থপরতা এবং অখণ্ড অঙ্গীকার তখন আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সর্ব-ক্ষমতাধর হয়ে উঠে। তখন, কোন ব্যক্তিগত গোপন উদ্দেশ্যসাধন ছাড়া অপরের উপকারে আসার কোনও যৌক্তিকতাই তার আর থাকে না। তখন, সেই সে দয়াময় খোদার মত কোন বাইরের সম্পর্কের ক্ষেত্র তার কাছে আর অবশিষ্ট থাকে না, যে খোদা সর্বপ্রকার সৃষ্টির একত্র-বন্ধনের ও মিলনের কেন্দ্রস্থল।

চূড়ান্ত ইসলামী দর্শন এটাই যে, আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কারো পক্ষেই শান্তি লাভ করা সম্ভব নয়; এবং সেই শান্তি ছাড়া সমাজেও শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। আত্মকেন্দ্রী স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার যাবতীয় মানবীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং তা সবই শূন্যতায় মিলিয়ে যাবে।

আল্লাহ্ নেই তো, শান্তি নেই। এটাই পরম জ্ঞান।

ধন্যবাদ।

এই গ্রন্থে উদ্ধৃত কারআনী আয়াতসমূহঃ

সূরা বা অধ্যায়	আয়াত নং	পৃষ্ঠা	সূরা বা অধ্যায়	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্ আহ্যাব	৪১		আল্ বাকারা	২৫০	
আল্ আনআম	৬৯		,,	২৫৪	
,,	১০৯		,,	২৫৭	
আল্ আম্বিয়া	২৫		,,	২৬২-২৬৫	
				২৬৬	
,,	১০৮-১১০		,,	২৬৮	
আল্ আনফাল	৪৩		,,	২৭১-২৭২	
,,	৫৯		,,	২৭৪	
আল্ আ'রাফ	৩২		,,	২৭৬-২৮১	
,,	৫৫		,,	২৮৩-২৮৪	
,,	১৫৯		,,	২৮৫	
,,	১৮২		,,	২৮৬	
আল্ আসর	২-৪		আল্ বাইয়্যেনাহ্	৬	
আল্ বালাদ	১৪-১৭		আল্ বুরুজ	২২,২৩	
,,	১৮		আদ্ দাহর	৯,১০	
আল্ বাকারা	৪		আল্ জারিয়াত	২০	
,,	৬৩		,,	৫৭	
,,	১১২		আদ্ দোহা	১১	
,,	১৪৯		আল্ ফজর	১৮ - ২১	
,,	১৫৭		আল্ ফাতির	২৪	
,,	১৮৯		,,	২৫	
,,	২০৬		আল্ ফুরকান	৬৪	
,,	২২০		,,	৭৩-৭৫	
,,	২২৯		আল্ গাশিয়াহ্	২২,২৩	
,,	২৪৮		আল্ হাদীদ	২১	

সূরা বা অধ্যায়	আয়াত নং	পৃষ্ঠা	সূরা বা অধ্যায়র	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল হাজ্জ	৩৮		আল্ মায়েদা	৪	
,,	৬৮		,,	৬	
আল হাশর	৮		,,	৯	
,,	১৯		,,	২১	
,,	২৩-২৫		,,	৬৭	
আল্ হিজর	১০		,,	৭০	
আল্ হুজুরাত	১০-১১		,,	৯১,৯২	
,,	১২		আল্ মুদাস্‌সির	৭	
,,	১৩		,,	৪৩-৪৭	
,,	১৪		আল্ মুজাদিলাহ্	২৩	
আল্ হোমাযাহ্	২-১০		আল মুল্‌ক্	২-৫	
আলে ইমরান	১৫		আল্ মুমিন	৯	
,,	৬৫		,,	৭৯	
,,	১০৫		আল্ মু'মেনূন	৪	
,,	১১১		,,	৯	
,,	১১৪-১১৬		,,	৩৮	
,,	১৩৫		,,	৮৩	
,,	১৬০		,,	১১৭	
,,	১৯০		আল্ মুমতাহানা	৮.৯	
,,	১৯১,১৯২		আল্ মুনাফেকূন	৯	
আল্ জাসিয়াহ্	১৪		আন্ নাহল	১৩	
আল্ কাহফ্	৬		,,	৩৭	
লোকমান	১৯-২০		,,	৫৯	
,,	২১		,,	৭২	
আল্ মা'য়ারিজ	২৫-২৬			৯১	
আল মায়েদা	৩			১২৬	

সূরা বা অধ্যায়	আয়াত নং	পৃষ্ঠা	সূরা বা অধ্যায়ের	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আন্ নাহল	১৪১		আশ্ শূরা	৩৭-৪০	
আন্ নামল	৩৫		,,	৩৯	
,,	৬৩		,,	৪৯	
আন্ নিসা	২		আত্ তাকাসুর	২-৪	
,,	৪		আত্ তাওবা	৩৪-৩৫	
,,	৩৫		,,	৬০	
,,	৩৭		আত্ ত্বীন	৫	
,,	৪২		আল্ যিল্যাল	৫-৯	
,,	৫৪		আল্ যুমার	৮	
,,	৫৯		বনী ইসরাঈল	২৪, ২৫	
,,	৬০		,,	২৭.২৮	
,,	৬৬		,,	৩০	
,,	৮৭		,,	৩২	
,,	১৩৬		,,	৩৩	
,,	১৫১-১৫৩		হুদ	৮৮	
,,	১৫৭		,,	১২৪	
আন্ নূর	৩৬		ইব্রাহীম	২৫-২৮	
	৪০		ত্বাহা	১৩২	
	৫৭				
আ[illegible]সাস	৭৬				
আর্ রা'দ	২৯				
আর্ রূম	৩১				
,,	৪২				
আস্ সাফ্ফ	১০				
আস্ সাফ্ফাত	১৫৭,১৫৮				
আশ্ শাম্স্	২-১১				

এই গ্রন্থে (বক্তৃতায়) পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে আলোচিত বহু বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ঃ–

- ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় ও মধ্যযুগীয় গোঁড়ামির পরিণাম;
- তরবারি মাথা নত করাতে পারে, হৃদয়কে নয়;
- 'পরিত্রাণ' কোন ধর্মের একচেটিয়া বিষয় হতে পারে না;
- কোন রাজনৈতিক পদ্ধতিই সরাসরি নাকচযোগ্য নয়;
- আইন প্রণয়নে ধর্মের প্রাধান্য থাকার প্রয়োজন নেই;
- অর্থনৈতিক সুবিচার ঃ পুঁজিবাদে, সমাজবাদে, ইসলামে;
- সুদ ও শর্তের বাঁধনে প্রদত্ত ঋণ ও সাহায্য; মুদ্রাস্ফীতি;
- নারী চারি দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকার জন্য নয়;
- সমকালীন সমাজব্যবস্থাসমূহ এবং ইসলামী সামাজিক আবহাওয়া;
- জাতিসংঘ ঃ সুবিচার-এর নীতি সবার জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য;
- একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থায় ইসরাঈল, আমেরিকা ও গ্রেট বৃটেনের ভূমিকা;
- নব্য পুঁজিবাদ, নব্য সমাজতন্ত্র ও নব্য জাতিভেদ-এর প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা;
- 'শীতল যুদ্ধ' দৃশ্যতঃ থেমে গেছে, কিন্তু 'যুদ্ধ ও শান্তি'-এর বিষয়টি শুধু পরাশক্তিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের সুতোর ডগাতেই ঝুলন্ত নয়;
- 'আল্লাহ্ নেই তো শান্তি নেই'।

এই বক্তৃতার বাণী চিরন্তন। সমগ্রবিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোকবর্তিকা। মহামান্য বক্তা ইতোমধ্যেই তাঁর অনেক ভবিষ্যদ্বাণীতে সত্য প্রমাণিত হয়েছেন, এবং হচ্ছেনও। এটা আজকের বিশ্বনেতৃবৃন্দের দায়িত্ব যে, তাঁরা এই বক্তৃতার বাণীকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করবেন এবং সর্বকাঙ্খিত নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

'Islam's Response to Contemporary Issues'
By **Hazrat Mirza Tahir Ahmad (Aai:),** Khalifatul Masih (iv), Imam, The world-wide Ahmadiyya Muslim Jamaat.
Translated into Bangla by Shah Mustafizur Rahman.